সার্কাস

রূপদর্শী

মিত্রালয়
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ঃ কলিকাতা—১২

নিবেদন

রূপদর্শীর নকশার পর রূপদর্শীর সার্কাস—একই লেখকের দুখানা বই বছর না পেরুতেই বের হল। মনে হচ্ছে লেখক পাঠকমহলে বেশ খাতির জমিয়েছেন। এটা সুলক্ষণ। তাঁদের নেকনজর এভাবে বজায় থাকলে চাই কি ভবিষ্যতে আরো দু-একখানা বই ছেড়ে দিতে পারেন।

লেখকের এবারকার রচনাগুলির অধিকাংশই দেশ পত্রিকায় বের হয়েছিল। দু-একটা এধার-ওধার থেকেও টেনে আনা হয়েছে।

রূপদর্শীর লেখার সঙ্গে 'অ' অর্থাৎ অহিভূষণ মালিকের ছবি থাকা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আফশোষ, এবার সে রেওয়াজ ভাঙল বলে। দোষটা রূপদর্শীর। 'অ'-এর ছবিগুলো তাঁরই অন্যমনস্কতার দরুণ সংগ্রহ করে রাখা সম্ভব হয়নি। পাঠক-পাঠিকাগণ তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ দেখেই এবারের মতো যেন লেখককে মাপ করেন।

কৃতজ্ঞতা মানবহৃদয়ের একটি অমূল্য সম্পদ। কথায় প্রকাশ করলে তাকে ছোট করা হয়। তবু কথা ছাড়া লেখকের পক্ষে কিছু প্রকাশ করবার আর দোসরা হাতিয়ারই বা কি? অগ্রজপ্রতিম কানাইলাল সরকারের কাছে আমার ঋণের আর শেষ নেই। এই পুস্তকখণ্ড প্রকাশ করার ব্যাপারে তাঁরই আগ্রহ, যত্ন এবং পরিশ্রম সবচেয়ে বেশী ব্যয়িত হয়েছে।

আর দুজনের কথাও বলা দরকার—শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষ এবং সন্তোষ-কুমার ঘোষ। এঁদের উৎসাহ এবং সক্রিয় সাহায্য না পেলে লেখকের পক্ষে কোনও রচনাই কোনওদিন সম্ভব হ'ত কি না সন্দেহ। বন্ধুবর রমাপদ চৌধুরী এবং শ্রীমান সবিতেন্দ্র রায় যত্নসহকারে প্রুফ দেখে দিয়েছেন, আর শ্রীঅর্ধেন্দু দত্ত মশায় সুন্দর হেড্‌পিস্‌গুলো করে দিয়েছেন, সেজন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ। আর ধন্যবাদ জানাই আনন্দবাজার পত্রিকা প্রেসের প্রিণ্টার শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যকে। এই বই প্রকাশ করবার জন্য তিনি অশেষ পরিশ্রম করেছেন।

কলিকাতা — অলমিতি

মহালয়া — র

১৩৬০

শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষ
শ্রারজতকান্ত সেনগুপ্ত
ও
শ্রীঅহিভূষণ মালিক
বন্ধুবান্ধবেষু

আপন কথা

এ যেন খড়ের ঘরে চড়ুই ধরা। দরজা জানালা বন্ধ করে হুস হাস তাড়া লাগাচ্ছি, হয়রান হয়ে দৈবে ভবিষ্যতে টপাস করে নিচে একটা পড়েছে কি অমনি খপ—খরব বলে খাপ্ পেতে আছি। কিন্তু বৃথা। খড়ের চালে সহস্র ফুটো, ইচ্ছে করে ধরা না দিলে চড়ুই ধরা সাধ্যি কি?

লেখাটা আমার এই চড়ুই ধরার মতোই। ভাব ভাবনা সবই চলে ওই চড়ুই পাখির চালে। ধরি ধরি করেও নাগালের বাইরে ঝামেলা বিস্তর দেখে পালা প্রায় সাঙ্গ করে এনেছিলাম।

মগজে তা দিলে আমার ভাবনা কোন ফায়দা দেখায় না। লোকের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দুনিয়ার রং চোখে মাখি। লোকগুলো যেন সুরমা টানার কাঠি।

যে নক্শাগুলো এতাবৎ বুনেছি তার টানা আর পোড়েন সবই আমার আপনার ভাই বেরাদরদের জীবনকে নিয়ে। দিনের পর দিন ঘুরেছি এই জীবনের সঙ্গে 'জান-পহেচান' করতে। যেন নিত্যি নতুন অভিসারে যাওয়া। জীবন আও-রাতের মতই খেলোয়াড়। পয়লা নজরে মুচকি হেসে মনটি দুলিয়ে দিয়ে সেই যে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল, তারপর আর নো পাত্তা। এখন এক বেভুলা দিওয়ানা তুমি প্রাণের দায়ে তাকে খুঁজে বেড়াও। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে লবেজান হয়ে 'দুত্তোর' বলে যদি হাল ছেড়ে দিলে তো ব্যস, সব গেল। দুর্বলের সে কেউ না, কিন্তু তুমি যদি তার ঘুরোন চক্কর কাটিয়ে উঠে উল্টো পাকে তাকে ঘোরাতে পার, সে হিম্মত যদি তোমার থাকে তা সে তোমার কেনা বাঁদী।

জীবনকে ধরলেই শুধু হল না, ভাব করতে হবে তো। তুমি যে তার দিলের দোস্ত, তা যদি সে না বোঝে, তবে তো সে মুখে কুলুপ দিয়ে রাখবে। তাই তাড়াহুড়ো করো না, শনৈ পর্বতলঙ্ঘনম্, আগে পাশে বস, ফুলশয্যার রাতটুকু মনে আছে কি? মুখ গুঁজে থাকা সেই ঘোমটা-পরা মেয়েটির ছবি মনে পড়ে? প্রথমে ভয় ভয়, আড়ষ্ট আড়ষ্ট, তারপর সসঙ্কোচে ছোঁয়াছুঁয়ি, মৃদু মৃদু হাসি, তারপর ধীরে ধীরে টুকটাক কথা। ঠিক এমনি ধারা কড়া কারবার জীবনের সঙ্গে।

জীবনের অজস্র রূপ ছড়িয়ে আছে চাদ্দিকে, কটার নক্শাই বা আঁকতে পেরেছি। কটা জায়গাতেই বা পৌঁছুতে পেরেছি। অনেক পাঠক ফরমাশ দিয়ে-ছিলেন, অনেক গুরুস্থানীয় লোকেরাও আশা রেখেছিলেন, আরো নক্শা লিখি।

সে সবগুলো আর এই কিস্তিতে হয়ে উঠল না। সে সব আবার নতুন পালায় গাইব না হয়।

আজকে বরং নিজের কথাই বলি। ছিলাম মিস্তিরি, রাত পোহাতেই হয়ে পড়লাম লেখক। একেবারে 'গল্প হলেও সত্যি'।

বিত্তান্তটা বলি। হা চাকরী, জো চাকরী করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভোর না হতেই ফ্যাক্টরীর গেটে ধন্না দিচ্ছি। চাকরী যদি দুটো খালি, লোক জমেছি দুশ। আর সব কাজ ছলে কলে ফ্যাক্টরীর কাজ গায়ের বলে। যাদের গায়ে তখনো জোর, তারা কনুই-এর গঁুতোয় রাস্তা করে ভিতরে ঢুকে সালাম ঠুকছে। যারা একটু রোগা দুবলো, তাদের তরে কাম নেহি। এমনি করেই একদিন, দুদিন, পাঁচদিন। এক দরজা, দু দরজা, পাঁচ দরজা। তারপর একদিন দেহের বক্রী বলটুকু ছেঁড়া গেঞ্জীর মত এক ফ্যাক্টরীর গেটে ঝুলিয়ে রেখে সালাম দিয়ে বেরিয়ে এলাম। উপরে আশমান, পেটে ক্ষিধে আর চক্ষে আন্ধার।

শহরের কলে বিনা পয়সায় পানি মেলে। পেট ভর্তি জল খেয়ে মুখটা একটু তুলেছি কি দেখি একটা পেন্সিলে লেখা বিজ্ঞাপন, 'প্রুফ রিডার' চাই। অমুক রাস্তার অমুক নম্বরে অমুক কাগজের এডিটারের সংগে সাক্ষাৎ করুন। গেলাম। তখন আমি মরীয়া। এডিটার ছিলেন না, ম্যানেজার ছিলেন। দেখা করলাম। কি চাই বললাম। এর আগে কখনো এ কাজ করেছো? মাথা দিয়ে টরেটক্কা করলাম, অ্যাও হয় অও হয়। কতদিন করেছো? এবার মুখ এগিয়ে এল। আমার সংগে শলা-পরামর্শ কিছু না করেই ঝড়াক্‌সে জবাব দিলে, চার বছর। আরে আরে বলে কি? বেশ, তা সাইকেল চড়তে জানো? চমকে উঠলাম। সাইকেল চড়ে প্রুফ দেখতে হবে না কি? কিন্তু সকালে উঠেই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আজ কল্পতরু হব, যে যা শুধুবে, হ্যাঁ ছাড়া আর না বলব না। বললাম, হ্যাঁ, কিন্তু স্যার, সাইকেল কি হবে? কেন, স্টলে স্টলে কাগজ দিয়ে আসতে হবে না বিক্রীর জন্য? তা তো বটেই। আচ্ছা বিজ্ঞাপন আনতে পারবে?

আর আমাকে পায় কে? ততক্ষণে আমি আজ্ঞে হাঁ-এর সাইকেলে উঠে প্যাডেল করতে শুরু করেছি। গড় গড় করে চালাতে লাগলাম, হ্যাঁ। বেশ, তা ইয়ে লেখা-টেখা আসে? নিশ্চয়ই। মাইনের খাতায় আমি কখনোই অন্য লোকের মত টিপ ছাপ মারিনি। গোটা গোটা অক্ষরে নামসই করেছি। বললাম, আজ্ঞে হাঁ। মানে কবিতা-টবিতা? বললাম, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ক্রমশ প্রকাশিত উপন্যাস, তারকার সংগে মোলাকাৎ, খেলার বিবরণ, স্মৃতিকথা, বিজ্ঞাপন—সব স্যার, সব।

কত্তা আমার দিকে এতক্ষণ চেয়েছিলেন। চাওয়া নয়তো যেন আমার কথাগুলো চোখের কষ্টিতে ঘষে নিচ্ছিলেন। চাটনী খাওয়া ফিনিশ হলে টাক্‌রা

যেমন টক করে এক আওয়াজ তোলে, তেমনি এক আওয়াজ করে কর্তা বললেন, কাল এসো। বললাম, কি দরকার স্যার, এক্ষুনি বসে যাই। আপনাকে আর খামাকা কষ্ট দিই কেন? বলেই প্রুফের গাদা টেনে নিলাম। বললেন, আহা-হা, এখনো যে মাইনে ঠিক হল না। বললাম, একটা কিছু করবেন, সে ভরসা আছে। কিন্তু এখেনে মাইনে বেশি দেওয়া হয় না। বললাম, ঠিক আছে দাদা। তাহলে পঞ্চাশ টাকা পাবে। যা ইচ্ছে। হ্যাঁ, মাসের দশ তারিখে অর্ধেক পাবে, আর বাকীটা মাসের শেষ নাগাত। তথাস্তু।

বহাল হলাম নতুন কাজে। হপ্তায় হপ্তায় কাগজ বের হয়। প্রুফ দেখি। প্রেসে গিয়ে কম্পোজিটারদের খবরদারী করি। কাগজ ছাপা হলে প্যাক করি, ঠিকানা লিখি, বিজ্ঞাপনের তাগাদা মারি, সাইকেলে করে (মধ্যে মধ্যে যখন বেয়ারাটা কামাই করে) বাগবাজার, বালীগঞ্জে পাড়ি মারি। একবার দিয়ে আসতে, আর একবার ফেরৎ আনতে। চাকরী জুটল, আর আমাকে পায় কে? গর্বে ফুলে কোলা ব্যাঙ। আমি কি? কোহহং? জর্নালিস্ট।

কম্পোজিটার তাগাদা মারে, স্যার, তিনের ফর্মার দেড় পেজ খালি, ম্যাটার দিন। একটা গল্প দিন স্যার, কি সব এসে-টেসে পাঠাচ্ছেন, একটা রগরগে লভ্ ইস্টোরী ছাড়ুন দিকি। এই প্রেসটায় কাজ করে স্যার কিস্‌সু সুখ পাইনে। হাঁ, যখন শ' বাজারে কাজ করতুম, বাঁড়ুজ্যে প্রেসে, সে স্যার গিয়েছে একদিন। বুঝলেন। এক বইয়ের কাজ ধরা হল, 'নিচের তলার গল্প' না কি যেন, ওই গোছের নামটা, বলব কি স্যার, পড়তে পড়তে কি পুলকটাই না চাগান দিয়ে উঠত, মনে হত, মনের মধ্যে যেন ঘোড়াতে হামাগুড়ি দিচ্ছে। আরেকবার স্যার বিটি প্রেসে, 'দুরন্ত যৌবনজ্বালা', নিয়ে সেরেফ ফাটাফাটি হয়ে গেল দুজন কম্পোজিটারে। কি না লাস্ট চ্যাপ্টারটা কে কম্পোজ করবে। যাক সে কথা, এখন কিছু ম্যাটার দিয়ে দিন তো, নইলে ওদিকে ফর্মা আটকে থাকবে, মেক-আপ হবে না।

গল্প চাই? আধ ঘণ্টা বাদে এসো। খেলার খবরটাই তিনের ফর্মায় তুলে দাও। লিখতে বসলাম গল্প। দেড় পেজি এক কড়া প্রেমের গল্প। স্যার, এক পেজ কবিতা চাই। স্যার, দেশ-বিদেশের টাট্‌কা খবর চাই দু পেজ। স্যার, এবারের তারকার প্রথম প্রেম তো আজও এল না। ঠিক হ্যায়, সব হবে, এসো আধঘণ্টা পরে, তিন কোয়াটার পরে, দেড় ঘণ্টা পরে।

স্যার, বিশুবাবু যে কবিতা দিয়েছেন, পাঁচ লাইন কেটে দিন, বড় হয়ে গেছে। স্যার, এডিটোরিয়াল এক প্যারাগ্রাফ বাদ দিয়ে দিন। স্যার, ছবিটার

'সার্কাস'

তলে ভাল চার লাইন পোয়েট্রি লিখে দিন। দিচ্ছি, দিচ্ছি, দশ মিনিট পরে এসো, বিশ মিনিট পরে, পঁচিশ মিনিট পরে।

এমনি করে এক বছর, লেখার কারখানায় হাত পাকালাম, গুরু হল কম্পোজিটাররা। বল না এখন কি চাই? গল্প না উপন্যাস না বেলে লেটার মানে হালের ভাষায় রম্যরচনা না কবিতা।

লেখার নেশায় লিখে যাওয়া, সে ব্যাপারটা কেমনতরো টের পাইনি কখনো। লেখাই আমার পেশা। কলম পিষে রুজির জোগাড়, আমার ললাটে খোদা লিপি।

'অ' এর সঙ্গে আলাপ হল। আমার লেখার ঘোড়ায় 'অ' এসে রেখার লাগাম এ'টে দিল। এবার ওর কথাটাও বলি। যে সাপ্তাহিকে 'সবে ধন নীলমণি' ছিলাম সেটি চোখ বুজলে আবার বেরুলাম পথে। হঠাৎ দেখা এক বন্ধুর সঙ্গে। বেহালার রায় বাড়ির ছেলে। নাম সমরেশ। তার কাঁধে পা রেখে তার বন্ধুর বন্ধু হলাম। তার দৌলতে নগদা লাভ একটি প্রুফ রিডারীর চাকরী। এক দৈনিক কাগজে। জিগ্যেস করলেন, প্রুফ দেখতে জানেন? ঘাড় নামিয়ে জানালাম, হ্যাঁ। সে ঘাড় আর তুললাম না, সিগনাল ডাউন করেই রাখলাম। ক'টা প্রশ্ন হবে, ঠিক কি? কিন্তু আর প্রশ্ন হল না। সোজা বলে বসলেন, কাল অফিসে দেখা করবেন। অফিসে গেলাম। দেখা হল না। পরদিন, তাও না। রাম দুই সাড়ে তিন দিন পার হতে হঠাৎ একদিন চোখোচোখি। বললেন, সামনের মাস থেকে প্রুফ দেখতে লেগে যান। বললাম, যে আজ্ঞে।

প্রুফ দেখা জোর চলছে। মনিবের ঘর থেকে একদিন ডাক এল। 'বস্' শুধুলেন, ছোটদের সম্পর্কে কোন ধারণা আছে? বললাম, এককালে তো ছোট ছিলাম। ব্যাস্ তো কাল থেকে শুরু করে দিন। 'অ'কে ডেকে বললেন, এ হল আর্টিস্ট, আপনাকে সাহায্য করবে। হপ্তায় চারদিন প্রুফ দেখি, আর বাকী দুদিন ছোটদের গার্জেয়ানি। ছড়া লিখি, গল্প লিখি, 'অ' আঁকে। মাস কতক পরে মনিবের ঘরে আবার তলব। সিনেমা দেখেছেন কখনো? আজ্ঞে হ্যাঁ। কেমন লাগে? আজ্ঞে তা বেশ। বেশ কথা, কাল থেকে আপনি সিনেমা এডিটর। বহুতাচ্ছা। দ্বিপদী ছিলাম ত্রিপদী হলাম। (হে ঈশ্বর, আরেকটা ধাপ উঠিয়ে দিলেই হাম্বা রবে বেরিয়ে পড়তে পারি।) আর সেই চতুষ্পদেই বেরুলাম, কিন্তু 'অ'-এর আর আমার দুই দুগুণে চারটে' পা-ই হল। এক সকালে একই সঙ্গে দুজনেই নট্-চাকরী হলাম।

'অ'তে আর আমাতে সেই যে গিঁট বাঁধলাম, অনেক নোনা জল গিলে আর ঝড়ো হাওয়া খেয়েও সে গিঁট আজও ঠিক আছে।

• 'অ'কে বলেছি, চল হে খিদিরপুর যাই, চড়া রোদ্দুরে সেখানে গেছি।

'সার্কাস'

দুপুর রাতে কলকাতা দেখেছি। যে সময়ে নাবিক লিখি, দুজনে ঘুরে ঘুরে হয়রান, কেউ আর পাত্তা দেয় না। কি যে ছিল আমাদের হাবে-ভাবে, তাতো আর জানিনে। সবাই কেমন সন্দ সন্দ করে এড়িয়ে এড়িয়ে যেতো। শেষে অনেক কষ্টে একজনের সঙ্গে ভাব জমালাম। নিয়ে গেল ওদের হোটেলে। গল্প-সল্প বেশ চলছে, সঙ্গে সিগ্রেটটা-আসটা, গরজ আমার, সাপ্লাই আমিই করছি। লেখাটা ঠিক সময়ে জমা দিতে না পারলেই কম্ম গুবলেট হয়ে যাবে। দু-চারটে খবর জিগ্যেস করছি, টুকটাক নোট করছি, ওপাশে এক নাক লম্বা বুড়ো সেলর বসে বসে শুনছে, আর আড়চোখে 'অ'-এর নুর নিরীখ করছে। 'অ' আপনমনে আঁকিবুকি কাটছে। হঠাৎ একটা ছোকরা পাশ থেকে ছুঁড়লে এক চীৎকার, চাচা, তোমারে বেবাক কাগজে তুলছে। যেই না বলা, বুড়ো একেবারে 'অ'এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে, নিকালো, নিকালো। কি হল, কি হল, করতে না করতেই 'মার হালারে, মার হালারে' রব। কিসের থেকে কি হল, খতিয়ে দেখার সময় কই? অতি কষ্টে পৈতৃক প্রাণ বাঁচিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

আবার উল্টোটাও ঘটেছে। ছবি আঁকবে শুনেই এক খেলোয়াড় দিব্যি সোনা হেন মুখ করে, পোজ মেরে দাঁড়িয়ে বললে, সে চেহারা আর নেই দাদা। কি ছাতি, কি গুলো ছিল ওঃ। বাপের হোটেলে খেতুম আর শরীর বাগাতুম। এখন যা দেখছেন, এতো মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ।

দিন রাত্তির সতর্ক চোখে ঘুরেছি। যা দেখেছি, যেটা ভাল লেগেছে, তুলে ধরেছি। দুদিন, তিনদিন, চারদিন পর্যন্ত একই জায়গায় চক্কর দিয়েছি, সময় মাপা, সম্বল মাপা। হপ্তার পর হপ্তা লেখার জোগান দিয়েছি।

শুধু কি টাকার জন্যে? সেটাই প্রধান কারণ, তবুও মিথ্যে বলব না, জীবনের যে বিচিত্র রূপ চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, তার সঙ্গে নিত্য অভি-সারের নেশা, সেই নেশাটুকুই উন্মাদের মতো ঘুরিয়েছে। আর আত্মপ্রসাদ কি নেই? জীবনের এই যে বহুতর রঙের ছবি, পাঠকরা কাদের চোখ দিয়ে দেখেছেন? আমাদের চোখ দিয়েই না। তবে। সেটাই কি কম লাভ?

সার্কাস

এক

সার্কাস।

বিরাট তাঁবু! তাঁবু নয়, এক আস্ত শহর। এক আজব দুনিয়া। দুম দুম বাদ্য বাজে। মুহূর্তে মুহূর্তে গায়ে কাঁটা দেয়, বুক ধক্ ধক্ করে। এ কোন ধরনের লোক সব! তাঁবুর মটকা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ে। সিংঘীর মুখে মাথা ঢোকায়। হাতীকে বুকের উপর রাখে। ছেলেগুলো যদি বাহাদুর, তো মেয়েরাও বাহাদুরনী। তারের উপর নাচতে পারো? চালাতে পারো সাইকেল? উঁচু এক পাটাতনের উপর কাঠের এক গড়ানে গুঁড়ি। তার উপর এক তক্তা। সেই তক্তার উপর দাঁড়াতে হবে। পারবে? শুধু দাঁড়ালেই চলবে না। নাচতে হবে, বল নিয়ে লোফালুফি করতে হবে। তাও এক আধটা নয়, তিনটে, চারটে, পাঁচটা......শুধু কি বল? ওই ছোরাগুলো? ওগুলো লুফতে হবে না? আবার শুধুই কি ছোরা? আগুনের ছোরা আছে না? হ্যাণ্ডেলে আগুন জ্বলছে দাউ-দাউ, ভ্রূক্ষেপ নেই, একটার পর একটা ছোরা ছুঁড়ছে আবার পটাপট লুফে নিচ্ছে। গায়ে হাতে একটু আঁচ কি তাত কি ফোস্কা, কিচ্ছু না। ওরা কি মায়াবী? ওদের মেয়েগুলো কি ডাকিনী?

বাঃ তা হবে কেন!

নাই যদি হবে, তবে কোন মন্তরে বশীভূত করেছে দড়িগাছকে, তারকে, ছোরা-ছুরিকে, বাঘ সিংহ হাতীকে? কিসের বশে ওরা এদের কথা শোনে? ছোরা কি তোমার কথা শোনে? হাতী কি শোনে? ঘোড়া কি শোনে?

না না, মন্তর তন্তর নয়। সার্কাসে বুজরুকি নেই কোথাও। সেরেফ, মানুষের কেরদানি। তার সাহস, তার ধৈর্য, তার কষ্টসাহিষ্ণুতা, তার অক্লান্ত অভ্যাস। সার্কাস যদি দেখ তবে বুঝবে মানুষ কি? সে কি পারে আর কি না পারে? পশুকে বাগ মানানো তো তুচ্ছ, যার মধ্যে প্রাণ নেই, সেই দড়ি, কাছি, ছুরি, তারকেও তার কথায় ওঠাবে, বসাতে চাইলে বসাবে।

ছিল একটুকরো লম্বা দড়ি, তাতে এক ফাঁস লাগালে, তার পর দড়ির মাথা ধরে তাকে ঘোরাতে লাগলে। দড়ি যত ঘোরে ফাঁস তত বড় হয়। ফাঁস বড় হতে হতে হয়ে দাঁড়াল সুদর্শন চক্র। উপরে, নিচে, সামনে, পিছে বন বন

ঘুরছে, দড়ির ফাঁস উঠছে, নামছে। কি তাজ্জব! সেই ফাঁস মনে হবে তুমি ঘোরাচ্ছ। তোমার শরীরের চারপাশে ঘুরতে লাগল, এই মাথার কাছে, এই পায়ের কাছে। এই কোমরে পেঁচিয়ে ঘুরছে। বাঃ বাঃ, আবার সেই ঘুরন-দড়ির ফাঁস ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লোকটা এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে, ওদিক থেকে এদিক। এ পায়ের থেকে ও পা, ওপায়ের থেকে এ পা, খুব ঘুরছে। দেখে মনে হবে কি সোজা, কি সোজা? কিন্তু করতে গেলে পারবে না।

পারবে, যদি প্র্যাকটিস্ করো, যদি ওই নিয়েই লেগে থাক রাতদিন। ওই ধ্যান, ওই জ্ঞান করতে পার যদি।

এক একটা খেলা, দেখাতে আর ক' মিনিট। কিন্তু শিখতে? দিন মাস বছরের কি হিসেব থাকে, না রাখা যায়? এই যে রোজ খেলা দেখানো, এও তো প্র্যাকটিস্। জীবনভোরই অভ্যাস।

অক্লান্ত অভ্যাস, নিখুঁত সময়-বোধ আর নিবিড় একতা, এক কথায় এই হল সার্কাস। এক দোলনা থেকে আর দোলনায় লাফ মারবে, সময় এক পলক। তো প্রতিবারই ওই সময়টুকুর মধ্যে কম্ম কিলিয়ার করতে হবে। একটু হের-ফের হয়েছে কি অমনি ধপাস। পপাত চ মমার চ। ওই সময়টুকু বাগে আনবার জন্য তো অভ্যাসের দরকার, সাধনার দরকার।

আর চাই একতা। রিংবয় থেকে প্রোপাইটার অবধি সবাইয়েরই এক সুরে বাঁধা পড়া চাই। একটু গড়বড় সড়বড় কিছু হয়েছে তো, ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাবে। সার্কাস বরবাদ হয়ে যাবে।

সার্কাস-অলাদের জাত বেজাত নেই। কে কুলীন কে মৌলিক, তা জন্ম দিয়ে মাপা হয় না, মাপা হয় কম্ম দিয়ে। যার নামে বক্স অফিসে ভিড় হবে, ঝনাঝন টাকা আসবে সেই তখন মুনিবের পেয়ারের। তার পোজিশন এক নম্বর। নইলে এখানে একটা জর্মানের যা দাম, ফরাসীরও তাই। একটা বাঙালীর যা দাম, একটা মালাবারী কি মারাঠিরও সেই দাম। সব দেশের সার্কাসেই সব দেশের আদমী আছে, জেনানা আছে।

তবে, ভারতবর্ষে তিন জায়গাকার লোকই বেশী। বাঙলার আর মহারাষ্ট্রের আর মালাবারের। এদেশে সার্কাস চালু হয় এই তিনটি দেশের উৎসাহ আর উদ্যমে। ১৮৮৪ সালে প্রোঃ চত্রির সার্কাস প্রথম কালাপানি পার হয়। আমেরিকা আর চীন মুলুকে খেলা দেখিয়ে এসেছিল। তারপর দেবল সার্কাস ইতালীতে ঘুরল, ঘুরল দূরপ্রাচ্যে। বোসের সার্কাস গেল জাপান, চীন, ইন্দোচীন।

সে অন্য কালের কথা। সিনেমা তখনো আসেনি। তখনো লোকে আসল

নকলের ফারাক বুঝত। নকল ফেলে আসলের কদর করত। তাই সার্কাসের ছিল অমন রবরবা। কী লোকই না হত! আর এখন? কারই বা নজর আছে!

আমরা দুঃখু করে করব কি? ভদ্রলোক বললেন, যুদ্ধের মধ্যে সব দেশের সার্কাসেই ভাঁটা পড়েছিল। দুঃখ সে জন্যে নয়। যুদ্ধের পর আবার সব দেশেই সার্কাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আর আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেলাম। অবনতিটা হল অন্য দেশের সঙ্গে পা মিলিয়ে। তবে অন্য সবাই যখন আগে বাড়ল তখন আমাদের পা-ই শুধু গুটিয়ে রইল। মজাটা মন্দ নয় মশাই।

যুদ্ধের মধ্যে যে সার্কাসের অবস্থা হয়ে এসেছিল নিবু নিবু, যুদ্ধ-শেষে অন্য দেশে তার তেজ আবার বেড়ে গেল দুনো। আমেরিকা আর রুশিয়া এই দু দেশেই সার্কাস খুব জোশদার হয়ে দাঁড়াল। ওদের গভর্নমেণ্টও মদত দিচ্ছে, পাবলিকও।

এক একটা সার্কাস খাড়া করা, সে কি চাড্ডিখানি কথা মশাই। কত মেহনৎ, টাকা পয়সার কত ছড়াছড়ি! আপনাদের মালুম হবে কি করে? আপনারা টিকিট কিনলেন, খেল দেখলেন, তালি বাজিয়ে বাড়ি ফিরলেন। ডেলি খরচা কত জানেন? এই আমাদের খরচা দৈনিক হাজার বারশ টাকা, কম সে কম। এক একটা বাঘ সিংহ আছে না, দশ সের মাংস লাগে মাথাপিছু। খাসীর মাংসের দাম কত? কলকাতায় আড়াই থেকে তিন টাকা সের। তাহলে হিসেব করুন, চারটা বাঘ আর ছটা সিংহ থাকলে, কত খরচ হতে পারে? তেমনি এক একটা হাতীর পিছে ডেলি খরচা বিশ টাকা। ঘোড়া পাঁচ, মানুষ পাঁচ। সেরেফ খোরাকী খরচাই এই। আরো তো কত রকমের খরচ আছে।

আর মানুষ কি এক আধটা? যে কয়জন খেলা দেখায়, ব্যস? কটা লোক আর খেলা দেখাতে পারে? বিশ বড় জোর পঁচিশ? কিন্তু তার চেয়েও ঢের ঢের বেশী লোকের দরকার হয় খেলার তোড়জোড় করতে। আপনি হাওয়াই ঝুলার খেল দেখেছেন, ফ্লাইং ট্রাপিজ। তো ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছে চারজন, আর তিন চারটা জোকার খুব রং ঢং করছে। কিন্তু এই খেলা জমাতে মজুত আছে ষোল আঠারোটা রিং-বয়। চারটা তো উঠে গেছে তাঁবুর উপর। ট্রাপিজ্‌কে ঠিক ঠাক করছে। গড়বড় কিছু না হয়, তার জন্য আছে কড়া নজর। আর বাদবাকী খটাখট খুঁটো পুঁতছে, সটাসট জালি টাঙাচ্ছে। ফুর্তি ফুর্তি কাজ। এক মিনিট বরবাদ হবে তো এক ঘণ্টা বরবাদ হয়ে যাবে।

এই রকম 'টাইমিন', রিং-বয় বললে। এক পার্টিতে আমরা তিশ চাল্লিশ ভি থাকি। আগে পিছে হর জায়গায় আমাদের কাজ। কোথায় নেই।

'সার্কাস'

যার সংগে আলাপ জমিয়েছিলাম সে ছেলেটা কালো কোলো, বেজায় চটপটে। মুখে এখনো গোঁফের রেখা ওঠেনি। বেট্টে-খাট্টো এক জোয়ান ও ধারে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলে, এ রিংমাস্টার, ইধর আও। বাবুজী, এ আমাদের সর্দার আছে, রিং-মাস্টার। উ অর্ডার দিবে তো আমরা কাম করব। ক্যা বে, বাতলাও না কুছ কামকা তরিকা।

জোয়ানটা ধমক দিলে, বকো মাৎ শালে। মারেগা এক ঝাপড় তো খুপড়ি যাকে ট্রাপিজ খেলেগা। মারব থাপ্পড় তো খুলি গিয়ে ট্রাপিজ খেলবে।

ছোকরা একগাল হেসে বললে, বড়া ভাই। অমনি জোয়ানটাও হেসে দিলে। ছোকরাটা বললে, বড় ভাই, বাবুকে বল তো আমরা কি করি?

বড় ভাই বললে, সব কাম, বাবুজী, মেহনতের বিলকুল কাম এই রিং-বয়দের। সার্কাস যেখানে পয়লা যায়, কি থাকে সেখানে। স্রিফ ময়দান, ব্যস্ আর কি? খালি জঞ্জাল, ভাঙ্গা কাঁচ, টুকরা ইঁট, গাড়া গর্ত। টিরেনসে নামলাম তো ট্রাকে মাল কে তুলবে? রিং-বয়। আর ময়দানকে ডেরেস করতে হবে না? আপনি যখন সেলুনে যান, বাল-উল ছাঁটেন, তো কাম কি ওখানেই খতম হয়ে যায়? মোচ ছাঁটবেন, দাড়ি কাটবেন, 'সোনো' পাউডার মুখে দিয়ে দলাই, মলাই, 'ডেরেস' উরেস করবেন, টেড়ি বাগাবেন, তবে তো চেহারা খোলতাই হবে। তবে তো সুরৎ চিকচিকাবে। পাঁচজনে দু' এক নজর দেখে লিবে। তো এইরকম আছে ময়দান। আগে গাড়াগর্ত ভর্তি করতে হবে, জংগল জঞ্জাল সাফ করতে হবে, কাঁচ, লোহা দূরে ফেকতে হবে। একে বলে ময়দান 'ডেরেসিন্'। ময়দান 'ডেরেস' হল তো, তাম্বু উঠাও। সেই শুরু হবে খটাক্‌খট্ খুঁটো গাড়া। ভারী ভারী শাল গুঁড়ির আড়িয়া হাফিজ, রশারশির হরকসরৎ। দনাদ্দন সনাস্‌সন, কাম পূরা হয়ে গেল। দু' ঘণ্টার মধ্যে 'তাম্বু' উঠানা ফিনিস্। এক নয়া শহর বসে গেল। বাজা বাজল, বিজলী বাতির রোশনাই-এ ঝিলিক মিলিক শুরু হল। ভিতরে গেলারী বসল, চেয়ার বসল চারো তরফ। পিছু সীট তো মাশুল ভি কম, আঠ আঠ আনা টিকট। সামনে যত, পয়সাও তত। রিং-এর কাছেই "বক্স", পাঁচ পাঁচ টাকা, দশ দশ টাকা।

তাম্বু উঠল তো খেলার রিং। তাঁবুর মাঝখানে একদম যে গোল, ওই হল রিং। রিং থেকেই রিং-বয়। আর রিং-বয়দের এক সর্দার, আমি রিং-মাস্টার। অর্ডার দিব আমি তো পুরা করবে সব রিং-বয়। রিং বানাতে হয় বহোৎ হুঁসিয়ারীসে। বিলকুল খেল তো ওইখানে হয়। মর্দানা জেনানা দৌড় ঝাঁপ করে। জানোয়ার কসরৎ দেখায়। একটুকরা কাঁচ কি একটা পিন্ পায়ে ফুটল তো হাজার দোহাজার রুপিয়া কোম্পানীর গজব, একদম চাল্লিশ হাত পানির নিচে। তাই

এত হ্‌শিয়ারী, এত খবরদারী। আর এ খবরদারী কারা করে? এই রিং-বয়েরা। এক এক খেলার এক একরকম তৈয়ারী। ব্যালান্সের খেলা হবে, তারের উপর হাঁটবে জেনানা, তো খুঁটি লাগাও, তার টাঙাও। তারো আবার হিসেব আছে, বেশী টাইট চলবে না, বেশী ঢিলও চলবে না। একদম সই সই। এ খেলা শেষ হলো তো ঝটপট তোড়ো, ভেঙে দাও। হঠাও তার খুঁটি। ডিগ্‌বাজীর খেলা হবে? না পিরামিড্? সতরঞ্চি আন, বিছানা বিছাও। এ খেলা খতম হয়েছে? এবার কি হাতীর খেলা? আচ্ছা তো তার সরঞ্জাম আনো।

দুঃখের কথা কি জানো বাবু সাহেব, তোমাদের চোখের উপর হরবখৎ আছি, কিন্তু দেখতে পাওনা আমাদের একজনকেও। তোমাদের নজর তখন তারে, নাচনেওয়ালী জেনানার উপর। আমাদের ঘামে মাটি ভিজে সপ্‌সপ্ আর হাততালি কুড়োচ্ছে খেলোয়াড়রা। নসিবের চক্কর কে বোঝে?

তোমরা শুধু তো খেলার তাঁবুটাই দ্যাখ। কিন্তু তাঁবু কি একটাই ওঠে? আরো ওঠে। সেগুলো থাকে তোমাদের চোখের অন্তরালে। তাঁবুই আমাদের ঘর বাড়ী, বাসা না পেলে খেলোয়াড়রাও এই সব তাঁবুতে থাকে। এইতো ও হিন্দু, আমি খৃষ্টান, ও মারহাটি, আমি মালাবারী, ওই ট্রাপিজ-অলা বাঙালী, ব্যালান্স-উলিটি চীনে। বল ছোঁড়ে যে সাহেব সে ইহুদী, হাতী-অলা মুসলমান। মোটর সাইকিল সাহাব ফরাসী। লেকিন্ উ সব, এই জাত আর ধরম আর চামড়ার সওয়াল সব নিজের নিজের পকেটে। তাতে কারোরই মাথাব্যথা নেই। সার্কাসের তাঁবুতে এসে সবাই সার্কাস-অলা, সবাই ইন্‌সান, সবাই মানুষ, ভাই বেরাদর।

তাঁবুতে খাওয়া, তাঁবুতে শোয়া। লঙ্গরখানা সাথে সাথেই চলে। ইচ্ছা হলে এখানেও খেতে পার। ইচ্ছা হলে পাকও করতে পার, সে তোমার রুচি মতো।

রিং-বয় ছাড়া আর আছে স্টেবল্ বয়। জন্তুজানোয়ারের খিদমতগার। ঘোড়ার জন্য ঘোড়া-অলা, হাতীর জন্য হাতী-অলা, আর বাঘ-সিংহের ছোকরার নাম 'শিকারখানা', আংরেজীতে 'মেনেজারী বয়েজ্'।

এই স্টেব্‌ল্ বয়দেরও অশেষ ঝক্কি।

ছোকরাটি বললে, কোনো কোনো জানোয়ার আস্ত শয়তান, আবার কতকগুলো নিরেট বুদ্ধু। এদের দিয়ে খুশী মতো কাজ হাসিল করে নেওয়া বেজায় শক্ত। জান একদম হালুয়া হয়ে যায়। নাক দিয়ে যা জল আর গা দিয়ে যা পসিনা ঝরে তাতে জাহাজ ভাসিয়ে লন্দন তক্ পৌঁছানো যায়।

কিন্তু, তবু এদের কথা বুঝতে হয়, আমার ইসারাও বোঝাতে হয়। না হলে খেলা দেখাবে কি করে? যেমন করে বাচ্চাকে শিখাতে হয়, 'বল বাবা' 'বল মা' 'বল দাদা' বলে বুলি ফোটাতে হয়, তেমনি ট্রেনিং এদেরও, এই জানোয়ারদেরও দিতে হয়। রাগলে চলবে না, অধৈর্য হলে চলবে না।

জন্তু জানোয়ারের জিম্মাদারী স্টেব্‌ল-বয়েদের। এ ছাড়া আছে পাহারা-দার। দিনে রাতে পালা করে চৌকী দেয়। কি জানি কখন কি হয়ে যায়। দেশলাই-এর একটা জ্বলন্ত কাঠি, কি একটু আগুনের ফুলকি কোন ফাঁকে তাঁবুতে ঠেকল, তাহলেই গেল। এক তাঁবুর দাম বিশ পঁচিশ হাজার টাকা।

ম্যানেজার বললেন, এ ব্যবসার সবটাই রিস্ক। লাখ টাকার কাছ বরাবর লগ্নী, কিন্তু সে টাকা উশুল হবে কি না কে জানে? তারপর দেখুন সরকারের সহযোগিতা মোটে নেই। বাঙলা আর বোম্বাই সরকার তবু কিছু কৃপা করেন। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশ গলাটি কেটে ছেড়ে দেয়। তারপর ধরুন, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত। তাতেও কি অসুবিধে কম? সময়মত ট্রান্‌স্‌পোর্ট পাওয়া গেল না, আটকে গেলাম দু'দিন। সেই দু'টি দিনে বেকার কত টাকা বেরিয়ে গেল। বক্স অফিসের উপরই আমাদের জীবন মরণ মশাই। টিকিট বিক্রী না হ'লে খাব কোত্থেকে? আর তাতেও দেখুন কত বাগড়া। শহরের মধ্যে মাঠ পাবার উপায় নেই। কেন যে ওরা তা মঞ্জুর করেন না বুঝিনে। এই শহরের একটেরে কে আপনার সার্কাস দেখতে আসে বলুন তো। অথচ সার্কাস ছাড়া আর কি আছে যাতে গোটা ফ্যামিলি এক সঙ্গে মজা পায়, বলতে পারেন? এই যদি ব্যবস্থা হয় তো সার্কাস টিঁকবে কি করে?

এক একটা সার্কাসে ম্যানেজার থাকেন প্রায় ৪।৫ জন, তার উপরে একজন ডিরেক্টার, তার উপরে মালিক খোদ। এরা সবাই সার্কাসের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন।

আর থাকেন খেলোয়াড়রা। অনেকে আবার পরিবার নিয়ে থাকেন। নিজেও খেলা দেখান, স্ত্রীও দেখান, ছেলে মেয়েরাও দেখায়। তাই সার্কাসের নেশা পৈতৃক। আবার অনেক খেলোয়াড়কে সেই জায়গা থেকেই ভাড়া করা হয়। অনেকে নিজের জিনিস নিজেই আনে। অনেক জিনিস কোম্পানীও দেয়। খেলোয়াড়দের যতদিন শক্তি ততদিনই খাতির। অচল খেলোয়াড়ের স্থান সার্কাসে নেই।

সার্কাস শেষ তো ফের কাজ রিং-বয়দের। ভাঙচুর চলল জোর। চার ঘণ্টার মধ্যে তাঁবু নামল, প্যাকিন্‌ উকিন্‌ হয়ে গেল। লরী বোঝাই হল। ট্রেনে চাপল। যে ময়দান, সেই ময়দানই পড়ে থাকল। বাদামের খোসা,

'সার্কাস'

কাগজের ঠোঙা আর ছেঁড়া টিকিটের টুকরো হাওয়াতে সাঁতার কাটতে থাকল। মাটির বুকে থাকল অনেক গর্ত। মোটা মোটা খুঁটির দাগ। ম্লান কালিতে যেন লেখা, এখানে একদিন সার্কাস হয়েছিল।

এক সার্কাসের খেলোয়াড় আমাকে বলেছিল, আমরা খেলোয়াড়রাও ওই ছেঁড়া ঠোঙার জাত। তাকত ফুরোলে ভাঙা বাদামের খোলার মত পড়ে থাকি অন্তরালে। ক্বচিৎ কখনো সার্কাসের বাজনা শুনে চমকে উঠি। অচল দেহ নাড়তে পারিনে। স্মৃতি শুধু ফিস্ ফিস্ করে বলেঃ তুমিও একদিন সার্কাস-বয় ছিলে।

ম্লান হেসে খেলোয়াড়টি বললে, ভবিষ্যৎ আবার কি? আমাদের শুধু বর্তমান। ব্যাণ্ডের বাদ্যে মাতাল হয়ে যাই। হাজার জোড়া চোখের উপর মৃত্যুর সঙ্গে ইয়ার্কি মারি। হাততালি কুড়োই। পেট পরিবার পালন করি। তারপর দম ফুরোলেই ফক্কা; তুবড়ির খোলকে আর কে পোঁছে?

(দুই)

আমার এক বন্ধু আছেন, নাম 'জরদ্গব'। চমৎকার লিখতে পারতেন লিখতে শুরুও করেছিলেন। কিন্তু যেই লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল, অমনি কলমের নিব থেকে কালি পুঁছে বল্লেন, লোকে তালি বাজাচ্ছে হে, এই বেলা সরে পড়ি। হাততালির প্যাঁচ বড় প্যাঁচ। পেঁচিয়ে ধরলে ছাড়ানো শক্ত। বলে সত্যি সত্যিই লেখার ময়দান থেকে একদিন সরে পড়লেন। তিন চার বছর আগের কথা, তিনি সার্কাস নিয়ে এক সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

'জরদ্গব' বলেছিলেন, শ্বশুর যদি মিল মালিক হন, আর তিনি যদি মনে করেন যে জামাই সে মিলের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার হোক, তো জামাই-এর পেটে কানাকড়ি এলেম না থাকলেও সে তক্ষুনি তা হতে পারে। কিন্তু সার্কাসের বেলায় সেটি হবার জো নেই। এখানে নেপোমি চলবে না। শ্বশুর সার্কাস কিনলেন, আর জামাইকে করে দিলেন ট্রাপিজ পেলেয়ার, বললেন, কাল থেকে বাপু ট্রাপিজের খেলা দেখাবে, কি হয়ত বললেন, যাও তো বাছা ছপটি গাছা হাতে নিয়ে, ঢোকো তো বাঘের খাঁচাখানায়, মাথাটি পুরে দাও তো বাঘের মুখে, আর অমনি জামাতা বাবাজী সেটি হাঁসিল করে এলেন, ব্যাপারটি অত সোজা নয়। 'নেপোটিজ্ম্' সর্বত্র চলে, কিন্তু সার্কাসই একমাত্র জায়গা যেখানে তারও জারিজুরী ঠাণ্ডা।

'সার্কাস'

কথাটা যে কত বড় সত্য, প্রমাণ পেলাম সার্কাসের লোকেদের সঙ্গে আলাপ করে।

সার্কাসের খেলা হেকমতের খেলা! সে খেলায় হাতটি না পাকালে কদর নাস্তি। আর সার্কাসের টানও বড় জবর। টানটা পেশার যতটা না হোক তার বেশী নেশার। পেশার টান তবুও তো এড়ানো যায়। নেশা কি প্রাণ থাকতে ছাড়ে?

আজ আটচল্লিশ বছর হয়ে গেল, সার্কাসের সঙ্গে সঙ্গে। সেই বাড়ী থেকে পালিয়েছিলাম কবে! এখনও মনে করতে পারিনে ভাল করে। বছর বারো বয়স ছিল তখন। বুকে ছিল আশা আর কলজে-ভরা তাজা দম। আর এখন দেখছেন তো? ভদ্রলোক হাসলেন।

বললেন, ষাট বছর বয়েস হল। দম নাই, খেলা দেখাইনা। আশা এক গোরে বাবার। সেটাই শুধু পুরতে বাকী, আর তো সবই পুরেছে। কি কতক পোরেনি। তার জন্য পরোয়া নাই, দুখও না। তবু কেন দেশে দেশে ঘুরি বালবাচ্চা সঙ্গে নিয়ে? মার বয়েস এই নব্বুই, বুড়ি বেঁচে আছে, আমাকে দেখবার জন্য বড় পাগল। কত চিঠি লেখে। তা গিয়ে যে দুদণ্ড মায়ের কাছে থাকব, তার কি উপায় আছে? শুধু কি পয়সার জন্যেই? মনেও ভাববেন না। আপনাদের আশীর্বাদে পয়সার অভাব আমার কোন কালেই ছিল না। বাপ জীবনের কামাই রেখে গিয়েছিল। আরো তিন ভাই আছে দেশে। কাপড়ের কল আছে। তাতে আমারো হিস্যা আছে। 'ইন্‌কাম' খারাপ নয় নিতান্ত। তবু সেখানে গিয়ে থাকতে পারিনে। যাই, দু পাঁচ দিন থাকিও। ভাবি আর ফিরব না, বাকী দিন কটা ঘরেই কাটিয়ে দিই। কিন্তু পারি না। যদি ব্যাণ্ডের বাজনা দুদিন না শুনি তো মনে হয় কত বছর শুনি না। বাঘ সিংহীর হাঁকাড় শুনিনা এক বেলা, তো মনে হয় যেন কত মাস শুনি না। চোখের সামনে হাজার বাতির রোশনি ভাসে না তো মনে হয় সবই অন্ধকার। মনে হয় সব ফাঁকা। হাঁফ ধরে, বাতাস টানতে কষ্ট হয়। তাই চুপে চুপে একদিন বেরিয়ে পড়ি। তারপর ঘুরতে ঘুরতে সেই সার্কাসের তাম্বুতে ফিরে এলে তবে গিয়ে সোয়াস্তি।

সার্কাস এদেশে প্রথম আসে, লোকটি ভুরু কুঁচকে বললে, ঠিক মনে পড়ছে না, বোধহয় ১৮৭৮ সালে। বোম্বাই শহরে বিলাতের এক সাহেব তাঁর সার্কাস পার্টি এনে খেলা দেখান। তাই দেখে এক মারাঠি ভদ্রলোকের সখ টগ্‌বগিয়ে ছুটে দিল। কিছুদিন পরেই, আর তাঁরই কেরামতিতে দিশী সার্কাস মাথা ছাড়া দিয়ে উঠল। তারপর থেকে দেখুন, এখন অব্দি সে রেওয়াজ চলেছে।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, চলেছে, তবে গভর্নমেণ্ট যদি এই রকম 'ক্যালাস্' হয়, যদি নজর এদিকে না দেয় তো অচিরাৎ এই সার্কাস বলে বস্তুটি 'টুয়েল্‌ভ-ও-ক্লক্ স্ট্রাক্' করবে। সিধে বাঙলায় মশাই বারটা বাজবে। অথচ সার্কাস চললে সরকারের লোকসান তো নেই-ই বরং লভ্যই আছে ষোল আনার উপরে আরো আট পাই। সিনেমা থিয়েটার থেকে চার মাসে যে প্রমোদ কর পান, একটা সার্কাস শহরে চালু হলে এক মাসে সে টাকা তাঁরা সিন্ধুকে তুলে ফেলতে পারেন। কিছুই তো তাঁদের করতে হয় না, যদি দয়া করে বেশ ভালমত জায়গা আমাদের জন্য বন্দোবস্ত করে দেন তবেই আমাদের পিতৃপুরুষ উদ্ধার হয়ে যান।

এই কলকাতা শহরটার কথাই ধরুন। ভেতরে এমন একটু জায়গা পাবেন না, যেখানে মন খোলসা করে সার্কাসের তাঁবু খুঁটো গাড়তে পারে। চিরদিন এমন ছিল না মশাই। এ লাইনে ঢের দিন থেকে আছি, অন্দিসন্ধি সব এই নখের ডগে। ওই যে যেখানে এখন হিন্দুস্তান বিল্ডিংস্ হয়েছে কি জি ই সি-র বাড়িটার ওখানে, কি এখন যে জায়গাটায় বার্মা শেলের অফিস হয়েছে, ওই সব জায়গা আগে ছিল ফাঁকা। অনেক সার্কাসের খেলা ওই জায়গাগুলোতে হয়ে গেছে। কি ধরুন বৌবাজার থানা এখন যেখানটায়, ওখানেও খেলা দেখান হয়েছে। আর হ্যাঁ ভুলেই যাচ্ছিলাম ওয়াছেল মোল্লা সাহেবের কথা। ওর দোকানবাড়িটা যেখানে, আগে তো ওখানেই সার্কাস ছিল। কি যেন নাম ছিল? হ্যাঁ মিনার্ভা সার্কাস। মোল্লা সাহেবেরই সার্কাস সেটা।

ভদ্রলোক খবরের জাহাজ। উৎসাহ পেয়ে পুরো ইস্টিমে ছুটলেন। বললেন, খুব আগে পারব না, তবে কুড়ি বাইশ বছরের খবর দিচ্ছি। ধরুন ১৯৩০-৩১ সালের কথা, কলকাতায় এল কার্লেকার গ্র্যাণ্ড সার্কাস। ৩১-৩২এ এল গ্রেট এসিয়াটিক সার্কাস। গ্রেট অলিম্পিক সার্কাস এল ১৯৩২-৩৩এ। ৩৪-৩৫ সালে গ্রেট রেমান সার্কাস। সেই বছরেই এল জার্মান সাহেব হেগেন বেগের সার্কাস। হুলুস্থুলু পড়ে গিয়েছিল শহরে। কিন্তু কি অদৃষ্ট দেখুন, দেশে ফিরতে পারলে না। কি হয়েছিল কে জানে, বোম্বাইতে পিস্তল দিয়ে সুইসাইড্ করলে। বেচারা। চ্‌চুক চ্‌চুক চ্‌চুক। কার কপালে কি লেখা কে বলবে মশাই। হ্যাঁ যা বলছিলাম। কার্লেকার গ্র্যাণ্ড সার্কাস আরো দুবার এসেছিল; ৩৫—৩৬ সালে একবার, আরেকবার এসেছিল ৪০—৪১এ। গ্রেট্ রেমানও দুবার এসেছে, ৩৭—৩৮এ আর ৪৭—৪৮এ। ৩৬—৩৭ সালে এসেছিল রুক্মা বাঈ সার্কাস। কত আর বলব? রয়্যাল সার্কাস এসেছে ৩৮—৩৯এ, সেই বছরই আবার হোয়াইটওয়ে সার্কাস

কলকাতায় এসেছিল। ৩৯—৪০ সালে এসেছে গ্র্যান্ড ফেয়ারী সার্কাস। ৪১—৪২এ এসেছে গ্র্যান্ড ওলিম্পিক সার্কাস। কত শুনবেন বলুন। তারপর যুদ্ধের হিড়িকে ভাল সার্কাস পর পর বছর তিনেক আসেনি। সেই থেকেই টেস্ট বদলে গেল বোধহয়। তারপর ৪৫—৪৬ সালে এল গ্রেট ইস্টার্ন সার্কাস, পরের বছর গ্রেট রেমান, তারপরে গ্রেট ওরিয়েন্টাল সার্কাস এল ৪৮—৪৯ সালে, ৪৯—৫০, ৫০—৫১ এই দুবছর পর পর এল জুবিলি, আর এ বছর এই ৫২তে গ্রেট রয়্যাল সার্কাস। এই নিন আপনার পুরো হিসেব। কলকাতায় সার্কাস আসার একেবারে আপ-টু-ডেট্ হিসেব।

হ্যাঁ, তা যা বলছিলাম। আগে যাও বা সুটেব্ল্ জায়গা পাওয়া যেত, এখন তাও গেছে। বাড়ি ঘর, বিরাট বিরাট বিল্ডিং হয়ে সার্কাসের ন্যাতার মেরে দিয়েছে। অন্য অন্য দেশের গভর্নমেন্ট রিজার্ভ করা জায়গা রেখে দিয়েছে, শুধু সার্কাসের খেলা দেখাবার জন্য। ছেলেমেয়েরা ছবির নয়, সিনেমার নয়, সত্যিকার বাঘ সিংহ দেখবে, ডাক শুনবে, কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান হবে তাদের। আমাদের দেশে তো আর সে সব ভাবাচিন্তার বালাই নেই। রিজার্ভ করা জায়গা তো দূরের কথা, নিজেরাই খুঁজে পেতে জায়গা যোগাড় করেছি। তুমি এস ডি ও সাহেব, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, একটা পার্মিশন শুধু করে দাও, তো তাতেও গাফিলতী।

বলে কি পার্মিশন কি চট্ করে দিলেই হল? খোঁজ খবর নিতে হবে না ভাল করে? যার জমি সে অনুমতি দিয়েছে কিনা, দিয়ে থাকলে লিখিত পড়িত কিছু আছে কিনা? পাড়ার লোকজনের আপত্তি আছে কিনা? এই এক মহা গ্যাঁড়াকল মশাই, এই পাড়ার লোকেরা। কিছুর মধ্যে কিছু নেই, আপত্তি জানিয়ে বসল। কি, না সার্কাস পাড়ার মধ্যে বসান চলবে না। কেন, না ছেলেদের চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে। ওদের লেখাপড়া হবে না। একজন যদি এই কথা বললেন, তো পোঁ ধরলেন দোসরা জন। বললেন, লোকেরা দলে দলে আসবে সার্কাস দেখতে, আর রাত্রে পাড়া নোংরা করবে। দলে বাঘ সিংহ আছে নাকি? আছে। ও বাবা, দরকার নেই সার্কাসের। আমার গরুটা দ্বিতীয় বিয়েন দিয়ে 'উইক' হয়ে পড়েছে। সিংহের ডাকে ভড়কে গিয়ে দুধ কমিয়ে দেবে। তাই বলছি সার্কাস ফার্কাসে কাজ নেই। এই দূর থেকেই নমস্কার।

তখন শুরু হয় পাল্টি চালের খেলা। হ্যাঁ আপত্তি নাকচ করতে পারি, কিন্তু মশাই ফ্রি পাশ দিতে হবে। একটা ফ্যামেলি পাশ। রাজী?

তো ব্যস্, আপত্তি নেই, আমার। সার্কাস চলুক। একটা সার্কাসে ছেলেরা কত কি দেখতে পারে, শিখতে পারে।

'ফিরি' পাশের মহিমা তাহলে বুঝুন। ধোবা থেকে দারোগা আর মুটে থেকে 'ম্যাজিস্টর' সবাই মুকিয়ে থাকেন 'ফিরি'তে সার্কাস দেখাবার তালে।

একটা সার্কাস এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া কি চাড্ডিখানি কথা। হুট্ করে কোন শহরে সার্কাস গিয়ে পড়ে না। কোথায় যাবে না যাবে আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। ঠিক করাও কি সোজা? ধরুন সার্কাস যাবে বহরমপুর। তো তিন মাস আগে থাকতেই সেখানে তার ম্যানেজার গিয়ে হাজির। খবরাখবর নিতে লাগল খুঁটিয়ে। সেই শহরে কত লোক? লোকের হাতে পয়সা কেমন? কেমন সিনেমা থিয়েটার দেখে? সার্কাস এর আগে ওখানে কোনদিন গিয়েছিল কিনা? গেলে, কবে? কি কি খেলা দেখিয়েছিল? কেমন পয়সা পেয়েছিল? ইস্কুল কলেজ কটা? ছাত্রছাত্রী কত? নতুন কোন সার্কাস এলে সুবিধে পাওয়া যাবে কিনা? এইসব রিপোর্ট আসে ডিরেক্টর কি প্রোপাইটারের কাছে। তাঁরা পরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন, সেখানে যাওয়া সমীচীন হবে কিনা? যদি তাঁরা হ্যাঁ বলেন, তো চল। তাঁবু উঠাও। আগু বাড়। ম্যানেজার মশাই বাগড়া দিলেই, কি ভুলচুক কিছু করলেই গেল। গোটা কোম্পানীকে তার খেসারৎ দিতে হবে। তাই সার্কাসের ম্যানেজাররা প্রায়ই জাঁদরেল হয়ে থাকেন। তাদের 'পাওয়ার' খুব। আর কাজকর্মও এমন জানে যা সচরাচর দেখা যায় না। রেল কোম্পানীর লোক চট করে বলুক দেখি, কলকাতা থেকে কালনার ভাড়া কত? হাতীর ভাড়া, ঘোড়ার ভাড়া কত? মালের ভাড়া কত? কতখানা ওয়াগন লাগবে। ক'খানা তার বন্ধ আর ক'খানাই বা খোলা? এ হিসেব চট করে যদি কেউ বলতে পারে তো সে এক সার্কাসের ম্যানেজার। এদের মাইনেও বেশ মোটা।

রকম রকম লোক নিয়েই সার্কাস। কেউ ফ্যালনা নয়, সবাই দরকারী। যেমন বাঘ সিংহ, তেমনি পেলেয়ার, তেমনি ক্লাউন। অন্য অন্য দেশের ক্লাউনরা যেমন তেজী, আমাদের দেশের ক্লাউনগুলো কিন্তু তেমন সরেস নয়। অথচ ক্লাউন 'গেট্ সেল্' বাড়াতে কত সাহায্য করে। বিলাত আমেরিকার কথা আলাদা। ক্লাউনের পিছনে ওরা টাকা ঢালে কত? দু তিন হাজার টাকা মাইনে পায় এমন ক্লাউনও আছে। কি তাদের রংদার পোষাক আর কি মেক্আপ্! ক্লাউন পয়লা দর্শনধারী, পরে গুণবিচারী। মেকদার চেহারা দেখেই যদি হাসির গুঁতোয় পেট না ফাটল তো আর ক্লাউন কি?

'সার্কাস'

এই তো, তিন চার বছর আগেও আমি ক্লাউনের কাজ করতাম। আর করিনে, ছেড়ে দিয়েছি। এখন দাঁতের খেলা দেখাই। আগে এই খেলা দেখাতো আমার বউ।

বলেই লোকটি একটুক্ষণ থামল। একটু জিরেন নিয়ে বলল, আর আমি ছিলাম ক্লাউন। সতের রকম হাসতাম। ঠিক দশ মিনিট টাইম। আমরা ক্লাউনরা বেশীর ভাগ কাজ করি খেলার ইণ্টারভ্যালগুলোতে। ওদিকে নতুন খেলার যোগাড়যন্ত্র হতে থাকে, আর আমরা মজাক্ মস্কারা করে সময়টা পার করে দিই। আর জানেন তো প্রোগ্রাম একবার ঠিক হয়ে গেলে তার নড়চড় হবে না। এই হল সার্কাসের রুল। কড়া ডিসিপ্লিন। আগে আমার বউ-এর দাঁতের খেলা। তারপরে চীনে মেমের তারের ব্যালান্স। মাঝখানের দশ মিনিট আমার। বৌ খেলা দেখাতে গেছে। আমি ফাইনাল মেক্আপ নিয়ে রেডি হচ্ছি। রিং মাস্টার সিটি মারবে তো আমি পালটি খেতে খেতে রিংএ ঢুকব। এক হাতে ছোট এক তালা আর কোমরে বোম্বাই এক চাবি। চাবি তো তালায় ঢুকবে না আর তখন আমি হাসব। এক রকম, দু'রকম, তিন রকম, এইভাবে রকম রকম সতের রকম হাসব। ঠিক পুরা দশ মিনিট। তারপর ফের সিটি বাজবে। ছাতা নিয়ে চীনা মেম আসবে তারে উঠতে, তখন আমার ছুটি।

সেদিন পুরো মেক্আপ্ নেওয়া শেষ হল না, রিং মাস্টারের সিটি পড়ল। তাড়াতাড়ি পালটি খেতে খেতে ছুটলাম। রিং-এর ভেতরে খুব গন্ড-গোল। হঠাৎ নজরে পড়ল বৌকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। আমার মাথা ঘুরে উঠল। কিন্তু আমার প্রোগ্রাম সতের রকম হাসতে হবে। পুরা দশ মিনিট। প্রোগ্রামের নড়চড় নেই। তো বাবুজী পুরা দশ মিনিট হাসলাম।

ভেতরে যখন এলাম, বৌ তখন হাসপাতালে। ড্রেস পরেই ছুটলাম। হাসপাতালে যখন গেলাম, বৌ তখন অনেক দূরের এক জায়গায় চলে গেছে। আর নাগাল পেলাম না। সেই থেকে আমার হাসির খেলা বন্ধ হল। দাঁত দিয়ে চেপে ধরলাম রশির কোণা। ধীরে ধীরে উপরে উঠি, মনে হয় বুঝি বৌ-এর কাছ বরাবর পৌঁছালাম। আর যদি কোনদিন ছিঁড়ে পড়ে যাই তো মনে হত বুঝি ভালই। একখানেই মিলব গিয়ে। প্রাণের ভয় মুছে ফেলে খেলতাম। তাই দুবছরেই পাকা হয়ে গেলাম। তখন এই খেলাতেই আমার রোজগার বাড়ল। তারপর দিন কাটল, বিয়েও করলাম আর একটা। এখন তাই একটু সাবধানে খেলি।

শ্মশানে চ

আপনাদের কি? লাসটি নামিয়েই খালাস। ডাক্তারী সার্টিফিকেট দেখাতে হবে না? কই আনুন সেটা যোগাড় করে। শুধু শুধু এখানে তম্বী করে কি হবে?

ভদ্রলোক বুঝিয়ে বুঝিয়ে হদ্দ হয়ে গেলেন। কিন্তু শুনবে কে? শুনবে যে তার মুখে তো সেই একই কথা। কেন বাওয়া ল্যাজে খেলাচ্ছ। টুকুস করে রসিদটি কেটে দাওনা সুপুত্তুর। সকাল সকাল পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে বাড়ি পানে কেটে পড়ি।

নেশায় টং, চোখে রং। চেঁচিয়ে বললে, হেবো, বোতলটা এনেছিস তো। কিছু রেখেছিস তো শালা, না মিনিমাগুনা পেয়ে উইড়ে দিলি সব। এদিকে আয়, মরা বাবু কি বলে শালা কান পেতে শোন। সেই কবে থেকে বলছি, বুড়ো মরবে, সব রেডি হয়ে থাক, পাঁচজনের কাছ থেকে বেয়ে চেয়ে চাঁদা তোল, মাল ফাল কিছু আগে ভাগে কিনে রাখ, শালা পরের উবগার কত্তে হবে না। তা শালারা কথাটা কানেই নিলে না। এখন দ্যাখ শালা, সেই কথা ফলল কিনা। আর বেয়াক্কেলে বুড়ো মরলোও সেই মাঝরাত্তিরে! একে এই শীত, শালা হাড়ে যেন করাত চালাচ্ছে। এই হেবো, আননা বোতলটা, একটু চানকে নিই। কি বললি, নেই কিছু? মজা মারা পেয়েছো। মারব শালার পেটে এক লাথি। না থাকে নিয়ে আয় একটা।

হেবো বললে, ম্যালা ম্যালা ইয়ে করিসনি। নিজেই তো সবটুকু সাবড়ালি, আবার চেল্লাচ্ছিস কেন। শ্মশানবন্ধু এইছিস শ্মশানে, ভদ্দরতাই রাখ।

যা যা শালা, এই কনকনে শীতের রাতে বউ-বিছানা ছেড়ে উঠে এলাম, কোথায় একটু ওম্ হব, না বাবা সব ফক্কা। মালকড়ির যোগাড় রাখিস নি তো উবগার করবার শখ কেন? কি করলি চাঁদার টাকাগুনো? কৌন্সিলারকে ভজিয়ে ভাজিয়ে ঘাট খর্চা ষে মকুব করালুম সে টাকা গেল কোথায়? মরার টাকা ট্যাঁকে পুরো না বাবা, হজম হবে না। খয়রাত করো খয়রাত করো।

হেবো এবারে একটু নরম মারল। বললে, তোর মুখে আর কিছু আটকায় না, ভদ্দরতাই তো শিখলিনি। এত রাত্রে মাল কোথায় পাবি তুই। বরঞ্চ টাকাটা জমা থাক্, কাল পরশু হবেখন মৌজ।

'সার্কাস'

তুমি টাকা ফ্যাল না, বলে কি কোথায় পাবি? আরে এ পাড়ার নাড়ি নক্ষত্র সব জানা আমার, মড়া কি আজ পোড়াচ্ছি বাওয়া। এটা নিয়ে পচাত্তরটি। ওসব কাল পরশুর ব্যবসায় আমি নেই, কলকাতা শহর, চেষ্টা থাকলে বাঘের চোখ মেলে আর একটা মড়া জুটবে না? দে দে টাকা দে এখন, গলা শুকিয়ে কাঠ মেরে গেল।

তারপর তো মশাই খুব মাইফেল বসে গেল। মড়ার নামে মড়া পড়ে পড়ে শুকুতে লাগল। ডাক্তারী সার্টিফিকেট না পেলে আমি ঘাট-রসিদ কাটি কি করে? ঘাটুবাবু বললেন, রেসপন্সিবিলিটি নেই আমার? তা কে শোনে সে কথা। মাতালগুলো, মশাই আমার উপর চড়াও হয় আর কি? শেষ পরে থানা পুলিশ করে ওদের বশে আনতে হয়।

বলতে লজ্জা হয় মশাই, ছত্রিশ জাতের লাস তো আসে এখানে, কিন্তু বেলেল্লাপনায় বাঙ্গালীদের তুল্য কেউ নয়। পাড়ায় পাড়ায় শ্মশান-বন্ধুর দল, সব যেন মুকিয়ে থাকে। একটা মড়া পেলে হয়, দেখেন না, কেমন ফুর্তি লাগে সব। কাঁধে করে মড়া বইছে আর পাড়ার মধ্যে ঢুকে বাজখাঁই হাঁকাড় মারে, বলো হরি হরি বোল। সেই বিকট হাঁকে মায়ের কোলে শিশুরও দাঁত-কপাটি লাগে। আচ্ছা বলুন তো এর কী অর্থ হয়। নিয়ে যাচ্ছিস ডেড বডি, কোথায় চুপচাপ শুদ্ধু শান্ত হয়ে যাবি, তা নয়, হাঁকাড় মারছে যেন লীগ শীল্ড জিতেছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন চোয়াড়ে চোয়াড়ে লাগে না! এই তো আরো পাঁচটা জাত আছে, লোক তো শুধু এক আমাদেরই মরে না, খৃস্টান আছে, মুসলমান আছে, দেখেছেন তো কিভাবে নিয়ে যায় ওরা। সাড়া নেই, শব্দ নেই, কেমন একটা শ্রদ্ধা, একটা সিরিয়াসনেস্ থাকে। এমন কি হিন্দু অবাঙ্গালী যারা আসে তারাও পদে আছে মশাই।

তবে বলি শুনুন, ভদ্রলোক এবারে জেঁকে বসলেন, বেশী দিনের কথা নয়, একটা দল তো এল, সব ভদ্রসন্তান, দাহ টাহ চুকে গেল। এইখানেই শুরু হল খাওয়া, মিষ্টি এসেছিল দ্বারিক ঘোষের দোকান থেকে। আমোদ ফুর্তিতে খেয়াল নেই, কি করে দু'জন বাদ পড়ে গেছে। ছোকরা দুটো একটু এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। মিষ্টির চাঙারীও খতম হয়েছে আর ছোঁড়াদুটোও এসে হাজির। বললে, আমাদের মিষ্টি কই? তখন এ চায় ওর মুখের দিকে ও চায় তার মুখের দিকে। মৃতের ছেলে এসে বললে, একটু অপেক্ষা করুন, আনিয়ে দিচ্ছি। বলেই একজনকে ধারকাছ থেকে মিষ্টি আনতে

বললে। একটি ছোকরা বলে উঠল, আমরা কি ভিক্ষুক? পেয়ারের লোক-দের বেলায় দ্বারিকের খাবার আর আমাদের বেলায় আদাড়ের পাঁদাড়ের। ও মিষ্টি আপনার বাপের শ্রাদ্ধে দেবেন। ছেলের মামা গর্জন করে উঠলেন, শিগগির উইথড্র কর কথা, নইলে জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব রাস্কেল। আরেকজন লাফিয়ে উঠল, কি যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ডেকে এনে অপমান। শ্মশান-বন্ধুদের ইনসাল্ট! মুহূর্তে কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। দু'জন ঘায়েল। তাহলেই বুঝুন শবযাত্রার মাহাত্ম্য কত?

মিস্টি খেয়েই যে কত ফ্যামিলির গঙ্গাযাত্রা করিয়েছে আমাদের সংকার সঙ্ঘের মেম্বররা, তার কি গোনাগুন্তি আছে কিছু?

অথচ চোখের সামনে এও তো দেখছি, শত শত হিন্দুস্তানীরা আসছে, মড়া পুড়িয়ে যাচ্ছে, না মিষ্টি না কিচ্ছু, খেলে বড় জোর একটা ডাব। ইস্তক পানটা সিগারেটটা নিজের পয়সায় খায়।

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভেতরে এসে ঢুকলুম। এক চুল্লির কাছে বেজায় ভিড়। এক কবি সাহিত্যিক গত হয়েছেন। মৃতদেহ আনা হয়েছে। তার চার পাশে ভক্তবৃন্দ বসে আছেন সব। একজন গুটি গুটি এগিয়ে এসে শুধুলে, ইনি কে ছিলেন? একজন জবাব দিলেন। শুনে তিনি খানিকক্ষণ গুম মেরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে শিবনেত্র, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে হঠাৎ চীৎকার দিয়ে উঠলেন, 'ওফ্ হি ওয়াজে গ্রে-এ-এ-ট ম্যান, এ্যাজ বিগ এ্যাজ স্কাই। ওফ্, এমন লোক আর হবে না।'

দেখতে দেখতে কাগজের রিপোর্টার এল। অমনি মড়া টড়া ছেড়ে অনেকে ছুটলে তার পিছু পিছু। স্যার অনির্বাণ সঙ্ঘের নামটা লিখবেন। সঙ্ঘের সেক্রেটারী শ্রীযুত অমুক মাল্যদান করেছেন। স্যার আমাদের নামটাও যেন ভুলবেন না, আমরা পুষ্পিত সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ। ওই বড় মালাটাই আমাদের।

অন্যধারে প্রায় নিবোন্ত এক চুল্লীর কাছে এক সন্ন্যাসী বসে। চিমটে করে আগুন তুলে তার এক ভক্ত গাঁজার কল্কে তৈরী করছে। পাশে প্রসাদ-প্রার্থী কয়জন। কথোপকথন চলছে জোর। ইয়ে সংসার কুছ নেই বাবা। সেরেফ ফাঁকি, বুঝা, হামলোগ সব এক একটা সং হ্যায়, জানতা। আর টেনো না বাবা, তাহলে আমাদের বলতে হবে যে কিছুই থাকবে না। সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কল্কেটি নিয়ে একটি দম দিয়ে বলে উঠলেন, কুছ নেই বাবা, দুনিয়াটা এক

প্রেকান্ড মায়া। এই দারা পুত্র তাত ভ্রাত কেউ নহে আপনা, যেমন পেট থেকে একা একা বাহির হুয়া তেমনি একাই যেতে হোগা। কি বলব বরমচারী। হ্যাঁ বাবা চেলাজী, কল্কেটা দাও দিকি একবারটি, সুখটান দিয়ে নিই।' হ্যাঁ যা বলছিলাম, এসেছ একেলা যাইবে একেলা মাঝখানে কেন বাধাও ঝামেলা। ও কেউ কিছু নয়। ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে বনবাসী হই। কার জন্যই বা কি?

এমন সময় আরেকটি ঝাঁকড়া চুলো লোক এসে বসলে। বসতেই 'কেউ কিছু নয়' বলে উঠলে, কি ফকীর, আবার তুমিও এসে জুটলে বাপ, তা আমার সে টাকার কি করলে? ফকীর বললে, দেব দাদা দেব, বাড়িতে অসুখ বিসুখ। দাদা বললেন, সে তো ক মাস ধরেই শুনছি। সোজা পথে হবে না দেখছি। কেস টেস করতেই হবে একটা।

আরেকটা দল এসে গেল। মড়া নামিয়ে রসিদ আনতে ছুটল কেউ কেউ। এক বেশ মোটা সোটা রসবড়ার মতো টাপুসটুপুস মহিলা ঘোরাঘুরি করছিলেন। সট করে এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁগা বাছা, কিসে গেল? ম্যালেরিয়ায়? অ। আহাহা, এমন জোয়ান, কার কোল জোড়া ধন রে। কোন্ আবাগীর কপাল পুড়ল গো। তা হ্যাঁ বাবা, বে থা কিছু হয়েছেল? আজ্ঞে হ্যাঁ। আহা। ছেলেপুলে কিছু? আজ্ঞে হ্যাঁ। উহু। বাপ মা? ওই যে এসেছে। ওহো ওহো রে।

একটু এগিয়ে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। দলটা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এই ভদ্রমহিলাটিকে কাঁদতে দেখে মেয়েছেলেরা কেঁদে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে অন্যত্তর গেছেন, চোখ পুঁছে আরেকজনকে জিগ্যেস করছেন, হ্যাঁ বাছা কিসে হল? কলেরায়। আহা গো।.........

ঘুরতে ঘুরতে কাঠগুদামে এসে হাজির হলাম। ভদ্রলোক ব্যাজার হয়ে বসে আছেন। গিয়ে বসতেই বললেন, লাস এসে গেছে? বিনীতভাবে বললুম, আজ্ঞে না, সেজন্য আসিনি। এমনিই একটু আলাপ সালাপ করতে আসা।

কথাবার্তা বলছি, এমন সময় কয়েকজন লোক ঢুকলো। দেখি কাঠ, চটপট। কাঠবাবু বললেন, কি, প্রমাণ সাইজের কাঠ চাই তো? ওরা অবাক হয়ে শুধুলে, প্রমাণ কি মশাই? কাঠবাবু বললেন, আহা বলি বয়স্ক লোক না কম বয়সী?

বুড়োমানুষ মশাই।

তাই তো জিগ্যেস করছি, ওরে এই ডোম, যা কাঠ দিয়ে আয়। জলদি জলদি। কাঠবাবু হুকুম দিলেন।

দেখুন মশাই বেশ শুকনো সাকনা দেখে দেবেন, যাতে এক পাকেই নেবে যায়। বহুদ্দুর যেতে হবে। কাঠবাবু বললেন, কিচ্ছু ভাববেন না, এসব আমাদের ঠিক করা আছে। লোকটি হাঁ হাঁ করে উঠলে, ও কী ওজন না করেই উঠচ্চ যে; ওজন দাও, ওজন দাও।

কাঠবাবু বললেন, কিচ্ছু ভাববেন না, আপনারা ওদিকটা দেখুন গে, ও ঠিকই নিয়ে যাবে। লোকটি খেঁকিয়ে উঠলে, বাক্‌তাল্লা ছাড়ুন দিকি। এই, চাপা ওজনে! ইয়ার্কীর জায়গা পাওনি। এই কাজ করে চুল পাকিয়ে ফেললুম।

গুণে গুণে ওজন করে কাঠ নিয়ে লোকটি চলে গেলে কাঠবাবু হতাশ হয়ে বললেন, ব্যাপারটা দেখলেন একবার। এসেছিস্ শ্মশানঘাটে, এখেনেও বিষয়বুদ্ধি! দেশটা গেল মশাই।

জিগ্যেস করলুম, কারবার চলে কেমন? দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কোথায়? একদম ডাল। এই বর্ষার সিজিনটা বড্ড মন্দা। আঠার বিশটার বেশী জমছেই না ডেলি। পুজোর পর থেকে একটু তেজী হবে। পৌষ মাঘে কিছু বুড়োর চালান আসবে। তারপর থেকে আর বর্ষার শুরু অব্দি তবু ব্যবসাটা কিছু চলবে। তারপর আবার মন্দা। কিছু নেই মশাই, কিচ্ছু নেই।

শোকসভা

দই-মিষ্টির শেষে যেমন পানের খিলি, না হলে ভোজ খতম হয় না। তেমনি চিতার শেষে শোকসভা, না হলে মরাটা কমপ্লিট হয় না। তাই তাকে দাহ করতে যাই আর না যাই তার শোক-সভায় হাজির হওয়া একবারটি চাই।

বেড়ে লাগে মশাই, ভদ্রলোক বললেন। বেঁচে থাকতে গুণে যার ঘাটতির শেষ নেই, পট্ করে চক্ষু দুটিকে মুদেছে কি অমনি তার গুণ গাইতে গালে আর জায়গা ধরে না। এই তো মশাই, কি বলব, এতখানি বয়েস হল, ভাল মুখে কেউ কথাটা কয়না। দেখেশুনে ইচ্ছে হয় টক করে একদিন টেঁসে গিয়ে নিজের শোক-সভায় এসে পিছনের বেঞ্চে জায়গা নিই।

দিনকতক আগে এক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারের শোকসভায় গেছলাম। লোকটার মতো হাড়কেপ্পন আর দুটো দেখিনি। ও যতদিন কমিশনার ছিল পাড়ার রাস্তায় খোয়া পড়েনি, নর্দমা হয়নি। এসব কথা ওই ভদ্রলোকেরই এক রাইভালের মুখে শোনা। প্রথম জীবনে তাঁরা দুজনে ক্লোজ ফ্রেণ্ড ছিলেন। যুদ্ধের বাজারে দু পয়সা কামিয়ে টাকার জোরে মিউনিসিপ্যালিটির গদীতে একজন বসতেই আরেকজন বিগড়ে গেলেন। তারপর চলল খিস্তিখেউড়। দুজনে দুই কাগজ খুলে ইনি ওনাকে প্রেমসে আক্রমণ চালালেন, নিজেদের বিদ্যেয় কুলালো না তো ভাড়াটে লেখক আনলেন, মুখ দেখাদেখি বন্ধ তো বহুদিনই হয়েছিল, নতুন উপসর্গ যেটা জুটলো সেটা মারাত্মক। দেখা হলেই কামড়ে দেওয়া। যাক বরাত মন্দ, কার্বাঙ্কল হয়ে কমিশনারটি তো স্বর্গে গেলেন, পাড়ার ছেলেরা ধরল একটা শোকজ্ঞাপক মিটিং করতে হবে। বক্তা হিসেবে বন্ধুটি এলেন। আমরা সব মুকিয়ে আছি কি বলে শুনতে। বেঁচে থাকতে তো সাধু কথা একটিও শুনিনি ওর সম্পর্কে।

তখন অন্য একজন বলছিলেন। আর বন্ধুটি সভাপতির সঙ্গে হেসে হেসে কথা কইছিলেন। ভদ্রলোকের বক্তৃতা শেষ হতেই ইনি উঠলেন।

বলবো কি মশাই, তাজ্জব বনে গেলুম, ভদ্রলোকের দুচোখ যেন জল-ভরা ভিস্তি হয়ে উঠল, সর্বদা টস টস, এই পড়ে তো এই পড়ে। সামলে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন, "যিনি আজ আমাদের ছেড়ে গেলেন, তাঁহার মতো মহৎপ্রাণ, উদারচেতা আর নাই। শুধু ব্যক্তিগত পরিচয় তাঁহার যা পাইয়াছি,

ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিবার যে সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহা হইতে একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তিনি ছিলেন নরশ্রেষ্ঠ। কর্মিষ্ঠ বলিষ্ঠ নির্ভীক শার্দুলসম এই মহান ব্যক্তিত্ব আমরা যাহা হারাইলাম তাহাতে যে ক্ষতি আমাদের হইল কোনদিন আর তাহা পূরণ করা যাইবে না।"

তারপর মশাই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা সেই ভদ্রলোকের গুণাবলী, ছোটকাল থেকে তিনি কি কি করেছেন, কতবার হে'চেছেন, কেসেছেন তার ফিরিস্তি দিয়ে তারপর বসলেন।

আরেকবার তো মশাই গিয়েছি এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ি, মফঃস্বলে। দেখি বন্ধুটি খেটেখুটে কবি নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যের উপর এক বিরাট প্রবন্ধ লিখছে। কি ব্যাপার? বন্ধু বললেন, আর বল কেন নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতিসভা, কিছু বলতে হবে। বলে বন্ধু বক্তৃতাটি আগাগোড়া শুনিয়ে ছাড়লেন। পরদিন মিটিং। শোনা লেকচার আবার শুনতে হল। মিটিং শেষ করে ফিরব এমন সময় কয়েকটি লোক এসে নেমন্তন্ন করলে, স্যার একবারটি আরেকটা সভায় যেতে হবে। ভজহরি দাসের শোকসভা।

ভজহরি দাসটি কে?

একজন বললেন, সে কী আমাদের ভজহরিকে চেনেন না? এথেলেটিক ক্লাবের ক্যাপ্টেন।

একজন মাস্‌ল্ ফুলিয়ে বলে উঠল, এ গ্রেট পয়েট অ্যাণ্ড ফিজিক্যাল কালচারিস্ট।

ঠিক আছে চল। বন্ধুটি সেই সভায় আবার সেই নবীন সেনের কাব্য-প্রতিভাটি আউড়ে দিলেন। বদলের মধ্যে শুধু নবীন সেনের জায়গায় ভজহরি দাসের নামটা জুড়ে দিলেন।

এই তো মশায় সেদিন কবি লোহিত মজুমদারের শোক-সভায় গেছলুম। গুটি কয়েক লোক ট্যাম্ ট্যাম্ করছে। কিন্তু বক্তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। এন্তার বক্তৃতা চলেছে। শুরু শুরু চা এল। খেয়ে শরীরের আলস্য ভাঙলুম। বেশ লাগল। সভায় চা-টা একটু না হলে কি জমে? কি এক বাজে রেওয়াজ বলুন দিকি, শোকসভায় আবার নিরম্বু বক্তৃতা শুনতে হয়। তবে এরা দেখলুম বেশ প্রোগ্রেসিভ। দিতে থুতে জানে। সন্ধ্যের সময়, বিষ্টি বিষ্টিও ছিল। এমন সময়েই তো 'হট্ টি'এর সঙ্গে শোকোচ্ছ্বাস জমে ভাল। তেলেভাজাটাও আশা করছিলুম। তা সেটা বোধ হয় প্রোগ্রামে ছিল না।

তা এ ভদ্দরলোকের কপাল খুব ভাল বলতে হবে। এ'রই আরেকটা

'সার্কাস'

শোকসভা দেখলুম এক কলেজে। বোধহয় দিনকতক পড়িয়েছিলেন সেখানে। কলেজের ছেলেরা মিটিং ডেকেছে। ভদ্রলোকের বন্ধুবান্ধর সব জড় হয়েছেন। সহ অধ্যাপক, যে কাগজে লিখতেন তার সম্পাদক, তাঁর প্রথম ছাত্র সবাই হাজির। একঘেয়ে বক্তৃতা কার শুনতে ভাল লাগে। পেছন থেকে একটি ছাত্র বললে, ধুর চলে চ, সেই এক কথা বার বার বলছে। কাঁহাতক আর শোনা যায়। অন্য ছেলেটি বললে দাঁড়া না, আরো দু একটা শুনি। এমন সময় সম্পাদক মশাই উঠলেন, উঠতে না উঠতেই বেশ জমে গেল। মাঝে মাঝে হাসির দমকে মন চাঙ্গা হয়ে উঠল। ছেলেটি বললে, জমেচে, বেড়ে বলছে, না রে? কি হাসায় মাইরী, উস্‌প্‌।

সম্পাদক মশাই শুরু করলেন, "প্রতিভা কার মধ্যে কেমনভাবে লুকোনো থাকে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না, লোহিতবাবুর সঙ্গে প্রথম দর্শনে আমিও তা বুঝতে পারিনি, অসংখ্য বাজে কাগজের মধ্যে একদিন একটা কবিতা হঠাৎ আমার চোখে পড়ল। কাগজ বের করতে হবে অথচ কবিতা নেই, কি করি, কবিতাটি পড়লুম, দেখলুম ওর মধ্যে বস্তু আছে, একটু অদল বদল করলেই ভাল চেহারা দাঁড়িয়ে যাবে। তাই করলুম। উনি উৎসাহ পেয়ে সেই যে কলম ধরলেন সে কলম আর চৌত্রিশ বছরের মধ্যে থাম্‌ল না। যোগাযোগ না ঘটলে প্রতিভার ঠিক স্ফুরণ হয় না। আমি অবশ্য আত্মশ্লাঘা করতে চাইনে। তবুও বলব, আমি যে ও'র প্রতিভার বিকাশপথে একটু কাজে লাগতে পেরেছি, তাতেই আমি ধন্য। আমাদের কাগজের আগামী সংখ্যাটি ও'রই স্মৃতিসংখ্যা হিসাবে বের করছি। তাই বেশী বলে আর কারো ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনে। যাঁরা সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চান আগাম অর্ডার দেবেন। নইলে সাপ্লাই দিতে পারব না হয়ত।

আরেকটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করি। সকলেই জানেন, তিনি এই পত্রিকার সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন তেমনটি আর কারো সঙ্গে নয়। তিনি এই পত্রিকাটিকেই নিজের পত্রিকা বলে মনে করতেন। কাজেই তাঁর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে এই পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখা। তাই বলি, আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁদের সবাইকেই বলি, অবিলম্বে এই পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে স্বর্গত কবি ও সাহিত্যিকের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। অনেকে বলবেন হয়ত, তবে এতদিন ধরে আপনার পত্রিকায় ওঁকে গালাগাল করছেন কেন? তার উত্তরে বলি, এটা আমাদের ঘরের কথা, এতে কান দেবেন না।"

সম্পাদক বসলেন তো উঠলেন এক অধ্যাপক। উঠেই বললেন, "ও'কে

আপনারা শুধু কবি বলেই জানেন, কিন্তু উনি ভাল মাস্টারও ছিলেন। ও'র কাছে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কি ভীষণ মারতেন। ছোট বেলায় ওঁর ভয়ে ইস্কুলে যেতে ভয় পেতুম, পথে ঘাটে চলতে পারতুম না পাছে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। বড় হয়ে অবিশ্যি আর অতটা ভয় ছিল না কারণ তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি, জেলার মধ্যে একটা স্কলারশিপ তো পাবই, ডিভিশনের মধ্যেও পাব এ রকম জল্পনা কল্পনাও চলছে। তা ডিভিশনের স্কলারশিপটা আর পাইনি। ওটা দু নম্বরের জন্যে পেলেন বন্ধুবর অতুল বাঁড়ুজ্জে। তখন অবশ্য চিনতুম না, পরে অতুলের সঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে আলাপ হল, সে আলাপ বন্ধুত্বে দাঁড়াল, আজ ছত্রিশ বছরের মধ্যে দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়নি। এই প্রগাঢ় বন্ধুত্বের রেওয়াজ আজকাল দেশ থেকে উঠে যাচ্ছে। আর কি-ই বা থাকল, কি-ই বা আছে। আগের মতো দুধ নেই, চাল নেই, চরিত্র নেই, চরিত্রের কথায় মনে পড়ল আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের কথা। তাঁর মতো সুদৃঢ় চরিত্র আমি বড় একটা দেখলুম না। যদি কোন জিনিসে একবার হাঁ বলতেন তো তা আর কিছুতেই না হত-না। সে সব আদর্শ আর কই? হায়, ভারত, তোমার ভবিষ্যৎ কি? বেশী আর কি বলব, আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনে। তবে দু চারটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। আদর্শ চরিত্র বলতে আমরা কি বুঝি? যে চরিত্র আদর্শ, তাই আদর্শ চরিত্র। এখন এই আদর্শ কি তা ভাল করে বুঝতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষ আদর্শের পিতৃভূমি। এখানে পিতার আদর্শ, ভ্রাতার আদর্শ, পতির আদর্শ, পত্নীর আদর্শ, নারীর আদর্শ, সীতা সাবিত্রী অহল্যা কুন্তী ইয়ে মানে চতুর্দিকে ছড়ানো, সেই আদর্শ কথায় বলে 'না জাগিলে ভারতললনা, এ ভারত আর জাগে না'—এই সব মহাপুরুষদের বাণী আদর্শজ্ঞান করে সেই আদর্শকে সম্মুখে রেখে আমাদের আগুয়ান হতে হবে। আমি একটা উদাহরণ দিই, একবার আমার পিতা ভ্রমবশত, মানুষ মাত্রেরই ভ্রম হয়, 'টু এর ইজ হিউম্যান,' আমাকে কঠিন প্রহার করেন, পাছে আমার পিতার ক্লেশ হয় সেইজন্য আমি ক্রন্দন করি নাই। তাই বলছি, আদর্শ বলতে কি বুঝি? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন"—ম্যাঁও। পেছন থেকে কে যেন বেড়াল ডেকে উঠল। বক্তা থতমত খেয়ে চুপ মেরে গেলেন।

সভাপতি মশাই মৃদুস্বরে বললেন, লোহিতবাবুর কথা কিছু বলুন।

বক্তা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "ও হ্যাঁ, মাস্টার মশাই-এর কথা বলছিলুম, উনি ভয়ানক বদরাগী ছিলেন, বেজায় মারতেন, ওঁর ভয়ে আমরা ইস্কুলে যেতুম না। তখন বড় খারাপ লাগত। কিন্তু এখন, আজ এই সভায় দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে, হায় অমন মার আর কাছ থেকে খাব। এইটুকু বলে আমি শেষ করছি।"

দর্শকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। একজন বললে, ওঃ মাল একখানা একেবারে. ম এ আকার. মূর্ধন্য ল।

আরেকজন বললেন, "লোহিতবাবু নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে খুব ভাল-বাসতেন। আর কাউকে কথা বলতে না দিয়ে শুধু নিজেই বকে যেতেন। বাগদাই বাগদাই কবিতা লিখে, বাড়ির বারান্দায় লোক ধরবার জন্য বসে থাকতেন। ওঁর ভয়ে ওপথে কেউ হাঁটত না। দৈবাৎ কেউ গিয়ে পড়লে আর রক্ষা নেই, ধরে বাড়িতে নিয়ে যেতেন, তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা পাঠ চলত। বেচারার আর নিস্তার ছিল না। একদিন হয়েছে কি, আর একজন কবি এক বিরাট প্রবন্ধ লিখে ওঁকে শোনাতে এসেছেন। সেইদিন ওঁর দুর্দশা দেখেছিলুম। একটা কথা বলতে পারছেন না, বলবার জন্য আইঢাই। কিন্তু সে ভদ্রলোকের ভ্রূক্ষেপ নেই। পাতার পর পাতা অম্লানবদনে পড়ে চলেছেন। বিরক্তি নেই, ক্লান্তি নেই। নটায় পড়তে শুরু করেছিলেন। শেষ করলেন সাড়ে এগারোটাতে। লোহিতবাবুর আশা, উনিও দু-চারটে কবিতা শোনাবেন। এই নিয়ে লড়ালড়ি হল। তারপর সে ভদ্রলোককে শুনতে হল পাল্টা। পালা যখন শেষ হল রাত তখন একটা। সেদিন লোহিতবাবুর আদেখ্‌লেপনায় ওঁর উপর বিরক্ত হয়েছিলুম। আজ দুঃখ হচ্ছে, সে জিনিস আর তো দেখব না।"

অবশেষে সভাপতি বললেন, "আজ যাঁর শোকসভায় আমি হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছি, তিনি কে জানিনে. শুনলুম তিনি কবি ছিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তাঁর একটিও কবিতা পড়িনি, কিন্তু তাতে বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না যে, তিনি বিরাট কবি ছিলেন, এ গ্রেট পোয়েট, শুনলুম তিনি ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখে গিয়েছেন, দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি তাঁর একটি প্রবন্ধও পড়িনি, কিন্তু এটা বুঝেছি, তিনি মস্ত বড় চিন্তাশীল ছিলেন, এ গ্রেট থিংকার, তাঁকে চোখে দেখিনি, তবু জানি তিনি কন্দর্পকান্তি, তাঁর কথা শুনিনি তবু জানি তিনি কিন্নরকণ্ঠ। তিনি নিশ্চয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। অত্যাচারী সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজের অত্যাচার তাঁর হিমালয়সদৃশ মস্তককে কখনো নোয়াতে পারেনি, এ'দের লক্ষ্য করেই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'বল বীর চির উন্নত মম শির'। তিনি যে শুধু স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন তা নয়, ভাল খেলোয়াড়ও অবশ্যই ছিলেন, ঈর্ষাকাতর বাঙালী তাঁকে সুযোগ দেয়নি, নইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হাইজাম্প লঙ্‌-জাম্পে তিনি অনায়াসে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হতে পারতেন। তিনি যে মহাপুরুষ, তিনি যে ত্যাগী, তিনি যে ঋষি, তিনি যে মহান, বিরাট তা সবই সত্যি। কারণ তিনি দেহ রেখেছেন। আজ এই সভায় দাঁড়িয়ে আমি সেই লোকজয়ী কালজয়ী মহাপুরুষকে, সেই আচার্যকে শ্রদ্ধা জানাই।"

কেয়া ভাও

লাখ লাখ টাকার লেনদেন। সেরেফ শুধু মুখের কথায়। তোমার জবান তুমি যদি না রাখ তো আমারটা আমিই বা রাখব কেন? আর কথার সুতোয় যে কারবার পাকাপোক্ত ঝুলে আছে, তার একটু নড়চড়েই যে বুনিয়াদটা উল্টে ঝড়াক করে মাটিতে নাবে, এতো সব্বারই জানা। তাই পারতপক্ষে জবান নড়চড় কেউ করতে চায় না। ফাটকা বাজারের এই হল নিয়ম।

খাতায় কলমে লিখিত, বারটায় মার্কেট খুলবে আর বন্ধ হবে উইক্-ডেতে চারটেয়, শনিবারে দুটোয়। কিন্তু সে নিয়ম কে মানে? ভোর আটটায় আসি আর রাত আটটায় বাড়ি ফিরি। বেসরকারী বাজার মশাই রাতদিনই খোলা। বাড়িতে ফোন আছে, ভদ্রলোক বললেন, রাত দুটোয় ক্রিং ক্রিং। ফোন তুললুম। বোসবাবু ক্যায়া ভাও? বললুম, ক্লোজিং সাড়ে সাত।

কাল মশাই বাজার বড্ড ফ্লাকচুয়েট (ওঠানামা) করেছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণে বড্ড টালমাটাল। বিফোর ক্লোজিং সাত সাড়ে সাত, সাত সাড়ে সাত করতে করতে ঝপ্ করে লাস্ট মোমেণ্টে সাড়ে পাঁচ ছয়ে নেমে পড়ল। দু-হাজার শেয়ার ধরে রেখেছিলুম হাজার চারেক কিলিয়ার করেছি সাড়ে সাতেই। দু-হাজার আর পারলুম না কিছুতেই। বড্ড চঞ্চল আছি।

ভদ্রলোকের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। টেবিলে তিনটি ফোন। তিনটেই তারস্বরে বেজে চলেছে। ফোন তুললেইঃ কেয়া ভাও? দর কত? সাত সাড়ে সাত।

অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করছিলুম। এক অদ্ভুত রাজ্যে এসে পড়েছি। এর লোক আলাদা, ভাষা আলাদা। এদের চলন-বলন সবই আলাদা।

একটু ফুরসৎ পেতেই জিগ্যেস করলুম, সাত সাড়ে সাত ব্যাপারটি কি? ভদ্রলোক একটুখানি মোলায়েম হেসে বললেন, শেয়ারের দর। এখন সাত আনা সাড়ে সাত আনায় ওঠা-নামা করছে। বুঝলেন না?

বললুম, আজ্ঞে একটু খোলসা করে দিলে ভাল হয়।

ভদ্রলোক সদয় হলেন। বললেন, যে শেয়ারটার দাম দশ টাকা, সেই দশ টাকার শেয়ারটার দর এখন উঠেছে ছাব্বিশ টাকা সাত আনা, সাড়ে সাত আনা। টাকার কথাটা আমরা উল্লেখ করিনে, আনা নিয়েই টানাটানি।

'সার্কাস'

কথা শেষ না হতেই ফোন বাজল, ক্রিং ক্রিং। ভদ্রলোক ফোন তুলেই জিগ্যেস করলেন, কেয়া ভাও? সাড়ে ছ-সাত? ফোন রেখে বললেন, অঃ, কমছে। একটু বসুন, টপ করে একবার নিচে থেকে একটা পাক মেরে আসি। ভদ্রলোক দুদ্দাড় করে চলে গেলেন। এলেন দুই মারোয়াড়ী যুবক। একে যুবক, তায় মডার্ন। আঃ যা দেখলুম না, যেন ভীম নাগের কড়াপাক। রেঙ্কিনের বাড়ির তলোয়ার-ধার সুট, এক থোকা গোলাপ বুক-বোতামে, দশ আঙুলে বিশটি আংটি, আর মুখে কেয়া ভাও? এমন সরেশ চিজ চাক্ষুষ করে মেজাজ আমার তর হয়ে গেল।

দুজনে সামনে বসে কথাবার্তা চালাতে শুরু করলেন বোম্বাই মেলের স্পীডে। বুঝলুম দুহুঁ দোঁহের মনের কথাটি নিজের ছিপে গেঁথে তুলতে চাইছেন। এই মন্দির বাজারে কিছু মন্দি খেয়ে রাখব নাকি? ভাও আরো নামবে বলে মনে হচ্ছে। অন্যজন বললে, হাঁ, কম্‌সে কম্ দো আনা তো নামবেই। বলাবলি করতেই একজন ফোন তুলে জিগ্যেস করলে, কেয়া ভাও? ছ-সাড়ে পাঁচ? তো ঠিক হ্যায়, চারশ' লে লো, চারশ' কিনে ফেল।

কেনা-বেচার ব্যাপারটা বড় মজাদার। শেয়ারের কাগজটি বেশীরভাগ লোকেই চোখে দেখে না, অথচ হাজার হাজার টাকা লেন-দেন হয়ে যাচ্ছে। এরা বসে বসে সাড়ে ছ' আনায় চারশ' কিনলে, সওয়া ছ' আনায় পাঁচশ কিনলে, ট্যাঁক থেকে আধলাটি খসাতে হল না।

ভদ্রলোক ফিরে আসতেই এ দুজন সমস্বরে হাঁক ছাড়লে, কেয়া ভাও? সওয়া পাঁচ, পাঁচ। একজন বললেন, স্টীল কোম্পানী? ভদ্রলোক বললেন, জানিনে। টক্ করে একজন ফোন তুলে শুধোল, ভাই, স্টীল কোম্পানী? ঢাই, তিন। আড়াই তিন। বেচো দোশ। দুশ বেচে দাও।

চল ভাই নিচুমে। দুজনে বেরিয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, নিচে গিয়ে দেখুন কি কাণ্ড। প্যাসেজটুকু পেরিয়ে আসতে জানটা তুবড়ে গেছে।

ভদ্রলোক অতি অন্যমনস্ক। এখানকার সবাই তাই। বললেন, আমাদের কথা ছেড়ে দিন, ধড় আর মন দু'জায়গায় থাকে। বসে আছি এখানে, কান আছে ফোনে, মন ঘুরছে হেথাসেথা। সুস্থির হয়ে দুদণ্ড কথা বলব সে উপায় কি আছে? হ্যালো কেয়া ভাও? সাড়ে ছ-সাত? একটু চড়ছে মশাই। চলুন নিচেই যাই।

বেশ লম্বা-চওড়া বাড়িখান। তলায় তলায় ব্রোকারদের অফিস। অফিস মানে একটি করে খুপরী। টেবিল চেয়ার যত তার অধিক ফোন। মুহূর্তে

মুহূর্তে কড়াং কড়াং। তারপর ফোনটি কারো মুখের কাছে উঠছে আর একটিমাত্র কথাঃ কেয়া ভাও, তারপর কতকগুলো সংখ্যার আনাগোনা।

দোতলায় দাঁড়িয়েই মনে হল যেন সমুদ্রটাকে চেন বেঁধে কাছাকাছি আটকে রাখা হয়েছিল, কোন মোকায় চেন ছিঁড়ে হুঙ্কার দিয়ে নিচের তলে ঢুকে পড়েছে। বাপ্‌স সে কি গর্জন! কতকগুলো তালগোল পাকানো শব্দ সমষ্টির মাঝ থেকে একটা চীৎকার তীরের ফলা হয়ে কানে এসে বিঁধল। সওয়া সাত লিয়া হাজার, সওয়া সাত লিয়া হাজার, সওয়া সাত লিয়া হাজার।

হৈ-চৈ চেঁচামেচি বল্গা ছিঁড়ে যেন এধার ওধার ছুটাছুটি করছে। লিয়া পান্‌চ-শ সওয়া সাত (সওয়া সাতে পাঁচশ নিলাম)। লিয়া তিন শ, লিয়া পঁচাশ! কে কার কথা শোনে। তখন কেনার পালা পড়েছে। সবাই একধার থেকে কিনতে লেগেছে। যে ব্যক্তিটি দর নামার শুরুতেই ভয় পেয়ে দু' পয়সা লোকসানে মাল ছেড়ে দিয়েছিল, এখন কেনার হিড়িকে দর উঠতে দেখে একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত কামড়াচ্ছিল। লিয়া লিয়া করতে করতে হঠাৎ দেখি বাজার ঘুরতে শুরু করল। চাদ্দিক থেকে বেচা বেচা রব উঠল। এবারে সে লোকটির মোকা। তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল বে—চা হাজার, বে—চা—জার, বে—চা—জার (হাজার বেচলুম)।

আবার হৈ-হুড়ুদ্দুম লেগে গেল। রামবিরাম বালসুখরামের কাছা গণ্ডেরীমল চালুমলের পকেটে উঠল। এর পা সে মাড়িয়ে দিলে। গোলমাল অত্যন্ত চাগিয়ে উঠল। অতিকষ্টে পাশ কাটিয়ে আবার উপরতলে উঠলুম। ভদ্রলোকও চট করে পাশে এসে বললেন, কাট্‌নিতে কিছু খেলে এলাম। বললুম, কাট্‌নি আবার কি মশাই? বললেন, আরে ওই তো রাস্তায়। ওখানে যে খেলাটা হয়, সেটা বে-আইনী তো। তার তো আর হিসেবপত্তর নেই, তাই ইনকাম ট্যাক্সের বালাই নেই। এই কাট্‌নিতেও লাখ লাখ টাকা বেচা লিয়া হয়। সব উইদাউট লেখাপড়া। শেয়ার বাজারের ভেতরে যে লেন-দেন হয়, তার তো হিসেব থাকে। সরকারকে হিস্যা বাবদে ট্যাক্স দিতে হয়। কিন্তু রাস্তায় তো সে বালাই নেই। লস্‌ লাভ সবই নেট্‌।

যাকগে যাক উপরে চলুন। এক কাপ চা খাইগে। ঘরে এসে দেখি ফোন চলেছে। ভদ্রলোকের পার্টনার ফোন ধরেছেন। হ্যাঁ, বাজার চড়বে বৈকি। দেখে তো মনে হয় বেশ মজবুত। কি বললেন, কিছু তেজিতে লাগাবেন? তা বেশ তো। কত? পাঁচশ? আচ্ছা দেখছি।

আরেকটি ফোন বেজে উঠতেই এ ফোনটি 'এক মিনিট ধরুন' বলে নামিয়ে রাখলে। রেখে ও ফোনটি তুললে। কি খবর ভাই? হ্যাঁ, বাজার

সুবিধে ঠেকছে না, এখন কিছু চড়ছে বটে, কিন্তু আসলে বড় ঢিলে। কি বলছ? কিছু মন্দিতে লাগাবে? তা মন্দ কি? কাল বাজারে জোর হবে কিনা এখন কি করে বলব? তবে হবেই যে, এমন লক্ষণও কিছু দেখছি নে। তা বেশত, মন্দিতে কত লাগাবে বললে? দুশ? আচ্ছা দেখছি।

সে ফোনটি রেখে আবার আগেরটার সঙ্গে কথা চালালে। কি বলছেন বাজারে তেজ নেই? আরে না না বেশ মজবুত। মন্দির কোন লক্ষণই নেই। তা লাগান পাঁচশ। আচ্ছা দেখছি।

ফোনটি রেখে পার্টনার বেরিয়ে গেল। ভদ্রলোক বললেন, বিজনেস্‌-বাজীর চক্কর দেখলেন একবার। এক কানে তেজির মন্তর দিলে, অন্য কানে মন্দির। যে নৈবেদ্যিতে যে দেবতা তুষ্টু। লোকের মন জোগাতে না পারলে পার্টি থাকবে কেন?

এখানে প্রেম চাঁদির সঙ্গে। যার বরাতের পালে সুবাতাস তার বোটের সঙ্গে বোট বাঁধতে সবাই এখানে পা তুলেই আছে। আরে মশাই, কথা বলতুম না, এই সেদিন পর্যন্তও ছিল একটা পাতি-দালাল। আর লড়াইটা পার হতে না হতেই ফেঁপে-ফুলে লাল। এখন তো লোকটা এই মার্কেটের হিরো। এক পাল মোসাহেব, হেঁ হেঁ করতে করতে পেছু পেছু চলছে।

ব্যাটাচ্ছেলেরা বাজারটা খারাপ করে দিলে মশাই। দল তৈরী করে ইচ্ছেমতো কণ্ট্রোল করছে। দাম বাড়াচ্ছে কমাচ্ছে। তবে হয়েও এসেছে, আর বেশী দেরী নয়। কিছু বলতে তো কিছু ছিল না। চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই আশী লাখ টাকা রোজগার করলে। ছেলে বললে, বাবা, আর ফাটকায় কাজ নেই, এসো এবারে একটা কারবার-টারবার খুলি। তা এ নেশায় একবার মজে গেলে ছাড়ান পাবে কার সাধ্য? যে পথে শুধু হাতে আশী লক্ষ এসেছিল সেই পথেই ষাট লক্ষ বেরিয়ে গেছে। তবু লোকটি পথ বদলায় নি।

শুধু কি বড়লোক মরে, বড়লোক আর কটা মরে, লোকসান যা দেয় পুষিয়েও নেয়। মরে গরীব, মরে মধ্যবিত্ত। চাকরীবাকরী করছে, কি ছোট-খাট ব্যবসা ফেঁদেছে, দু'পয়সা হাতে জমল কি রাতারাতি বড়লোক হবার সখ চাপল। বাস, এলেন ফাটকা খেলতে। বাজার বোঝে না কিছু, কিছু জানে শোনে না। যখন চোঁ চোঁ করে দাম চড়ছে, ফেরেববাজের পাল্লায় পড়ে একেবারে চড়াস্য চড়ায় গিয়ে কিনে বসলে। বাস তারপরই হু হু করে দাম কমতে লাগল। তখন বাছাধনদের চক্ষে সরষের ফুল নৃত্য করতে থাকে। কিছুক্ষণ আশায় আশায় থাকে, আর হয়ত কমবে না, আর হয়ত কমবে না, কিন্তু যেই দেখল কমছে, দিলে বিক্রী করে। নেট্‌ লভ্যাংশ লবডঙ্কা। যা

গয়নাগাটি ছিল বৌ-মেয়ের দেনা মেটাতে তা পত্রপাঠ গেল স্যাকরার দোকানে। সব ফক্কীকার। এই সব নভিস্‌রাই তো শিকার। এদের ট্যাঁক খালি করেই তো আজ কয়েকজন ফ্‌লে-ফে‌ঁপে উঠছে।

স্পেকুলেশন মানে ফাটকা তো জ্‌য়াখেলা নয়। খ্‌ব কড়া হিসেব আছে। এটা একটা বিজ্ঞানও বটে। সেই হিসেবমাফিক যে চলবে, সে বড়লোক খ্‌ব একটা হোক না হোক ডুবেবে না কখনো, অবশ্য সবেরই ম্‌লাধার, সেই বরাত।

দেখলেন না, ওই পেছন দিকে জ্যোতিষীদের কেমন প্রতাপ। সার সার বসে আছে পাঁজি-প‌ু‌ঁথি নিয়ে। কি রাশি? ত্‌লা। আজ তিথি হল প্রতিপদ। চন্দ্র এখন ধন্‌রাশিতে। তা মন্দি লাগাইয়ে। দেখি আপনার হাত। আরে, শনির দ্‌ষ্টি এখন শ্‌ক্রের উপর। এ তো খোলা বরাত। তেজিতে লাগান। সিওর সাক্‌সেস্‌।

দ্‌জনেই লাগালে মশাই। ডুবলে। ডুবছে, তব্‌ও যাবে। ফেটালিস্ট, বড্ড ভাগ্যনির্ভর হয়ে যেতে হয়। এই আমিও হয়েছি।

একটি লোক ঢ্‌কতেই কথা বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্রলোক শ্‌ধ্‌লেন, কেয়া ভাও? লোকটি বললে, ক্লোজিংকা ভাও হ্যায় সওয়া ছয়। ক্লোজিং-এর দর সোয়া ছয়। তো ভাই, দেড়শ মন্দি খাই চল।

দু' টাকায় মামলা হাসিল

যেমন তক্তপোশে ভাদ্দরে ছারপোকা ঠিক দেখল্লম লোয়র কোর্টে উকীল। বাইরের উঠোনটা একেবারে থিগবিগ করছে। গেলাম কি ছেঁকে ধরলে।

যত বলি—না মশাই, কোনো কাজকম্মে নয়, এমনি ঘুরতে ফিরতে আসা তা কে শোনে? কিসের কেস, কি বৃত্তান্ত, টানাটানি হ্যাঁচড়াহেঁচড়ি, শেষ পর্যন্ত 'নয় একটা এ্যাপিডেবিট্ করুন।'

ভাল জ্বালা! গিয়েছি এক বন্ধুকে খুঁজতে, পাশ করে কদিন ধরে কোর্টে হাঁটাহাঁটি সুরু করেছে, কোথায় তার সঙ্গে দুচারটে কথা কইব তা নয়, পড়লুম এক ফিঙের পাল্লায়। হাত এড়িয়ে ঢুকলাম বার-লাইব্রেরীতে। লম্বা এক টেবিলের চৌদিকে উকীল। কেউ ঘুমুচ্ছেন, কেউ খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খুঁটছেন। দুচারজন একখানা খবরের কাগজ আটখানা করে তারই পাতায় চোখ বুলুচ্ছেন। উঁকি মারতেই 'কি চাই, কি চাই' করে ক্যাঁচম্যাচ হতেই সটকে পড়লুম।

দরজা বরাবর আসতেই এক জটলায় পড়লুম। দুই উকীলে ঝগড়া চলেছে, সালিশ করছেন আরেকজন। একজন একটু ওরই মধ্যে গাত্তিলাগা, গায়ের কোটটাকে কালো বলেই মনে হল। পরস্পরে বলছিলেন, বলরামদা আপনিই বলুন দিকি, কি অন্যায় কথা, ও আমার ইস্কুল ফ্রেন্ড, ওর বিয়ে আমি দিয়ে দিইছি, পরীক্ষায় আন্সার বলে দিইছি, আর ওর কিনা এমন ব্যাভার। রাস্কেল, লম্পট কোথাকার।

অন্য জন একটু তোৎলা। বললেন, খপরদা-দা-আর ম্-মুখ স্-স্-স্সামলে বল্লিস। গাগ্লাগাগাল খামাক্-কা দিবিনি। আরে রেখে দে তোর চোখ রাঙানী, রেড আই আমাকে দেখাসনি, আমি মিছে কথা কইনে। এই তো বলরামদাই আছেন, আচ্ছা বলরামদা আপনিই বলুন, ওর বয়েস কত হবে?

কত আর, সাম ফিফটি এইট। বাষট্টি, দাদা বাষট্টি, এই ওকেই জিজ্ঞেস করুন। আর ওর লাস্ট ইস্যুর বয়েস কত? আড়াই বছর। তাহলেই বুঝুন ক্যারেক্টারটি কেমন? আমি তো ওরই সমান বয়সী, কিন্তু আমার ছোট ছেলে,

এই বাইশ বছরে পড়ল। সেটা বুঝুন একবার। আর অসুখ হয়ে দশ দিন পড়ে ছিলুম, ব্যাটা বলে কিনা, আমি মরে গেছি। এই সব রটিয়ে আমার দুজন মক্কেল ভাঙিয়ে নিয়েছে। বলুন দিকি।

বাইরে বেরুতেই চেনা এক লোকের সংগে দেখা। জিগ্যেস করলুম, কি দাদা? দাদা বললেন, আর বল না ভাই। ব্যাটাদের কাণ্ড। কাল রাত্তিরে আসছিলাম সাইকেল করে, কনেস্টবল ধরলে। কি? না উইদাউট লাইট। বল দিকিনি, চোখের সামনে জলজ্যান্ত লাইট রয়েছে আর বলে কিনা, উইদাউট লাইট। বললুম, চোখের মাথা কি চিবিয়ে খেয়েছ সেপাইজী। লাইটটা দেখতে পারছ না। সেপাইজী বললেন, হাঁ উ তো ঠিক হ্যায়, অব্ থানা মে চলিয়ে। দেখলুম বাতিটি নিভে গেছে। বললুম, হ্যাঁ বাবা, হাম্ তো দেখা নেই, কোন সময় অজান্তে নিভ গিয়া। সেপাই বললে, হাঁ উ বাত্ তো বিলকুল ঠিক, লেকিন দেরী মত্ কিজিয়ে, থানেমে তো জানেই হোগা। কেস তো লিখানেই পড়ে গা।

বুঝলুম ব্যাটা ল্যাজে খেলাচ্ছে, বিয়ারিং পোস্টে কিছু হবে না। পকেটে হাত দিয়ে দেখি সেখানটায় উঁচু নিচু কিছু নেই, সেরেফ লেভেল। কি আর করা, গুটি গুটি চললুম থানায়। দারোগাবাবু ঝড়াক্সে এক খাতা বের করে বললেন, সই করুন। বললুম, কিসে সই করছি দেখি একবার? দারোগাবাবু বললেন, দ্যাখাদেখির কি আছে, নিয়ম হচ্ছে সই করা, সই করুন। বললুম, তা কেন? আমাকে একবারটি দেখতে দিন। দারোগাবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, এতো বড্ড দিক করতে সুরু করলে, এই নিন, কি দেখবার আছে দেখুন, দেখে সইটা করুন দিকি। দেখলুম অপরাধ হচ্ছে উইদাউট লাইটে সাইকেল চালনা। বললুম, ব্যাপারটাতো বেশ মশাই, একটা লাইট যে লাগানো রয়েছে সাইকেলে, সেটা অমনি উইদাউট হয়ে যাবে?

বলতেই দারোগা সাহেব চটে উঠলেন, মশাই-এর বাড়ি বর্ধমান না চব্বিশ পরগণা, বড় যে আইন কবলাচ্ছেন অ্যাঁ, দেখাচ্ছি মজা। বলেই তো ভাই দিলে চার্জসীট, সাইকেলটি দিলে রেখে, আর বললে সকাল দশটায় হাজির হতে। তা এসেছি দশটায় কিন্তু কোথায় কে? গোটা এগারোয় বাবুরা সব এলেন একে একে। ইতিমধ্যে উকিলের আক্রমণে তো ভাই গায়ে ঘা হয়ে গেল। এখন এই একটা বাজল, কিন্তু আরো কতক্ষণ বসতে হয় ঠিক কি?

সামনে বসেছিল গোটাকতক লোক। দেখলেই ফিরিঅলা কেলাস বলে মনে হয়। পেছনে উকীল লেগেছে। একটি লোক অনবরত বকে যাচ্ছে, আমার কোন কসুর নেই বাবা, ছেড়ে দাও। থানাদারকে জিগ্যেস করলুম, কি হে

ওকে ধরেছ কেন? বললে, পেটি কেস হ্যায়, 'রোড বুলাকিন' (রাস্তা জুড়ে রাখা)। লোকটি বললে, না বাবু আমি কিছু বিক্রী করিনি, বাজার করে বাড়ি ফিরছিলাম, হাত থেকে বাজার পড়ে গেল, উবু হয়ে কুড়িয়ে নিচ্ছি, এসে চেপে ধরলে। বললে, চল থানায়। আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, গরীব মানুষ।

তোৎলা উকীলটি এমন সময় বেরিয়ে এসে ইদিক সিদিক চাইছেন। থানাদার বললে, 'এই দেখ, উ যো ভকিলবাবু আছে না, উনকা বড়া জোর পাওয়ার আছে,' ওকে যদি ধরতে পারিস তো চটপট খালাস হয়ে যাবি। আর চার আনা ফিস্ ওকে দিয়ে দিবি। 'যা গোড় পাকাড়'। লোকটি ছুটে গিয়েই পা চেপে ধরলে, বাবু আমাকে খালাস দিন, আমার কোন কসুর নেই। উকীলটি তো খুব খুশী। বললেন, ভা-আ-বিস্ নি। ঠিক করে দোব'খন। ফি ফ্ ফি এনেছিস? লোকটি ট্যাঁক থেকে টকাস করে একটি সিকি বার করে তাঁর হাতে গুঁজে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে 'ই-ই-ই-ইয়ার্কী' বলেই উকীলবাবুটি টেনে কসালেন এক চড়। হৈ হৈ পড়ে গেল। লোক জমল। উকীলবাবু সরে পড়লেন।

হঠাৎ বড় গোল হ'ল। প্যায়দা এসে আসামীদের ডাকতে সুরু করলে। এর তার নাম ধরে ডাকে, আর হাজির বলে সাড়া নেয়। উকীলে ঘা খাওয়া লোকটির ডাক আসতেই পেস্কার বললেন, হুজুর লোকটি খামাকা মার খেয়েছে তোৎলা উকীলের কাছে, ওকে মাফ করে দিন। হুজুর হেসে মাফ দিলেন।

বন্ধুটি গেলেন। হুজুর জিগ্যেস করলেন, কি ট্রাভেলিং উইদাউট লাইট? বন্ধু বললেন, না হুজুর ট্রাভেলিং উইদাটউ লাইটলিট্। বাতি ছিল, তবে নিভে গিয়েছিল। আচ্ছা, ফাইন আটা আনা। বন্ধুটি আপত্তি জানালেন জরিমানার মিটার এক টাকায় উঠল। টাকা গুণে বেরিয়ে এসে বললে, আগে জানলে উকীলবাবুর একটা থাপ্পড় খেয়ে নিতুম।

রেস্টুরেণ্টে তর্ক বেঁধেছে। আচ্ছা দেখুন দিকি, গান শুনবে 'অক্রূর সংবাদ,' পয়সা দিতে চাইছে একটা, বাপুহে, এসেছ কোর্টে, শ্বশুর বাড়ি নয়, এখানে সব কাজে পয়সা, প্যায়দা থেকে পেস্কার সবাই চোয়াল ফাঁক করেই আছে, তোমার ট্যাঁক না চুবসালে ওদের হাঁ তো বন্ধ হবে না, আমার কাছা ধরে টানলে কি হবে? উকীলবাবু বুঝিয়ে বুঝিয়ে হন্দ হলেন, কিন্তু মক্কেলটি গোঁ ছাড়ে না। বললে, তা কি ক'রে হয় বাবু, আপনিই বলেছ দু' টাকায় মামলা হাঁসিল করে দেবা, আবার এখুন বলছ

'এপিট-ওপিট' কত্তে হবে ট্যাকা দ্যাও। আবার বলছ, কেস ওঠাতে হবে ট্যাকা দ্যাও। আবার বলছ, সাক্ষী সাজাতে হবে ট্যাকা দ্যাও। খালি দফায় দফায় ট্যাকা, অত ট্যাকা দিতে হবে আগে কেন বললানি, অন্য উকীল দিতাম।

উকীলবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন, হ্যাঁ অন্য উকীল এই কোর্টের নাতজামাই। সে তোর বিনা পয়সায় এফিডেবিট করে দেবে, কেস ওঠাবে কোর্টে, সাক্ষী সাজাবে, তোমায় মামলা জিতিয়ে রাজা করে দেবে। নে তোর টাকা, যা সেই উকীলের কাছে, হুজুরের জেরায় যাদের কাছা কোঁচা ভিজে যায় তারা আবার উকীল। এই শর্মার কাছে যত কেসের জিত হয়েছে তা আর কার কাছে হয়েছে রে, মুখ্খু কোথাকার। আমি ছাড়া এ কোর্টে আর উকীল কই। আর যারা আছে, দেখেছিস তাদের চেহারা? তাদের সব জুতোর মধ্যে খুর আর কাছার আড়ালে ল্যাজ নুকুনো, বুঝলি, হতভাগা। সস্তা চাস যদি রিফু উকীল লাগা।

মক্কেল ভড়কে গেল। বাবু চট ক্যান, আপনার কাছে এমনি এইছি? তা যা তোমার ধর্মে লাগে করেন? উকীলবাবু বললেন, তাই বল, শোন দুটো টোর্নি সাক্ষী নে, খর্চা একটু বেশী পড়বে, তা হোক জেরায় টিঁকবে। বল তো এখুনি তাদের ডাকি। এক্ষুনি আবার কার হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পড়বে, যাবে হাত থেকে ফস্কে। আমার আবার সব সরেশ মাল কিনা, মোটে পড়তে পায় না। মক্কেল ততক্ষণে টোপ গিলেছে। বললে, যা কর আপুনি।

ইতস্তত ঘুরছিলুম। ইচ্ছে ছিল একটা মামলা দেখব। সুযোগ ঘটল, ঢুকে পড়লুম এক ঘরে। এক উকীলবাবু জেরা করছিলেন।

হ্যাঁ, তোমার নাম কেয়া বোলো? নুরমহম্মদ। হুজুর এর নাম নুর মহম্মদ।

—বেশ তুম বাঁশতলা গলিকা রহনেঅলা হ্যায়?—জী হাঁ।

হুজুর, বলছে আজ্ঞে হ্যাঁ।

উকীলবাবুর পাঁয়তারা দেখে ভাবলুম, ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক। উকীলবাবু খাস বরিশালী হিন্দিতে জেরা চালাচ্ছেন। হুজুর মুখে নিভাব এনে শুনে যাচ্ছেন। টাইম পেয়ে পেস্কারটি এক পশলা ঘুমিয়ে নিলে।

উকীলবাবুর লবজ শুনে আমার এক পুরনো গল্প মনে পড়ল। আমার এক বন্ধুর কাকা প্রোফেসার ছিলেন। উকীলবাবুর মুলুকী লোক। সাঁয়ত্রিশ বছর কলকাতায় একাদিক্রমে পড়িয়েও দ্যাশের শিল্প—ভাষা ছাড়তে পারেননি। তাঁর বৌদি একবার জিগ্যেস করেছিলেন, আচ্ছা ঠাকুরপো, এ্যাদ্দিন কলকাতা থেকেও আপনার ভাষা বদলাল না? তা ক্লাশের ছেলেরা কিছু বলে না?

'সার্কাস'

প্রোফেসার বললেন, হঃ আমি ইংরাজিতে কই। তা একবার ধরছিল। একটা পোলায় কয় কি স্যার আপনের বাড়ি কি পূর্ববঙ্গে। তা হে এক্কেরে বদমাইস, হের কিচ্ছু হইবে না।

উকীলবাবুর হিন্দি শুনে ভাবলুম একবার শুধোই—সার আপনের বাড়িও হেই পূর্ববঙ্গে?

বলতে হল না, হুজুরই বললেন, অনুবাদ করতে হবে না, জেরা করুন?

আচ্ছা হুজুর। অন্য সাক্ষী বোলাও। তো এল অন্য সাক্ষী। বেশ, সুরু হল জেরা, তোমাব নাম রাম খেলাওন? হাঁ হুজুর। তোমার ঘর হ্যায় বাঁশতলা গলি? না হুজুর, হামারা গলি হ্যায় চাঁপাতলা। কাঁহা? চাঁপাতলা। সে আবার কোন স্থান? আচমকা শক পেয়ে উকীলবাবু ট্যারা হয়ে গেলেন। সাক্ষী বললেন, বাঁশতলাকা দুসরা রাস্তা। ও আচ্ছা, তুম ফিন ফিন জুম্মাকো উধরসে যাতা হ্যায়?

হুজুর খচে উঠেছেন ইতিমধ্যে। বললেন, আই ডোণ্ট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড, হোয়ার আর ইউ ড্রাইভিং অ্যাট। (কি বলতে চান, বুঝতে পারলাম না)

আমরাও না। বিরক্ত লাগল, উঠে এলাম।' আরো খানিক ঘোরাঘুরি করে চলে আসব। দেখি উকীলটি বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান কিনছেন। উকীল বললেন, দাও দেহি দুই খিলি পান। জর্দা দিও বুঝচ, আইজ এজলাসে ছিল এক ভোঁপরা পাডা। আমার জেরার মুখে কথা কওনের সখ আছিল। দিছি আচ্ছামতো তাসানি। শেষ পরে আর কথা নাই মুখে।

একটু পরে গলা নামিয়ে পানউলীকে বললে, দুইডা টাকা দ্যাও দেহি। মক্কেলে কা'ল দিব কইছে, কা'ল পাইবা নির্ঘাৎ।

সরি, নো রিপ্লাই

সামনে বিরাট বোর্ড, সার সার খোপ, প্রতি খোপে বালব্। যেই বালব্ জ্বলে উঠল অমনি সেটায় মনোযোগ দাও। 'প্লাগ্' লাগিয়ে জিগ্যেস কর, 'নাম্বার প্লিজ্'। জবাব শোনো, ঠিকঠাক যোগ করে দাও নম্বরে নম্বরে। যে নম্বর চাই, দ্যাখ তা খোলা আছে কিনা? রিং করে দ্যাখ সে নম্বরে লোক আছে কিনা,কেউ 'হ্যালো' বলে সাড়া দেয় কিনা। দিচ্ছে না? ব্যস্ বলে দাও 'নো রিপ্লাই', সাড়া নেই। না কি সে নম্বরে কেউ কথা কইছে? তাহলে বল, 'এন্গেজড্'। সঙ্গে একটা 'সরি' বলো, নম্বর চাইলে 'প্লিজ্' বলো। কেননা, 'সাব্স্ক্রাইবার'রা সব ভদ্রলোক, তাদের একটু খাতির ক'রো। গ্রাহক বিগড়োলেই দফা শেষ। কড়া স্বরের একটি হাঁক, হ্যালো, 'ক্লার্ক ইন্চার্জ'কে চাই, তারপর একটি 'কম্প্লেন্' মানে নালিশ, আধ ঘণ্টা ধরে চিল্লাচ্ছি, তোমার অপারেটরটি নম্বর দিচ্ছে না, বলি ঘুমুচ্ছে নাকি? —ব্যস্ তোমার চাকরী খতম। তন্ময় হয়ে কাজ করছ, প্লাগের পর প্লাগে কানেক্শন্ দিচ্ছ, হঠাৎ তোমার পিঠে হাত পড়ল। চমকে চাইলে। ক্লার্ক ইন্চার্জ। হুকুম হল, বোর্ড ছেড়ে উঠে এস। পাশের মেয়েকে ভার চাপিয়ে উঠে এলে। আর কোনো কথা নয়, নিকালো। কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো অনুসন্ধান নয়, 'গেট আউট্'। জল মুছে ফেলে, ঝাপসা চোখ সাফ করে শুকনো মুখে বেরিয়ে এলে রাস্তায়। আপীল করার সুযোগ নেই।

প্রথমে ছিল প্রাইভেট্ কোম্পানী। বেঙ্গল টেলিফোন কর্পোরেশন। তার আইন তার কানুন আলাদা। সংক্ষেপে বি টি সি রুল। কানুন আর কি? দিন মজুরী। যেদিন কাজ সেদিন মাইনে। কাজ নেই তো হরিমটর খাও। ছুটিছাটা নেই, অবকাশ নেই, অসুখ বিসুখ নেই। অসুখ হয়েছে? তা বেশ তো, এসো না কাজে। জবরদস্তি করছি নাকি আমরা? না কি মাথার দিব্যি দিয়েছি কাজ করবার জন্য? খুশী হলে আসবে, ইচ্ছে হলে বাড়ীতে বসে থাকবে। তবে কাজ করবে না অথচ পয়সা দিতে হবে, এটা একটু আব্দার নয়? টেলিফোন কোম্পানী তোমার বাপ শ্বশুরের খাস তালুক নয়। অসুখ হয়েছে? তা অসুখ তো আর কোম্পানী তোমাকে ইন্জেক্শন্ দিয়ে দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়নি। অসুখ হবে তোমার আর কড়ি গুণবে কোম্পানী। মাইরী আর কি।

'সার্কাস'

অবিশ্যি এটা সেই আমলের কথা। যখন কোম্পানী ছিল প্রাইভেট, রুল ছিল 'বি টি সি'র। অপারেটর ছিল ফিরিঙ্গী মেয়েরা। তারপর টেলিফোনের মালিকানা নিলেন সরকার। ফিরিঙ্গী মেয়েরা কমতে লাগল। বাঙালী মেয়েতে ভর্তি হল খালি আসন। পোস্ট এণ্ড্ টেলিগ্রাফের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল টেলিফোনকে। চালু হল নতুন নিয়ম। 'পি এণ্ড্ টি' (পোস্ট এণ্ড্ টেলিগ্রাফ) রুলের রাজ্য এল। দিন মাইনের বদলে মাস মাইনে, বচ্ছরান্তে ছুটি, বিনি পয়সায় 'লাণ্চ'। মেয়েরা একটু জিরেন পেল। কিন্তু সরকার বড় হুঁসিয়ার লোক। বি টি সি মেয়েদের গায়ে হাতটি দিলে না, তারা যেমন তেমনই রইল। শুধু নতুন যারা ভর্তি হল, নতুন নিয়মের প্রজা হল তারাই। পুরোনো মেয়েরা চাপাচাপি করল। কিন্তু চাপাচাপি করলেই কাবু হয়ে পড়বে এমন ঠুনকো সরকার নয়। তবে যখন নেহাৎ অসহ্য হল তখন একটু সুবিধে দিলে। সুবিধে আর কি? দিন মাইনের বদলে মাস মাইনে আর দিন পনের ছুটি। পি এণ্ড্ টি রুলে ওই যে আগে মুফত লাণ্চটা চালু করেছিল, তাতে সরকার দেখল, বাঃ মেয়েদের তো দিব্যি সুবিধে হচ্ছে, দাও ওটা তুলে। যা চালু হয়েছে তা আর তোলা গেল না অবিশ্যি। তবে হালে যারা ভর্তি হল তাদের বন্ধ হল, তার বদলে নম নম করে একটা কিছু দিলে, মাসে জলখাবারের এলাউন্স, পনেরটা টাকা। তবে না খেলে পয়সা ফেরৎ পাবে না। সরকারের মতো রসিক কে? পাশাপাশি তিনটে বোর্ড, তিনটে মেয়ে বসে কাজ করছে, তার মধ্যে পুরোনো পি এণ্ড্ টি লাণ্চ খেতে চলে গেল, আর বি টি সি শুকনো ঠোঁটে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল। ওদের লাণ্চের পয়সা নিজের ট্যাঁক থেকে যাবে। সতীন কাঁটা কিনা, এদের উপর তাই দরদ কি?

কাজ কি কম?' গ্রাহক বেড়েছে, বোর্ড বাড়েনি। মানুষ তো, যন্তর তো নয়। চল্লিশটে 'কল্' যারা সামলাতে প্যারত তাদের ঘাড়ে এখন চেপেছে একশ চল্লিশটে। পাব্লিক কি এ খবর রাখে? কাজ না পেলে অপারেটরকে গালা-গালি। আর সে যে কি কুৎসিত ভাষা, কি অশ্লীল মন্তব্য, ভদ্দরলোকের মেয়ে হয়ে কিভাবে তা উচ্চারণ করব। তবে গ্রাহকরা ভদ্রলোক, জেণ্টল্ম্যান্ সব, আমাদেরকে তো তাদের খাতির করতেই হবে, 'প্লিজ্' বলতেই হবে, 'সরি' বলতেই হবে।

মেয়েটি বললে, কিভাবে কাজ করি জানেন? সাড়ে সাত ঘণ্টা ডিউটি। মাঝে তিনটে 'হাফ্ আওয়ার', আধ ঘণ্টার ছুটি, মোট খাটুনি ছয় ঘণ্টা। অফিস টাইমে কি চাপ যে পড়ে। উঁচু বোর্ড, দাঁড়িয়ে থাক সারাক্ষণ। অনবরত চোখের উপর পিট্ পিট্ বালব্ জ্বলছে, এক সঙ্গে কুড়িটা পঁচিশটা। এই বোর্ড সাফ

।

করছি, এই বোর্ড ভরে উঠছে। কানে বাজছে 'হ্যালো' 'হ্যালো' আর অগণিত সংখ্যার উচ্চারণ। ঝাঁকের পর ঝাঁক কানের পর্দায় ঘা মারছে। মুখের থুথু শুকিয়ে গলা আটকে ধরেছে, জল খেয়ে গলা ভেজাবো ফুরসৎ নেই, অনবরত সাড়া দিচ্ছি, 'নাম্বার প্লিজ্', 'এন্‌গেজড্ সরি', 'নো রিপ্লাই'। মাথা ঝিম ঝিম করে ওঠে, গা থরথর করে ওঠে, মাঝে মাঝে টলে ওঠে সমস্ত সংসার। ভাগ্য যদি ভাল হয়, সুপারভাইজার যদি সদয় হন তো 'রিলিফ্' পাঠান, অন্য মেয়ে এসে একটু জিরেন দেয়। সেও কদাচিৎ। নইলে সেই হাফ্ আওয়ারের প্রত্যাশা।

তাও কি নিয়ম মত মেলে। কি যে খামখেয়ালী ডিপার্টমেণ্টের, কেনই বা এরকম করে বুঝে উঠিনে। তিনটে 'হাফ্ আওয়ার' পাওনা, নিয়ম মতো একটানা দু ঘণ্টা কাজ করে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম পাবার কথা। তা সুপারভাইজার করলে কি, প্রথম দু' ঘণ্টার মধ্যেই তিনটে 'হাফ্ আওয়ার' দিয়ে দিলে। তখন আমার মোটেই দরকার নেই, কিন্তু কে শোনে তা। বলতে গেলেই অকথ্য গালাগালি। পেট মানে না তাই চাকরী করতে এসেছি, চাকরী গেলে খাব কি, তাই শত খোয়ার সহ্য করেও পড়ে আছি। আমাদের ঘরের মেয়েরা কতখানি নিরুপায় হলে তবে পথে বেরোয় চাকরী খুঁজতে। কতখানি নিরুপায় হলে এত অপমান, এই অমানুষিক কষ্ট সহ্য করেও কাজ করতে থাকি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ, কত মেয়ে ফিট্ হয়ে পড়ে যায়, সিট্ ছেড়ে একটু সাহায্য করব সে ফুরসৎ হয় না। সুপারভাইজার আসেন, ধরাধরি করে নিয়ে যান শুশ্রূষা করবার জন্যে। শুশ্রূষা তো ভারি, খাবলা খাবলা জল মাথায় দিলেন, স্মেলিং সল্টের শিশি শোঁকালেন, ব্যাস্, শুশ্রূষা হয়ে গেল। না এক ফোঁটা দুধের বন্দোবস্ত, না কিছু। যেই চোখ মেলল, তারপর আধ ঘণ্টা কেটেছে কি না কেটেছে বসিয়ে দিলে বোর্ডে। যদি গুরুতর কিছু হল, তো তখন রেহাই মিলল। বাড়ী যাবার হুকুম হল। তাও পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা নেই। বাড়িতে খবর পাঠানো হবে, লোক আসবে তবে নিয়ে যাবে। আর লোক যদি না আসে, তবে শুয়ে থাক সেই থ্যাকথেকে ছারপোকার বাথানে, সেই ময়লা ঘিনঘিনে গদিটার পরে। তোমার কোনো বন্ধুর ছুটি হলে তবে সে-ই তোমাকে নিয়ে যাবেখন।

কেন গ্রাহকরা হয়রানি হন? কেন তাঁরা ঠিকমত কাজ পান না? এক দিনের তরেও কি কেউ জানতে চেষ্টা করেছেন?

রিসিভার তুলেই আমাদের পান, কাজেই খিস্তিখিস্তি আমাদের উপরই করে যান। তাঁরা নম্বর না পেলে তো গরম হবেনই। কিন্তু কেন তাঁরা নম্বর পান না? সে কী আমরা ফাঁকি মারি বলে, সখীর সঙ্গে গল্পে মশগুল

হয়ে যাই বলে, প্রেমিকের সংগে আলাপে ডুবে থাকি বলে? নিরন্তর এইসব মন্তব্য শ্নতে হয়।

রাগ হয়, কান্না পায়, কখনো কখনো অতি দ্ঃখে হাসিও আসে। সহকর্মী ফিট্ হয়ে পড়ে মারা গেলেও যাদের উঠে যাবার উপায় নেই, ফ্রসৎ নেই, তারা করছে প্রেমিকের সংগে আলাপ! ফাঁকি একেবারে দিইনা তা নয়, কিন্তু তুলনায় কতট্কু?

গ্রাহকরা সাড়া পান না সম্প্র্ণ অন্য কারণে। মান্ধাতা আমলের বোর্ড, পচা গলা 'কর্ড' (তার), অকেজো প্লাগ্। কাজ হবে কি করে? এমন 'হেড্ সেট্' (শোনবার কল) দেয়, সেরখানেক ভারী, কান ব্যথায় টন টন করে ওঠে। অনবরত খ্টখাট কি শব্দ হয়, 'কান্ট্ হিয়ার' হয়ে যাই, শ্নতেই পাই না কিছ্। হয়ত কেউ নম্বর চাইল, জবাব দিতে যাব, দিতে পাচ্ছিনে, কোন সময় 'কর্ড' আলগা হয়ে গেছে, টের পেয়ে স্পারভাইজারকে বললাম, তিনি ক্লার্ক ইনচার্জকে বললেন, তিনি 'এক্স্চেঞ্জ' ইন্জিনিয়ারকে তলব করলেন, এক্স্চেঞ্জ ইন্জিনিয়ার এলেন, পরীক্ষা করলেন, খ্টখাট করলেন তখন ঠিক হল লাইন। ইতিমধ্যে ঘণ্টাখানেক কাবার, গ্রাহক রিসিভার খট্খট্ করে হয়রান হয়ে অপারেটরের চোদ্দপ্র্ষ ধ্য়ে দিচ্ছেন। যে অন্পাতে এক্স্চেঞ্জ বেড়েছে, যে অন্পাতে গ্রাহক বেড়েছে, সেই অন্পাতে যন্তরপাতি নতুন আমদানী হয়েছে অনেক কম। কথাটা একবার জিগ্যেস কর্ন না কর্তাদের, কি বলে শ্ন্ন।

কি নিয়ে কাজ করি শ্নবেন? 'হেড্ফোন্' নিয়ে, উপরের ট্কু 'হেড্সেট্', মাথার সংগে আঁটা থাকে, আর নিচেরট্কু 'মাউর্থপিস্', ম্খের নিচে ঝ্লে থাকে। কথা বলতে বলতে তাতে থ্থ্ ছিট্কে পড়ে। কত মেয়ের কতরকম তো রোগ থাকে, তার 'মাউথ্পিসে' অন্য মেয়ের ম্খ দিতে ঘেন্না করে না? কত বলেছি, নিজের নিজের আলাদা 'মাউথ্পিস্' দিতে, কেউ কর্ণপাতও করেনি। আমাদের মধ্যে টিবি রোগী আছে, তার 'মাউথ্পিসে'ও জেনেশ্নে ম্খ দিতে হয়, হয়ত একট্ 'ডেটল্' ব্লিয়ে দিল, ব্যস্।

কে ঝগড়া করবে? সে স্যোগও নেই, ফ্রসৎও নেই। একটা 'রেস্ট র্ম্' আছে, খান আস্টেক সোফা কবে কেনা হয়েছিল জানিনে, হয়ত সীতার বনবাসকালে, ছিঁড়ে খ্ঁড়ে ফর্দাফাই, নারকোলের ছোবড়াগ্লো যেন আমাদের দ্র্দশা দেখে দাঁত বার করে হাসতে বেরিয়েছে। অল্প কয়েকটা বসবার জায়গা তিন-তিনটে এক্স্চেঞ্জের মেয়ে, আঁটিবে কেন? ঝাড়া দ্' ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিয়ে আবার দাঁড়িয়ে থাক এখানে, তারপর ডিউটিতে ফিরে গিয়ে আবার

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাজ কর, যতক্ষণ না মূর্ছা খেয়ে পড়ে যাও। রাত্তিরে ডিউটি দিতে আসব, শোবার ব্যবস্থা দেখলে মাথা গরম হয়ে ওঠে। সেই ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। দিনের বেলায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ডিউটি কিন্তু রাত্তিরে দশ ঘণ্টা। ওভার টাইম একেবারে লবডঙ্কা।

জল খেতে দ্যায়, গেলাসের গায়ে লিপস্টিকের দাগ, ধোয় না পর্যন্ত। একটা আলমারী কি ডেস্ক নিজের বলতে কিছু নেই। কাজের জায়গায় কিচ্ছু নিয়ে যাবার নিয়ম নেই। তাহলে কোথায় রাখব? ওভার কোটটা? বিছানার চাদরটা? যেখানে খুশী রাখ। খোলা জায়গায় রেখে যাই, ফিরে এসে পাব কিনা কে জানে?

মেয়েটি বললে, গরীবের মেয়ে, তবু আমার একমাত্র ওভারকোটটি খোয়া গেছে এমনি করে। শীত আসছে, এবার বিনা কোটেই কাজ করতে হবে। ব্যাগ চুরি গেছে বার চারেক। এর তার কাছ থেকে দু'চার আনা ধার করে বাড়িতে ফিরেছি।

সবচেয়ে দুঃখের কথা, আমরা লোকের নম্বর জোগাই, আর আমাদের কোনো জরুরী দরকারে 'কল্' এলে শুনতে পাইনে। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে কাজ করত। তার স্বামী অসুস্থ। তাকে রেখেই কাজ করতে আসত। নইলে বেতন কাটা যায়। চিকিৎসার জন্য টাকার তো দরকার। একদিন কাজে এসেছে। হঠাৎ ওর বাসা থেকে 'কল্' এল। ক্লার্ক ইন্চার্জ শুনল কি শুনল না বলে দিলে, 'অন্ ডিউটি'। ফোন এল, হ্যালো হ্যালো, ওকে শিগ্গির পাঠিয়ে দিন। ক্লার্ক ইন্চার্জ ধমকে উঠল, কি খামাখা বিরক্ত করছেন, বলছি না এখন ওকে ডাকা হবে না, ডিউটিতে আছে। এবার অনেকক্ষণ পরে ডাক এল, হ্যালো, ওকে একটা খবর দিয়ে দেবেন, আর তাড়াতাড়ি করে আসবার দরকার হবে না, ওর স্বামী মারা গেছেন, ডিউটি শেষ হলেই তাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আপিস শেষের পথটুকু

ডালহৌসি। আকাশ ছোঁয়া ইমারত, সহস্র দ্রুতগতি যান আর অজস্র লোক। ডালহৌসি অঞ্চলের আপিস-দিনের দশটা পাঁচটার চেহারা এই।

গতি, শুধু গতি। ছোটা, শুধু ছোটা। শুধু ত্রস্ততা, শুধু ব্যস্ততা। ঘড়ির কাঁটা লোকগুলোকে ধীরে সুস্থে হাঁটায়। ঘড়ির কাঁটাই লোকগুলোকে ঘোড়দৌড় করায়। ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে ডালহৌসীতে এসে নামে। সচকিত চোখ পড়ে হয় কোনো ঘড়ি কোম্পানীর বাড়ীর মাথায়, নয়ত জি পি ওর ঘড়ি-গম্বুজে। সর্বনাশ! পাঁচ মিনিট লেট! কি সর্বনাশ! ছোট ছোট, হাজরে খাতাটা এখনো হয়ত পাওয়া যেতে পারে, এখনো হয়ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে চলে যায়নি। কড়া রৌদ্রে ওদের চাঁদি তেতে ওঠে, দরবিগলিত ঘর্ম ভুরুর নিষেধ এড়িয়ে চোখে ঢুকে খোঁচা মারে। চোখে সর্ষে ফুল দেখার কথা, কিন্তু ওরা দেখে বড়বাবুর রক্তচক্ষু।

ব্যস্ততায় দ্রুত ধাবমান এই মনুষ্যযন্ত্রগুলো এখন আর কারো বাবা নয়, ভাই নয়, ছেলে নয়, স্বামী নয়, স্ত্রী নয়, বোন নয়। এখন এই সময়টুকু, আপিস দিনের দশটা থেকে পাঁচটাটুকু তাদের মাত্র একটিই পরিচয়, তারা কেরাণী।

ঘরে ঢুকে হাজরে খাতায় একটি করে টিক্, হাজির হয়েছি তার প্রমাণ, সময় মত দিতে পারলেই ব্যস্ নিশ্চিন্ত! এবারে একটা চেয়ার বাগিয়ে বস। এজমালি বিজলী পাখার হাওয়া খাও। সদ্য খেয়ে ছুটে আসায় পেটে অজীর্ণতার যে ব্যথাটুকু চাগিয়ে উঠেছে, পেট চেপে ধরে তার উপশম কর। তাড়াতাড়ি পেটপুরে খেয়ে আসতে পারনি, বেয়ারাকে বল জল আনতে, জল আনলে গলায় ঢকঢক ঢেলে খালি পেট পুরো করো।

তারপর শুরু কর দিনের কাজ, বাঁধা সড়কে চলা। ঘাড় গুঁজে খস খস কলম চালাও। লেজারের পাতা ওলটাও। ফাইলের ধুলো ঝাড়, ডিক্টেশন নাও মনিবের। খট্ খট্ টাইপ করো। চিঠিপত্রের জবাব তৈরী করে বড়সাহেবের দস্তখত নাও।

সেই দুপুরে একটি ফোঁটা অবসর। লাঞ্চ টাইম। যাও এবার মুখে কিছু দিয়ে এস। লাঞ্চ না হাতি, এক কাপ চা, একটি দুটি সস্তা বিস্কুট, আর গোটা দুই বিড়ি। এই হল আপিস পাড়ার চর্বচোষ্যলেহ্যপেয়ের সাধারণ নমুনা। পকেটের তাকতের উপর টিফিনের তারতম্য কিছু হয়, অবিশ্যি। তারপর এক

সময় এক কাপ চায়ের মত এই স্বল্প অবকাশটুকু শেষ হয়। আবার যাও, বস গিয়ে যার যার চেয়ারে, ঘাড় গ‍ুঁজে কাজ কর।

তারপর পাঁচটা। ছ‍ুটি। ম‍ুক্তি। যে ঘড়ি দ‍ুই সাঁড়াশি-কাঁটা দিয়ে এতক্ষণ গলা টিপে ধরেছিল, সমস্ত দিনের মতো রক্ত চোষা শেষ করে আলগা করে দিয়েছে তার দাঁড়া। ছাড়া পেয়ে পিল পিল বেরিয়ে এসেছে মান‍ুষের পাল। এখন আর তত ব্যস্ততা নেই, তত উদ্বেগ নেই, আছে শ‍ুধ‍ু সীমাহীন অবসন্নতা, শ‍ুধ‍ু নির্জীবতা।

বাড়ী ফেরায় কারো তাড়া আছে, নতুন বিয়ে, বৌ চেয়েছে ছটার শোতে সিনেমা দেখতে। তাই এত তাড়া। ভিড়ভর্তি ট্রামটায় তারা আরো ভিড় বাড়ায়। কি কারো বাড়ীতে সংকটাপন্ন রোগী, কি কারো টিউশানি, তারাই বা দেরী করে কি করে? ট্রামের ভেতর তাই ঠাসাঠাসি। আর শ‍ুর‍ু হয় গালগল্প।

আরে, মল্লিক, আমাদের সেক্‌শনে আজ যা কান্ড হয়েছে, তা আর কি বলব? বাঁড়‍ুজ্জে আজ লেট্। কারণ লিখলে স্ত্রীর অস‍ুখ। তারপর পর পর যারাই 'লেটে' এসেছে কারণের ঘরে 'ডু' বসিয়ে গেছে। কে আর ভাল করে দ্যাখে, আবার নতুন করে কে লেখে। মিসেস্ বিশ্বাস, মিস্ চক্রবর্তী ওরাও লেট। ওরাও স্ত্রীর অস‍ুখের নিচে 'ডিটো' দিয়ে গেছে। আর যাবে কোথায়? খাতাখানা দেখেই তো স‍ুপারিণ্টেন্ডেণ্ট ব‍ুড়োর মেজাজ একেবারে চড়াক-চাঁই। লেট্‌ওয়ালাদের সব ডাকালে। তারপর খাতা দেখিয়ে সব্বাইকে একচোট নিলে। বলি পেয়েছেন কি আপনারা শ‍ুনি, একই দিনে সবারই স্ত্রীর অস‍ুখ করে গেল? বলি পরামর্শ করে নাকি? মিসেস্ বিশ্বাস, মিস্ চক্রবর্তী আপনাদের স্ত্রীরও অস‍ুখ? বলি বাড়াবাড়ি নয় তো? ও!, সে যা সিন্ একখানা, একেবারে যাকে বলে সিন্‌সিনাকি ব‍ুবলাব‍ু মাইরী। ব‍ুঝলে, তারপর সেক্‌শনকে সেক্‌শন মিস্ চক্রবর্তীর পেছনে লাগল। একজন একজন যায় আর জিগ্যেস করে, মিস্ চক্রবর্তী, ভাল ডাক্তার দেখাচ্ছেন তো, স্ত্রীর অস‍ুখকে 'নেগলেক্ট' করবেন না। বলেন তো স‍ুবোধ মিত্তিরকে ভিয়েনা থেকে ডেকে পাঠাই। ইনি আপনার প্রথম স্ত্রী? মিস্ চক্রবর্তীর দফা গয়া হয়ে আছে।

জানেন দত্তদা, আমাদের স‍ুরমা কাজ ছেড়ে দিয়েছে।

বলিস কি? তোদের সেকশন যে কানা হয়ে পড়বে, তাহলে।

হ্যাঁ, দাদা, কাজকর্মে আর মন নেই কারো। ওই তো ছিল 'ইনসপিরেশন'। আমাদের আর কি, দ‍ুটো একটা কথা কইতো, দ‍ু এক খিলি পান চেয়ে খেত, ব্যস্, ওই আমাদের স্বর্গ প্রাপ্তি। তা এমন কপাল দাদা, তাও সইলে না। কি চেহারা!

কি ব্রাইট! কিছুই তো করতে হত না, করতও না, ওর কাজ যা কিছু আমরাই তো করে দিতাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবদি ওর কাজ করে দিয়েছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তো মুষড়ে পড়েছে। পড়বে না, সুরমা আসার পর থেকে কামাই নেই, কারো, লেট নেই। চেয়ার ছেড়ে নড়ত না পর্যন্ত কেউ, কি কাজের ঘটা।

হ্যাঁরে, তা এত সুখ ছাড়লে কেন মেয়েটা?

না ছেড়ে করবে কি বল? ওই যতেটা, ওই যে 'লিভ্ সেকশনের' হোঁৎকাটা, ওই ব্যাটাচ্ছেলেই তো গোলমালটা বাধালে। হাইকোর্ট থেকে একটা ছেলে আসত, দেখেছিলেন, সুরমাকে যে পেঁাছে দিয়ে যেত, ওর ব্যাগ্ ওয়াটারপ্রুফ বইতো, একসঙ্গে টিফিন খেতে যেত, সেই ছেলেটাকে যতে একদিন আচ্ছা ধোলাই দিলে। বললে, হাইকোর্টের ছেলে হয়ে নজর দিচ্ছ এ-জির মেয়ের ওপর। ফের যদি এদিকে ঘুর ঘুর করতে দেখি তো খুপড়ি খুলে নেব। তারপরেই যতের সঙ্গে সুরমার ভাব হয়ে গেল। ভাব থেকে লাভ্। লাভ্ থেকে বিয়ে। দশজনের আনন্দ একজনেই বাগিয়ে নিলে। এদেশে এখনো ঘোর 'ইণ্ডিভিজুয়ালিজম্' চলছে দাদা, 'পাবলিক্ সেন্স গ্রোই' করেনি, বুঝলেন।

আরে শলা সন্তোষ যে। একা? কাউণ্টার-পার্টটি কই।

কে অরুণ? সেটাকে তালাক দিয়েছি। ঝুট কাটিয়ে দিলুম। আরে ভাই সেদিন ওই যে লেখাটা ওকে পড়ালুম না, ব্যস্ তারপর থেকেই শালাকে কাট্ দিয়েছি। অত বড় এক্সপেরিমেণ্টটা ধরতেই পারল না। সেরেফ বলে দিলে কেরাণীর বাচ্চা হয়ে যে কবিতা লেখে সে নিউরোটিক। হারামী নাম্বার ওয়ান।

কিন্তু ও নিজে লেখে যে। বইও ছেপেছে। দূরের আকাশ। আ! কি সব কবিতা ভাই। সুপার্ব। বুক সিন্ সিন্ করতে থাকে।

রেখে দাও রেখে দাও তোমার নাইডু। মাস্তাক এখনো মাস্তাক। ওর জুড়ি আর ন ভূত ন ভবিষ্যতি।

কলকাতায় তো আর থাকা চলে না। কফি কিনতে গেলুম বাজারে তা ছটাকি একটা কফি দাম চাইলে পাঁচ সিকে।

টিকিট?'

আছে। কই?

মান্থলি।

দেখি।

‘সার্কাস’

তুমি কি ধরনের উল্লুক হে। ভদ্রলোকের কথায় বিশ্বাস নেই।

খামাখা গাল দিচ্ছেন কেন মশাই। ওর ডিউটি ওকে করতে হবে না? টিকিট দেখালে কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

ওই যাঃ, মান্থলীটা কি হল? দেখি মিত্তির পাঁচটা পয়সা। নাও হ'ল তো? যেন ফাঁকি দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম। আমরা তেমন লোক নই, হ্যাঃ।

একী, মেয়েছেলেদের কাপড় ধরে টান দিচ্ছেন কেন? আস্পর্দা তা কম নয়।

ভেরি স্যরি, দৈবাৎ হাত লেগে গিয়েছে।

ইয়ার্কি করার জায়গা পান না। দৈবাৎ লেগে গিয়েছে? লায়ার কোথাকার। এই নিয়ে পাঁচবার টান দিয়েছেন। বুড়ো হয়েছেন, কিছু বললাম না। ছি ছি।

বা দাদু বেশ। সিঙিকং সিঙিকং বেশ চলছে। অ্যাঁ। দিন দুঘা কষিয়ে।

আরে ভাই বিপদ তো এই বুড়োদের নিয়েই। শরীরের তেজ কমেছে, তাই মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়ে, গন্ধ শুঁকে, আঁচল টেনেই সাধ মেটায়। এ তো ‘কমন্ সাইকোলজি’।

তারপর তোমার ছেলেটার খবর কি?

মারা গেছে।

সে কী, কবে? কি হয়েছিল?

সেপ্টিক। ডাক্তার পেনিসিলিন দিতে বললে। পঁচিশ লাখ পেনিসিলিন দেওয়া হল। কিছু হল না। পরে জানা গেল ওষুধগুলো জাল।

চ্চুক্ চ্চুক্। কি বলব ভাই দুনিয়াটার হল কি? নীতিজ্ঞান কি একেবারে লোপ হয়ে গেল। এদের ধরে ধরে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। জীবন নিয়েও ব্যবসা।

হ্যাস্‌শালা।

কি হল রে? দীর্ঘশ্বাস ফেলছিস কেন?

চাকরী আর থাকবে না। তিনদিন ধরে হিসেব মেলাতে পাচ্ছিনে। শালা কোত্থেকে ছ'টা পাই যে বেশী হচ্ছে, একেবারে মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। চাকরী তো যাবেই, বৌটাও হাত ছাড়া হয়ে গেল বোধ হয়।

সে আবার কি?

বলিস কেন ভাই। ছ' পাই-এর ঠেলায় অস্থির, রাতে ঘুম নেই। এদিকে

'সার্কাস'

একাউণ্ট বুঝিয়ে দেবার তাড়া, তার উপর বউ-এর ঘ্যানঘ্যানানি। চাল নেই, কয়লা নেই, বাচ্চার ফুড নেই। এনে দাও। যেন ইচ্ছে করেই আমি ওসব সরিয়ে রেখেছি। এই নিয়ে কথার থেকে কথান্তর। আর কি, বউ গেছেন, বাপের বাড়ী আমিও দিব্যি দিয়ে দিয়েছি, আমি মরবার আগে যেন আমার বাড়ীতে না ঢোকে। সেই ইস্তক মনটা খারাপ। শালার আপিসে গিয়েছিলাম। দেখা পেলাম না। মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেছে। মানে বউটা আবার বড্ড সেণ্টিমেণ্টাল কিনা, তাই ভাবনা। ধুশ্ শালার সংসারে আর থাকব না। যেখানে সিম্প্যাথি নেই, সেখানে আর কি সুখে থাকা!

আরে নন্দদা যে ওদিকে গুটিশুটি হয়ে বসে আছেন যে। কি ব্যাপার আপিসেও যান নি দেখি।

এই ইয়ে, তোমার বউদির আবার—

কেন কি হয়েছে বউদির।

মেয়ে।

মেয়ে? এবারেও মেয়ে। আগের বছর যেন কি হ'ল?

মেয়ে।

ও, তা তার আগে?

মেয়ে।

তার আগে।

মেয়ে।

ও বাব্বা, বউদি যে দেখছি মেয়ে কলেজের বাস একখানা। দরজা খুলছেন আর মেয়ে বেরুচ্ছে।

তাহলে বিয়েটা তুই করলিনে শেষ পর্যন্ত।

নাঃ।

তাহলে মেয়েটাকে নাচালি কেন শুধু শুধু।

সেটা ভুল। নাচাইনি তো, ঠিক করে ছিলাম বিয়ে করব। মেয়েটাকে স্পষ্ট করে বলিনি কিছু। বাবা-মা খৃষ্টান মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে মত করবেন না। মা তো শুনে অবধি কান্নাকাটি লাগিয়েছে। ভাই বোন এদেরও যে খুব মত তাও নয়। তবু এ রিস্ক্ নিতে রাজী ছিলাম।

তা আবার মত বদলালি কেন?

ফ্ল্যাটের জন্য—

ফ্ল্যাটের জন্য?

হ্যাঁ। তুই তো দেখিসনি, লেকের কাছে কি লাব্‌লি এক ফ্ল্যাটে সে থাকে। এই গৃহসংকটের দিনে অমন ফ্ল্যাট যে-কোনো রিস্কেই নেয়া যায়। আর এতো সামান্য বিয়ে। সেইজন্যই বিয়ে করব ভেবেছিলাম। এমনকি, বাপ-মা-ভাই—এদের অমতেও। যেদিন মতটা ওকে জানাব ভেবেছিলাম, সেই দিনই লাঞ্চ টাইমে ওর সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে আমার আপিসে এসে হাজির। বলে, একটা ঘর খুঁজে দিন আমাকে। কার জন্যে? বললে, কার জন্যে আবার, আমার জন্যে। বললাম, কেন আপনার ফ্ল্যাটটা কি হল? এক গাল হেসে বললে, ওটা তো আমার নয়। আমার এক বন্ধুর দাদার। বিলেত যাবার সময় আমার জিম্মায় রেখে গিয়েছিলেন। আজ বোম্বে থেকে তার করেছেন, সস্ত্রীক কলকাতা পোঁছচ্ছেন। এখন কি করি বলুন তো? আর তো ওখানে থাকা চলবে না।

বোঝ ব্যাপার। তাই কেটে পড়লুম। কেরাণীর কপালে আবার ফ্ল্যাট, তাও আবার পূব-দক্ষিণ খোলা। বামন হয়ে চাঁদে হাত, হ্যাঃ।

ট্রাম এসে অবশেষে টার্মিনাসে থামল। বড় জোর ঘণ্টা খানেকের জার্নি। এই একটু সময়, আপিস পরের পথটুকু, এই পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি এক ঘণ্টা সময়—এই সময়টুকুই এদের অবসর। ভাবনার জোয়াল থেকে মনকে একটু মুক্তি দেওয়া যায়। কেরাণীর পোষাকটি ছেড়ে মানুষের পরিচ্ছদে আত্মপ্রকাশ করা যায়। তারপর আবার যে কে সেই।

সরস্বতীর খাস তালুক

ভদ্রলোক বললেন, আরে ডিপ্লোমা দেখবার দরকার হয় না। কলকাতা য়ুনিভার্সিটির ছেলের 'ইস্টাম্পো'ই আলাদা। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে তো হরবখৎ দেখছি। কিছু একটা জিগ্যেস করেছ কি অমনি, 'বেগ্ ইওর পার্ডন্ স্যর'। বাস্ বুঝে নিলে কলকাতার রপ্তানী। আরও তো জায়গা বে-জায়গার ছেলেরা আসে, কিন্তু এমন ঠাসবুনোন উজবুক এক কলকাতা ছাড়া আর কুত্রাপি মিলবে না। কাজেই হটে যাচ্ছে। যেমন এক একজনের ছিরি, অকালে বুড়ো মেরে গেছে, না আছে এনার্জি না ভাইটালিটি। কমনসেন্সটুকুও সব যেন দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এ বন্ধক রেখে বেরিয়ে এসেছে। আরে ভাই সাধারণ একটা কথা জিগ্যেস করলেই 'ফ্যালাট'। কেতাব খুলে যা জিগ্যেস কর টকাটক বলে দেবে। তা সে ইকনমিকসই হোক আর দর্শনই হোক আর ইতিহাসই হোক। কিন্তু বইয়ের পাতার বাইরে একটা অতি সামান্য জিনিস জিগ্যেস কর অমনি হাঁ হয়ে যাবে। আর সে হাঁও আবার লম্বা চওড়া এমন যে খান তিনেক আড়াইটনি ট্রাক পাশাপাশি ঢুকে যেতে পারে।

এক ছোকরাকে প্রথম কোশ্চেনই জিগ্যেস করলুম, হোয়াট্ ইজ্ ইওর ফাদার? ছোকরা জবাব দিলে, মাই ফাদার ইজ্ এ ম্যান্। বললুম, বাপু হে, তোমার বাবা বনমানুষ যে নন তা তো দেখতেই পাচ্ছি, বলি করেনটা কি? তখন একগাল হেসে বললে, স্যর, ভকিল অব্ ক্যালকাটা। বল দিকি, এইসব ছেলেরাই যদি ডিগ্রীধারী তো সে জাতের পরমায়ু আর কতদিন? অথচ বাঙালীর ছেলেরা যে গবেট সে কথা তার পরম শত্তুরেও বলতে পারবে না। তবেই দেখ, বিদ্যের কি যে কলই বানিয়েছে বাঙালী—এই কলকাতার য়ুনিভার্সিটি—তুখোড় ধারালো ছেলে সব এক মুখ দিয়ে ঢুকছে আর আশুতোষ-দ্বারভাঙ্গা ঘুরে ওমুখ দিয়ে ধার ভাঙা মেষশাবক বেরুচ্ছে। বিদ্যের ব্যাপারে যাঁরা সব ঠিকেদারী নিয়ে বসে আছেন, তাঁরা নিজেরাই যে এক একটা বিন্ধ্য পর্বত। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অব্ধি পাকা পাথরের গাঁথুনি, একেবারে সলিড্ মাল, তা তাদের হাত দিয়ে আর এ ছাড়া কি বেরুবে।

ভদ্রলোক বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, এখন বাঙালীকে যদি সারভাইব্ কত্তে হয়, পিছুহটার পাল্লা থেকে সরে যদি এগিয়ে

যাবার স্বপ্ন দেখতে হয় তো বাঙালী মাত্রেরই কর্তব্য হপ্তায় না হোক অন্তত মাসে একদিন সম্মার্জনী দিবস পালন করা। গোলদীঘির পশ্চিম পাড়ের ওই তিনটি বিল্ডিংএর কামরায় কামরায় এত আবর্জনা জমেছে, সব্বাই মিলে ঝাঁটা না চালালে তা সাফ করা যাবে না। এ আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

এমন ধারা মন্তব্য শুনেছিলুম এক বিদেশফের্তা শিক্ষকের মুখ থেকে। পেটে কিছু বিদ্যে আছে, সেই সুবাদে য়ুরোপ আমেরিকার য়ুনিভার্সিটিতে বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন। বললেন, য়ুনিভার্সিটির গায়ে দোকানপাট, এ আর কোত্থাও দেখিনি। যেখানেই যান, য়ুনিভার্সিটি দেখলেই মনের ভাব একটু অন্যরকম হয়ে ওঠে। কি সোবার অ্যাটমস্‌ফিয়ার সেখানকার। আর এটাকে দেখুন দিকি। কি ক্যাডাভারাস্। এখেনে জুতোর দোকান, ওদিকে কাপড়ের দোকান, সে পাশে সার্জিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, একেবারে 'হরেকরকম্বা'। এখন একটা 'আদর্শ হিন্দু হোটেল—ভদ্র মহিলাদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত' সাইনবোর্ড ঝোলালেই ছবিটা কম্‌পিলিট্ হয়ে যায়। পারমিশন নেবার জন্যে ভাইস্-চ্যান্সেলারকে লিখব ভাবছি। বিষয়টা কিন্তু ভেবে দেখবার মত। কত যে মুশকিলে পড়তে হয় তার ঠিক আছে কিছু? বাইরে থেকে ছাত্র আসছে, প্রোফেসর আসছে হরদম। এই দোকানের নামাবলী-মোড়া য়ুনিভার্সিটি দেখে তাদের মুণ্ডু ঘুরে যাচ্ছে।

একবার একদল বিদেশী ছাত্র ওই পেল্লায় কাপড়ের দোকানটায় ঢুকে চুপচাপ একপাশে বসে বসে কাপড় বেচা দেখছিল। দোকানী এদের শুধুলে, কি চাই? ওরা বিনীতভাবে জবাব দিলে, স্যর, আপনার শিক্ষাদান পদ্ধতি দেখছি। তারপর সঙ্গীর দিকে ফিরে বললে, মেথড্‌টা খুবই প্র্যাকটিক্যাল, নয় কি জন্? জন্ বললে, ও সিওর, নিশ্চয়। এটা একেবারে খাস এ য়ুনি-ভার্সিটির বৈশিষ্ট্য। তারপর মশাই, দেশে গিয়ে এরা এক আর্টিকেল লিখলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পদ্ধতি সবই মামুলী। তবে প্র্যাক্‌টিকেল্ বিজিনেস্ ট্রেনিংএর যে বিভাগটি দেখলাম সেটি একেবারেই নূতন।

সরস্বতীর খাস তালুকের প্রজা হবার মতো চিকন কপাল আমার নয়। ট্রাম বাসে যাই আর চোখ টেরিয়ে চাই। একবার এক বন্ধুর কাজে ভেতরে ঢুকেছিলুম। আর তাইতে আমার পুরো আক্কেল গজিয়ে গিয়েছে।

আমার এক বন্ধুর ভাই-এর মার্কশীট নিতে হবে। টাকা নিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু নিয়ম-কানুন কিছুই জানিনে। একে ওকে তাকে জিগ্যেস করতে করতে বেতালা পাক খাচ্ছি। হঠাৎ হাজির হলাম এন্‌কোয়ারী আপিসে। টেবিলের ওপর নুটিশ লেখা--অফিসার ইজ্ আউট, প্লিজ ওয়েট্। অর্থাৎ কিনা কত্তা বাইরে গেছেন, একটু দাঁড়ান। দাঁড়িয়েই থাকলুম।

'সার্কাস'

ভেতরে জন কতক বসে আছেন। সেখানে তখন তুমুল তর্ক চলেছে. বেড়ালে প্লেগ ছড়ায় কি না। একটা বুড়ো আর একটা ছোকরা। ছোকরা বলছে, ছড়ায় না। বুড়ো বলছে, আলবৎ ছড়ায়। এক দেহ থেকে ছোঁয়া লাগলেই আরেক দেহে ও রোগ ছড়িয়ে পড়ে, আর এতো বাবা জলজ্যান্ত বীজাণুকেই পেটে পুরে রাখা। বেড়ালে ইঁদুর খায়, আর কে না জানে ইঁদুরের গায়ে প্লেগ থ্যাক্ থ্যাক্ কচ্ছে। বেড়াল কখনো মানুষে পোষে?

আমি দাঁড়িয়েই আছি। আরো ক'জন আমার মত জমে গেলেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ভেতরে তখন বেড়াল প্রসঙ্গ শেষ হয়ে অন্য আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। হাইকোর্টে কার সম্মান বেশী। জুরীর না জজের। ছোকরা বলছে জুরীর, বুড়ো বলছে জজের। সে এক হাতাহাতি ব্যাপার। আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে। মিনতি করে বললুম, মশাই, একটা কথা জিগ্যেস করতে পারি? বুড়ো ধমকে উঠলে, ডিস্টার্ব করবেন না এখন। বললুম, মার্কশীট নিতে হলে কোথায় টাকা জমা দিতে হবে, একটু বলবেন কি? বুড়ো বললে, তা জানেন না তো এসেছেন কি কত্তে? যে জানে তাকে পাঠিয়ে দিন গে।

আবার সুরু হল অন্য প্রসঙ্গ। ফিলিমে নামলে, মেয়েদের ক্যারেক্টার সত্যিই নষ্ট হয় কি না? ধমক খেয়ে থমকে গিয়েছিলাম। জবাব দেবার আগেই পেছন থেকে এক তাগড়াই জোয়ান এগিয়ে এল। গুলো ফুলিয়ে বললে, খাসা রসিকতা তো, এন্‌কোয়ারী অফিসে বসে আছেন আপনি, আর খবর যোগাড় করতে যাব পঞ্চা তেলির কাছে? বলি কি পেয়েছেন? ছোকরা একটু ঘাবড়ে গেল। বললে, যান না, ওসব দ্বারভাঙ্গায়।

একটি মেয়ে বললে, তবু আপনাদের দেখলে কথাবার্তা বলেন, আমরা যে গতজন্মে কত পাপ করেছিলুম। দু বচ্ছর য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছি তা দেড়টি বছর গেছে শুধু সেক্রেটারীর অফিস আর অ্যাসিস্ট্যান্ট কণ্ট্রোলারের অফিস আর রেজিস্ট্রারের অফিস করতে করতেই। পড়াশুনা কখন করব? এমনই এক একটা অফিস যে দশবার করে গেলে তবে একটা কাজ করে ওঠা যায়। আমার এক বন্ধুর 'পারমিশন' এসেছে। এদিকে মিস্ অমুক বলে নামটি লেখা হয়েছে আবার ভেতরে লেখা 'হিজ্'। তাই দেখে বললুম, ভাই, এটা 'হার' করে নাও, নইলে এদের ব্যাপার জানিস তো। মেয়েটি দেড় মাস পরে এসে বললে, ভাই এখনো আমাকে 'হার' করতে পারলুম না, তুই একটু দেখবি। গেলাম এনকোয়ারীতে। গিয়ে দেখি বুড়োবাবু টেবিলে পা তুলে দিব্যি একটা ঘুম লাগিয়েছেন। ডাকাডাকি করতেই ধমকে উঠলেন, চুপ করুন, এটা আপনাদের

হোস্টেল নয়, কন্‌সেনট্রেশন্‌ নষ্ট করে দেবেন না। কি করবো ধমক খেয়ে চুপ মেরে থাকলাম।

আরেকটি মেয়ে বললে, ইস্কুলের যে স্মৃতি, কলেজের যে স্মৃতি মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে তেমন কোন ছবি য়ুনিভার্সিটির বেলায় নেই। কেমন যেন এলোমেলো ভাব, কারো সঙ্গে কারো অন্তরের যোগ নেই। কেমন কেমন যেন। অথচ কত তো স্বপ্ন ছিল। যেদিন শুনলাম অ্যাড্‌মিশান পেয়ে গেছি সেদিন থেকে কত আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছি প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসটির জন্যে। থাকতাম সেই কতদূর মফস্বলে, তাড়াহুড়ো করে এলাম। দুরু দুরু বক্ষে ক্লাসে গেলাম। না জানি কি শুনব? ও মা, কিছুই না। প্রোফেসার মশাই দায়সারা গোছ দুচার কথা বলেই চলে গেলেন। আমি তো ধপাস করে মাটিতে পড়লাম। তারপর সবই গতানুগতিকতায় গড়িয়ে গেছে।

ঘুরছি ফিরছি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখে জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ মশাই, এখানকার কর্তাব্যাক্তি কে বলতে পারেন? বললুম, নামে তো জানি ভাইস-চ্যান্সেলার। কেন বলুন তো? দেখি ভদ্রলোকের চুল উস্কুখুস্কু, চোখ বসে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, দেখুন তো কি মুশকিলে পড়েছি। কাল ছেলের ইণ্টারভিউ, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবে, কবে টাকা জমা দিয়েছি, আজও মার্কশীট বের করতে পারলাম না, আজ না পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, ছেলেটির কেরিয়ার খতম হয়ে যাবে, কি করি বলুন তো? কার কাছে যাই? নিয়ম হচ্ছে ফি জমা দেবার তিন দিনের মধ্যে মার্কশীট দিতে হবে। তা দেখুন, দিস্‌ ইজ্‌ দি টেনথ্‌ ডে, আজ নিয়ে দশ দিন। এসেছি দশটায় আর এখন বেলা বাজে তিনটে, ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেলাম। এ ডিপার্টমেণ্ট বলে ওখানে যান, ও বলে সেখানে যান। কি করি বলুন তো, আজ মার্কশীট না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এর জবাব দেবার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। ভদ্রলোক পাগলের মতো আরেক ধারে চলে গেলেন।

আরেক ভদ্রলোকের সঙ্গেও কথা হচ্ছিল। তিনি পড়াশোনার কথায় ক্ষেপে উঠলেন। বললেন, রাখুন রাখুন, আমার জানা আছে, পড়াশুনা কেমন হয়। সবার কথা বলছিনে, কিন্তু বেশীর ভাগ প্রোফেসারই তো হিজ্‌ মাস্টারস্‌ ভয়েস্‌। দিনের পর দিন বছরের পর বছর, একই লেক্‌চার দিয়ে চলেছেন, কমা ফুলস্টপটি পর্যন্ত মুখস্থ। তার চেয়ে বাবা এক কাজ করলেই হয়, রেকর্ড করিয়ে নিলেই হয় লেক্‌চারগুলো, একটা কলের গান টেবিলে বসিয়ে রেকর্ড চাপিয়ে দিলেই ল্যাঠা চুকে যায়, গলার কষ্ট বাঁচে। পড়াশুনার তো

এই ছিরি, আবার ফেল করাবার ঘটাটা দেখুন। আমার এক বন্ধুর মেয়ে এবারে পরীক্ষা দিয়েছিল। যথারীতি রেজাল্ট বেরুল, তার নাম নেই। ক্রস-লিস্ট আনানো হল, ইতিহাসে ফেল। মেয়ে বললে, এ হতেই পারে না, আর যাতেই হোক, হিস্ট্রিতে ফেল করতেই পারিনে। আমার খাতা আবার দেখা হোক। ওঃ কি বলব মশাই, সেই খাতা রি-এক্জামিন করাতে গিয়ে আমার লাইফ কমসে কম সাত বচ্ছর কমে গেছে। শেষ পর্যন্ত একশ রকম টালবাহানা কাটিয়ে তবে খাতা আবার দেখাই। মেয়ের কথাই সত্যি। যিনি খাতা আবার দেখলেন তিনি চুক্ চুক্ করে বললেন, বড়ই আফশোস, মেয়েটার প্রতি খুবই অবিচার করা হয়েছে। এ মেয়ে পাশ করে যেত।

বললুম, যেত কি মশাই, পাশ করিয়ে দিন। ভদ্রলোক জিভ্ কেটে বললেন, তাকি পারি? বাঃ কেন পারবেন না। ভদ্রলোক বললেন, কি করি বলুন, প্রোফেশন্যাল কার্টসি। সহকর্মীর বেইজ্জৎ জ্ঞানত করি কি করে? সত্যিই মেয়েটির ব্যাড্লাক্। আবার একবার পরীক্ষা দিক, আর কি। তাই শুনে আমি তো থ। চোখের উপর একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে, বুঝে সুঝেও, অন্যায় হয়েছে তা স্বীকার করেও চুক্ চুক্ এর বেশী ভদ্রলোক কিছু করতে পারলেন না। শেষে আমি বললুম, মশাই, বুঝতেই তো পারেন মধ্যবিত্তের মেয়ে, একবারের বেশী পড়বার টাকা যোগাড় করবে কোথা থেকে, জীবনটা মাটি হয়ে যাবে? আপনার কাছে তো ফেবার চাইছি না, পাশ করা মেয়ে ফেল করিয়ে দিলে, তারই প্রতিকার করতে বলা হচ্ছে। ভদ্রলোক ফের চুক্ চুক্ করে বললেন, সবই বুঝি ভাই, কিন্তু করবার কিছু নেই। তখন বললুম, তবে খাতা ফিরে পরীক্ষা করার মানে কি হল? ভদ্রলোক জবাব দিলেন, ওই একটা স্যাটিস্ফেক্শন্ আর কি? নম্বর নতুন করে বাড়ানো আর চলবে না, তবে যোগেটোগে ভুল থাকলে শুধরে দেওয়া যেত। বারোটা বেজে গেল মেয়েটার আর কি?

আর একজন তাড়াতাড়ি বললেন, তাহলে আমার কথাটা শুনুন। আমার ভাইপো, মশাই মোটামুটি ভাল ছেলে। আই এ পাশ করে বললে, বি এস-সি পড়ব। ফিজিক্স কেমিস্ট্রি আর বায়োলজি ইণ্টারমিডিয়েটেই ছিল। পরীক্ষা দেবার সময় কিন্তু অঙ্ক না থাকলে বি এস-সি পড়া যায় না, আলাদা করে আই এস-সিএর অঙ্কের পরীক্ষা দিতে হয়, তাই দিলে। তারপর বি এস-সি পরীক্ষাও দিলে। ফল বেরুলো, ওর নাম নেই। কি ব্যাপার? না অঙ্কে ফেল করেছে। গিয়ে জিগ্যেস করলে, আর বি এস-সি, তাতে পাশ করেছি তো, কিছুতেই জানতে পারলে না। আবার এক বছর ধরে শুধু ইণ্টারমিডিয়েটের

অঙ্কই পড়ল। পরীক্ষা দিলে ফের। অঙ্কে থার্ড হয়ে গেল। খুশী হয়ে বি এস-সি'র রেজাল্ট জানতে গেল। এতদিন বাদে শুনল তাতেও ফেল। দু বছর লাগল ফেল করতে। সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর ফিরলে না। দুদিন বাদে হেয়ার স্ট্রীট থানা থেকে খবর পেয়ে মর্গ থেকে তার মৃতদেহ বের করে আনলাম।

কদিন ঘুরে কটি মাত্র ঘটনার কথা বললুম। আরো ঘুরলে আরো মিলত। কিন্তু সরস্বতীর খাস তালুকের ঠিকেদারদের রোজগারে বিন্দুমাত্রও ঘাটতি হত না, বিন্ধ্যপর্বতের অনড়তায় একটুও চাঞ্চল্য জাগত না। ব্যবসা যে একচেটে!

ঘোড়দৌড়

(এক)

রূপেয়ার ঝিলিক কড়া-ঝিলিক। যার আঁখিতে সে ঝিলিক একবার চোট মেরেছে, সে জখম। তার চক্ষে লাগে ধাঁধাঁ। তারপর যেদিকে আলো-আলো দেখে, সেই দিকে দৌড়য়। আগুপাছু চাওয়া নাই, ভাবাচিন্তা কিছু নাই, একেবারে বে-দিশা, বে-হুঁশ, বাওরা। তারপর একদিন যখন ঠেক খায়, হুঁশের গাছে পাতা ওঠে নতুন করে, আক্কেলের পানি চোখের ঘুম মুছে ফেলে, তখন বোঝে যাকে নিশানা করে ছুটেছিল, তা আলো নয়, আলেয়া। তা পথ দেখায় না, পথ ভোলায়।

এই রেস অর্থাৎ ঘোড়দৌড় এমনি এক আলেয়া। ঢোকবার মুখে হৈ হৈ, বেরুবার মুখে হায় হায়।

হপ্তার বেবাক দিনগুলি একেবারে পান্‌সে। ইনফ্লুয়েঞ্জার শেষের মত। হ্যাঁ, বিষ্যুতবার হল তো একটু নড়াচড়া, একটু উস্‌খুস্‌। শুক্রবার হল তো একটু চুলবুল চুলবুল। চাপা পড়া উত্তেজনার চুলে উৎসাহের চিরুণী বুলোনো শুরু হল। তারপর শনিবার হল কি, ব্যস্‌, বাঁধ ভাঙা স্রোত চলল, হেঁটে, নয় মোটরে, নয় ট্রামে। কোথায়? না, রেস-ময়দান। দুয়ে দুয়ে, শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে।

দুটি টাকা ফ্যালো, 'গেট্‌মানি', টিকিট কেনো, ভেতরে ঢোকো। তারপর আর কি? হিসেব তো কষাই আছে। কিসে খেলবে? কত খেলবে? ট্যাকের অবস্থা বেশ মোটা তো? বহুৎ আচ্ছা। প্রেম্‌সে খেলো। এসো টিপ্‌স্‌ বলে দিই।

কি, বেলুড় প্লেট্‌ থেকেই শুরু বুঝি আজকে? আচ্ছা। তবে তো ভালোই, এসো স্বামীজীর নাম নিয়ে ঝুলে পড়ি, কাটো শালা 'উইনে', পনর টাকা লাগাও। 'ড্রাই ডে', 'ড্রাই ডে'তে ধররে ভাই, মনটা সকাল থেকে 'ড' 'ড' করছে। আপিসে বেরুবো, ছোট ছেলেটা হামাগুড়ি দিয়ে সামনে এল। কোন দিন করে না ভাই, ধর্মত বলছি, দু-হাত দিয়ে কোঁচা চেপে ধরে, মুখ তুলে আওয়াজ ছাড়লে, ডা ডা ডা। আপিসে দেরী হয়ে গেস্‌ল, সাহেব গাল দিলে, তাও মাইরী ড্যাম্‌ বলে, এতগুলো যোগাযোগ যখন তখন 'ড্রাই ডে', শালা

প্সিওর উইন্'। নির্ঘাৎ বাজী মারবে। এই বলে দিলাম। দত্ত, জয় বাবা বেলুড়েশ্বর বলে ছ'খানা 'উইন' কেটে ফ্যাল।

আরে ধেত্তর, তোমার 'ড্রাই ডে', ও-শালার যত লপচপানি 'স্টার্টে'। 'ফিনিসে' গিয়ে হেদিয়ে পড়ে। ঘোড়া চেনো বাবা। আমি বলছি 'কলি ফ্লাওয়ার'। 'পাস্ট্ রেকর্ড'টা দেখেছ একবার! অর্ডিনারী ঘোড়া নয় বাবা, 'জেট্ প্রোপেল্ড'। আর কি বংশ! একেবারে নৈকুষ্যি কুলীন। ওর ঠাকুমা তিনবার ডার্বিতে সেকেন্ড, দিদিমা দুবার আইরিশে 'উইন', বাপ গ্রান্ডে বরাবর প্লেস রেখেছে, আর মা, আহা হা, অমন একটা মেয়ে লাখে মেলে মশাই। ডার্বির পর ইণ্ডিয়াতে এল। প্রথমেই বোম্বাইতে দৌড়ুলে, জকি ছিল কানা প্যাট্। একেবারে হাউই ছোঁড়া দেখিয়ে দিলে মশাই। 'গোল্ডেন বারের' দৌড় তো সেবারে দেখেছিলেন, অমন তেজী 'এনিমল'টাকে তিন লেংথে মেরে বেরিয়ে গেল। তারপর মাদ্রাজ, তারপর দিল্লী, কোথাও আর সে বছর বাকী রাখলে না। তার পরের বছরই বিয়োলে, আর সেই সন্তান হল এই 'কলি ফ্লাওয়ার'।। এই রেকর্ড আপনার 'ড্রাই ডে' কোথায় পাবে? 'কলি ফ্লাওয়ারের' পাশে 'ড্রাই ডে' মশাই হিমালয়ের পাশে উইয়ের ঢ্যাপঢেপে ঢিপি। গাঁট গচ্চা দেবার ইচ্ছে থাকে, 'ড্রাই ডে'তে লাগান।

ঘোড়া বললে পাছে 'প্রেস্টিজে' লাগে, হাজার হোক কেষ্টের জীব, মান অপমান জ্ঞান তো ওদেরও আছে, মেজাজও আছে, কথাটা ঠোঁট থেকে বেরিয়ে বেটক্করে কার কানে লেগে যাবে, মেজাজটা যাবে তার বিগড়ে, দৌড়ুতে গড়িমসি করবে আর যাবে তকাদিরের বারটা বেজে, কি দরকার বাবা ঘোড়াকে ঘোড়া বলে, অনেকে তাই আদর করে বলে 'এনিম্যাল্'। সাহেব বললে এককালে হ্যাট-কোটধারী বাঙালী বাবুরা খুশমেজাজ হতেন। 'এনিম্যাল্' বললে ঘোড়াদের 'প্রেস্টিজে'ও বোধহয় তেমনি সুড়সুড়ি লাগে, অন্তত এদের ধারণা।

দলে দলে লোক ঢুকছে। বসবার জায়গা ফুল তো মাঠ আছে কেন? শুরু হল পয়লা রেস্। ঘোড়া তো দৌড়ুবে শেষে, দাঁড়ান, আগের কাজগুলো আগে শেষ হোক! টিকিট কেনা হোক! ঝড়াক করে বোর্ড টাঙানো হল। বোর্ডের গায়ে বিস্তারিত লিখন। রেসের নম্বর। ঘোড়ার সিরিয়াল—এক, দুই, তিন, চার......যতগুলো ঘোড়া দৌড়ুবে ততগুলো নম্বর। এক নম্বরে যার নাম সে বেড়ার পাশে দাঁড়াবে, দু নম্বরে যার নাম সে এক নম্বরের বাঁ পাশে দাঁড়াবে, এমনি করে তিন নম্বর দু নম্বরের বাঁ পাশে, চার নম্বর তিনের বাঁ পাশে......যে যত ডাইনে, তার দিকে তত নজর, বাজী মারবার তার তত 'চান্স'।

ঘোড়ার সিরিয়ালের পর ঘোড়ার 'রাইডারের' নাম। 'রাইডার' অর্থ যে

ঘোড়ায় চড়ে, শাদা বাঙলায় 'জকি'। জকির নামের পাশে ঘোড়ার আসল নম্বর। বোর্ডের গায়ে দ্যাখ তো রে কত নম্বর? নয়। নয়? মিলা তো হাতের কেতাবের সঙ্গে। কি বলে? 'ব্ল্যাক স্টর্ম'। বাঃ, 'পোজিশন' ভালই আছে দেখি, তিনের 'পোজিশন্'। ঠিক হ্যায়, ধরে রাখ, ওটাকে 'প্লেসে'। 'উইনে' বাবা যাকে স্বপ্নে পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে খেলছিনি, সে ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এসে বললেও না। স্বপ্ন বিশ্বাসের একটা মূল্য তো আছেই। কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় কেষ্ট তর্কে বহুদূর।

কার কথা বলছেন মশাই? আজ্ঞে না, এই বলছিলুম আর কি? আপনি কাকে 'উইনে' রাখলেন? 'গোল্ডেন ঈগল'। 'গোল্ডেন ঈগল'। মাই ঘড্! ওটা কি রেস খেলার যুগ্যি নাকি মশাই? অ্যা। ও তো গাড়ি টানার ঘোড়া। পাছা নিয়ে নড়তে পারে না, দৌড়ুবে কি মশাই?

বটে! ঘোড়ার দৌড় কাকে বলে দেখেছেন কখনো? ফুটুনি মারছেন খুব যে, অ্যা। আমাকে ঘোড়া চেনাচ্ছেন মশাই! কদিন ধরে রেসে আসছেন? ক'খানা বাড়ি বেচেছেন? বাজারে ক'টাকা দেনা হয়েছে? শুনুন, মেলা ফট্‌ফট্ করবেন না, বাগবাজারের ওপর তিনখানি বাড়ি, সাত বিঘে জমি বরানগরের, সব এই ময়দানে গেছে, এই অশ্বিনীকুমারদের খুরে খুরে, আমাকে ঘোড়া চেনাবেন না। রোজ সকালে এই ময়দানে আসছি মশাই। সব ঘোড়ারই 'ট্রাকিং' দেখেছি। দুদিন 'গোল্ডেন ঈগল'কেও এনেছিল। দৌড় দেখলুম। কি 'গ্যালপ্' ওয়াণ্ডারফুল! তবু তো বাচ্চা, এখনো 'ফর্মে' আসেনি। ফর্মে এলে দেখবেন, ও-ঘোড়া ছপায়ে দৌড়ুবে। এখনই 'ফার্লং' ক্লিয়ার করছে স' বারো, সাড়ে বারো সেকেণ্ডে। জকির যে বাবুর্চি তার সঙ্গে আমাদের আপিসের পদা খুব জমিয়ে নিয়েছে। পদা বললে, শালা নাকি ঘুঘুস্য ঘুঘু। মুখ আর খুলতেই চায় না। তুইয়ে তাইয়ে, মাল টাল খাইয়ে তবে পদা তাকে জপিয়েছে। এত সিওর কি মশাই সাধে হই। 'সোর্স' পাকা বলেই না। বাবুর্চি বলেছে, ছ ফার্লংএ 'গোল্ডেন ঈগল'কে মারবে এমন কেউ এই ময়দানে নেই।

তবে আপনি বলছেন, গোল্ডেন ঈগল? নিশ্চয়ই। 'প্লেসে' ধরি। কি বলেন? কল্‌জে ফোলান। টিপু টিপু করবেন তো রেসে এসেছেন কেন? তবে কি 'উইন'? এর আবার 'হেজিটেশন্' কি! চোখ বুজে খেলে যান।

'উইন' কি? 'প্লেস্' কি? 'উইন' মানে জেতা অর্থাৎ 'ফার্স্ট'। যে ঘোড়ায় 'উইন' খেলব, সে যদি ফার্স্ট হয় তবেই কিছু প্রাপ্তি, নইলে লবডঙ্কা। আর 'প্লেস'? ফার্স্ট, সেকেণ্ড, থার্ডের মধ্যে হলেই হল। 'উইন'এর টিকিট আলাদা। 'প্লেসে'র টিকিট আলাদা। এতো গেল অর্ডিনারি। আবার আরেক

কায়দা আছে। তাকে বলে 'ফোরকাস্ট্'। কোন্ ঘোড়া ফার্স্ট হবে, কোন্‌টা হবে সেকেন্ড তোমাকে আগে বলে দিতে হবে। টিকিট কিনতে হবে সেই রকম। যদি লেগে গেল তো পেলে এক থোক, আর যদি ফস্কে গেল তো ব্যস। পায় আর কটা? লাখে এক। যায় সব্বার।

টিকিট কেনবার সময় তো সব্বারই 'উইন'। এ বাবা ঝোপ বুঝে কোপ নয়, একেবারে অংক, 'ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন', দস্তুরমতো হিসেবের কাঁড়ি। এই যে ধর 'ফেয়ার ফক্সে' টাকা ধরলুম, সে কি হুট করে? কক্ষনো না। বেস্পতিবার সকালে আমি ট্র্যাকে ছিলুম। দু ফার্লং চব্বিশ সেকেন্ড দিব্যি মেরে দিলে। ওকে এক মারতে পারে 'প্রিম রোজ'। তা তার হিসেব দ্যাখ, 'সেম্ ডিস্‌ট্যান্স কভার' করেছে, 'টাইমিং' দ্যাখ, সময় নিয়েছে পঁচিশ সেকেন্ড। আর যারা আছে তাদেরকে ও থোড়াই কেয়ার করে, তারা সব ছাব্বিশেই কেউ উঠতে পারেনি। এতক্ষণ চুপ করেছিলুম কোন্ প্লেস পায় দেখবার জন্য। এক নম্বর পেলে না, তিনে দাঁড়াল, তেমনি 'প্রিম রোজ'কে ঠেলেছে সাতে। কম্পিটিশনের যেটুকু চান্স ছিল, গেল। তাই বলছি তিনকে 'উইনে' রাখ। আর 'ফোরকাস্ট' খেল তিন সাত। দ্যাখ কপালের ঘড়িতে টিক টিক কি বলে?

অফিসে তুমি বড় সাহেব আমি কেরাণী, তুমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমি আর্দালী, সর্বদা তটস্থ থাকি, মুখ তুলে চাইনে, সেলাম বাজাই চলতে ফিরতে, জী হুজুরে সর্বদা হাজির থাকি। কিন্তু রেসের ময়দানে তোমায় আমায় ফারাক শুধু বসার জায়গার। আমি গরীব, পায়দলে আসি, আমার স্থান দু টাকার স্ট্যান্ডে। তুমি রইস্‌লোক, মোটর হাঁকাও, দুরবীন কষে দৌড় দ্যাখ, 'বারে' ঢুকে গলা ভেজাও, পাঁচ টাকা আট টাকার স্ট্যান্ডে ব'স। এই শুধু ফারাক। কিন্তু সাহেব, কিন্তু বড়বাবু, খেলার শেষে তুমি আমি এক সমান। তুমিও হার আমিও হারি। তখন আমরা হারতুতো ভাই।

সাহেব ইশারা করেন, বেয়ারা ছোটে। ওদিকটা পাঁচ টাকার স্ট্যান্ড, এদিকটা দু টাকার। এপারে স্ট্যান্ড ওপারে স্ট্যান্ড মধ্যিখেনে পাঁচিল। সাহেবে বেয়ারাতে বাতচিৎ চালাচালি হয়। সাহেব ডাকেন, রামধারী! বেয়ারা হাঁকেন, হুজুর। সাহেব বলেন, টিপস্ মিলা? সুলুক সন্ধান পেয়েছ? বেয়ারা বলেন, জী হাঁ। সাহেব বলেন, বাতাও? বলো? বেয়ারা বলেন, হুজুর ফোরকাস্ তিন এক। সাহেব বলেন, খবর পাক্কা হ্যায়? বেয়ারা বলেন, একদম পাকা। সাহেব বলেন, তো, রুপেয়া লো, হমারে নামপর পন্দর রুপেয়া ফোরকাস্ট লাগাও। টাকা নাও, আমার নামে পনের টাকা ফোরকাস্টে ধর। বেয়ারা নারাজ। বলেন, হামকো নসিব আচ্ছা নেহি, আপ্ খুদ লাগাইয়ে।

আমার কপাল ভাল নয়, আপনি নিজেই লাগান। সাহেব বলেন, হাম বড়া আনলাকি হ্যায়। তুমহারা ভাতিজা কাঁহা? উসকো লায়া নেহি? আমিও তো 'পোড়া কপাল্যা', তোমার ভাইপোকে আনোনি।

খুড়ো এই তাকেই ছিলেন। অনেকদিন ধরে ফাঁক খুঁজছেন, ভাতিজার আখেরী এক বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য। মওকা মিলল। বললেন, হুজুর বেচারা বড্ড মন-মরা হয়ে আছে। চাকরী বাকরী নেই। সাহেব বলেন, ঠিক হ্যায় উল্লুক, সময় নষ্ট করো না। শিগ্‌গির টিকিট কেন। ওকে কাল থেকে ঠিক সময় আপিসে আসতে ব'ল।

পাঁচটাকা আট টাকার স্ট্যাণ্ডে কি আহামরি শোভা। লাল নীল হলদে, পোষাকের জেল্লা কি! লেডিরা বসে আছেন ওদিকে, যেন নব রঙের সূর্যোদয়। এক হাতে ঝোলানো-ঝোলা, অন্য হাতে 'দি টার্ফ'। ঘোড়ার ঠিকুজী-কুষ্ঠি। এ'রা সব সোসাইটি-মেয়ে। ঘোড়ার নাম, জকির নাম, ট্রেনারের নাম, আস্তাবলের সহিসের নাম, ঘোড়ার মালিকের নাম ও'রা লিপস্টিকের সঙ্গে ঠোঁটে মেখে রাখেন। ডিনার খানায় কি ক্লাব-নাচের ফাঁকে ফাঁকে মিহি করে দুটি একটি ঝেড়ে দেন। কে? জকি গর্ডন রে? ও! উনপঞ্চাশ সালে ওর পায়ে একবার খিঁচ্ ধরেছিল। মিলি বোনার্জী তো খবরটা পেয়ে কেঁদেই একশা। সমবেদনা জানিয়ে একটা রেডিও মেসেজ্ পাঠিয়েছিল। কেন শিবাজীর ঘোড়া 'হোপলেসে'র যখন অসুখ হয় তখন কি মিলিকে দেখেছিলেন? খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল প্রায়। মিলির 'হট্ ফেভারিট্' ছিল। ওকে নিয়েই তো ডাইভোর্স হয়ে গেল বোনার্জীর সঙ্গে মিলির। পুওর ডক্টর, কি করে রেসের খরচ জোগাবে? না পারবে তো মিলিকে বিয়ে করতে যাওয়া কেন? ফুঃ। শুনছি জৈদ্‌কার সঙ্গে এবার ওর বিয়ে হবে। জৈদ্‌কা উইল বি এ রিয়েল ম্যাচ ফর হার। হি টু ইজ্ এ হর্স লাভার।

ঘোড়া দৌড়য় আর কতক্ষণ। বড় জোর দু আড়াই মিনিট। কিন্তু টিকিট কেন, পেমেণ্ট নাও, হ্যান ত্যান সাত সতেরোয় সময় যায় বেশী। প্রথম চোট যদি হারলে তো 'লস' 'মেক্ আপ্' করবার জিদ্ চাপল। তারপর চলল হারের পর হার। যতক্ষণ দম। যতক্ষণ পকেটে শেষ কড়িটুকু। যদি প্রথমে জিতলে, তো আরো জেতার লোভ। আরো খেলা, আরো হার। আবার সেই জেদের যাদু—'লস্ মেক আপ্' করব। আবার সেই হার। হারের পর হার। যতক্ষণ বুকে দম। যতক্ষণ পকেটে শেষ কড়িটুকু।

যে কটা সেকেণ্ড ঘোড়া দৌড়য়, সেই সময়টুকুতেই আশা, উন্মাদনা, উত্তেজনা, আকাশে চীৎকারের পিণ্ড ছুঁড়ে দেওয়া। দৌড় শেষ তো শ্রান্তি।

ভাবী অবসাদ। একবার একবার ঘোড়া দৌড় দেয়, সহস্র কণ্ঠের আওয়াজ ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে আকাশে ওঠে। দৌড় শেষ তো আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে শ্রান্তি। অবসাদ নিবিড় করে পেঁচিয়ে ধরে।

সব কটা রেস শেষ হয়। বারে ভীড় বাড়ে। যারা জিতেছে তারা আনন্দে টাকা ওড়ায়। যারা হেরেছে তারা তো ডুবেছে। ডুবতে ডুবতেও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বোতলের গলা। যাদের কিছুই আর নেই, তাদের শূন্য দৃষ্টি প্রাণহীন ট্র্যাকের উপর নির্জীব পড়ে থাকে। টার্ফের রিপোর্টগুলো, ঘোড়ার হিসাবগুলো, গোপনীয় টিপস্‌গুলো পাশাপাশি পড়ে থাকে। এলোমেলো বাতাসে ওড়ে। খেল খেতম। তারপর দৃশ্যটাকে ঢেকে দিতে রাত্রির যবনিকা নেমে আসে ধীরে ধীরে, অতি নিশ্চিত নিরীখে।

(দুই)

ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন, ছিপটি দিয়ে কসলেন এক সপাৎ ঘাই, আর অমনি ঘোড়া আপনার পংখীরাজের পুত্তুর হয়ে টকাস করে বাজীটি জিতে আপনার পাশ-পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল নোটের তাড়া, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এলোপাতাড়ি টিকিট কিনে রেস জিতে বাড়ী ফেরা তার চেয়ে ঢের সহজ কাজ।

ঘোড়দৌড়ের জিয়নকাঠি মরণকাঠি ঘোড়া। যে সে ঘোড়া নয়। এবং রেসের ঘোড়াও যে সে নয়। আদরে যত্নে নতুন জামাই, আরামে বিরামে রাজাগজা আর নামডাকে 'ফিলিম এস্টার'। এই তিনে এক হয়ে কামনা সাগরে ডুবে মরলে পরজন্মে নির্ঘাত রেসের হর্স।

দৌড়ের ঘোড়ার যেমন জন্মও আলাদা তেমনি তাদের তালিম ট্রেনিং। পেট থেকে পড়ল আর জিন চাপিয়ে রেসের মাঠে নেমেই দিলেন কষে দাবড়, মোটেই তা নয়। মাছে আর মাছ ভাজায় যেমন তেল কড়াই-এর ফারাক তেমনি ঘোড়ায় আর রেসের ঘোড়ায়। ঘোড়ার মায়ের আর কি? বাচ্চাকে বহাল তবিয়তে ডেলিভারী দিয়েই খালাস। তারপর সে নিশ্চিন্ত। আর বাচ্চার জিম্মা? ট্রেনারের। বাচ্চা তো বাচ্চা, তার হাঁচি কাশির জিম্মাদারও ট্রেনার।

দৌড়ের ঘোড়ার তোয়াজ কি! ঘোড়াটা কি খাবে? কতটা খাবে? কতক্ষণ আস্তাবলে থাকবে? কতক্ষণ রাউণ্ডে? সব দিকে নজর চাই কড়া। ঘোড়া পোষার মূলমন্ত্র হল ফিট রাখা। ঘোড়া বলে যে তাকে যা তা গুচ্ছের খাইয়ে যাবে তা চলবে না। এক আধ টাকার মাল নয় মশাই, এক একটা

ঘোড়ার দাম শ্‌নলে নিতান্ত আপন লোকের নামও গ্‌বলেট হয়ে যাবে, তাই আর সে কম্ম করলাম না। কোন কিছ্‌র ইতরবিশেষ্‌ হলেই চক্ষ্‌টি উল্টে ফক্কা হয়ে যাবে আর বাস দ্‌নিয়া অন্ধকার। হাতীর খরচ হাতীর খরচ করেন, ঘোড়ার খরচের কাছে সে তো শাক ভাত। ঘোড়ার তম্বির তদারকে শত ফৈজৎ। একঃ ঘোড়াকে নিয়মিত খাওয়ান, দ্‌ইঃ নিয়মিত ব্যায়াম করান, তিনঃ দলাই মলাই, আর চারঃ নাল পরান। এই চারটে কাজই ঘোড়া পোষার নিত্যকর্ম পদ্ধতির বীজমন্তর। একটিও কম হলে চলবে না।

সহিসটা বললে, তিন দোফে খাওয়াতে হোবে, সোকালে, দ্‌'পারে আর সন্‌ঝেকা সোমায়। হররোজ এই টাইম চলবে। ইধার উধার একরোজ হোবে তো সাহেব লাথ মেরে বোলবে যাও সালে ভাগো। কি খাবে? আরে ভাই, বহোৎ চিজ্‌ খায়। আর কুথা থিকে থিকে সোব আসে। লন্দন, অস্ট্রেলিয়া, আম্‌রিকা।

কত কি আসে? ওট্‌ আসে, মেজ্‌ আসে, বার্লিদানা। আবার চানা, দাল, শ্‌খা খড়। যতটা ওট্‌ কি দানা আর ততটা শ্‌কনো খড়, এই হল সাধারণ। তো যেসব ঘোড়া জোর ছোটে তাদের বেশী দানা আর কম খড় দিতে হবে। নয়তো 'ফিট' থাকবে না। মাঝে মাঝে ম্‌খের সোয়াদ বদল করতে কাঁচা ঘাসে ম্‌খ লাগাতে দেওয়াতে পারো আর তাও খ্‌ব হ্‌ঁসিয়ার হয়ে, আবার তাও গরমকালে। কাঁচা ঘাসে র্‌চি ঠিক থাকে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। কিন্তু কাঁচা ঘাস বেশী খাওয়ালে ঘোড়ার 'স্পীড্‌' কমে যায়। সে ঘোড়া আর জোর কদমে ছ্‌টতে পারে না। মহা লেদ্‌ড়্‌স্‌ মেরে যায়। খাওয়ার পর ঘোরাফেরা, একট্‌ আধট্‌ ব্যায়াম করানো দ্‌' চার কদম ছোটানো অবশ্যই চাই। নইলে ঘোড়ার পা থাম হয়ে যাবে। তারপর হল দলাই মলাই। দপাস্‌ দপাস্‌ থাপ্পড়, আর ভুর্‌স্‌ ভুর্‌স্‌ ব্‌র্‌শ চালানো। এ কার্যটি ঠিক মতো না করেছ কি ঘোড়ার মেজাজ তেরিয়া হয়ে যাবে। আর সব শেষে নাল ঠোকা। নাল ক্ষয়ে যাক আর না যাক, প্‌রানো নাল খ্‌লে ফেলে খটাস খটাস নতুন 'জ্‌তো' পরাতে হয়। মাসে একবার করে অন্তত এই কম্ম করতে হবে। ঘোড়ার দৌড়টি আমার দরকার। সেটি পরিপাটি চাই বলে পায়ের উপর এত নজর। নাল যদি না পরাও তো বাড়তি খ্‌র ছেঁটে ফেল। পায়ের উপর খবরদারী শেষ হল? তো এবার এস আস্তাবলটা দেখি। আরে একি ব্যাপার? এই নাকি আস্তাবল? এই তার জানালা? চলবে না। হাওয়া বাতাস খ্‌শী মতো যেখানে হাসতে খেলতে না পারে সে জায়গার ঘোড়া দৌড়বাজীতে 'খেল' দেখাবে কি করে?

সহিস বললে, এক একটা ঘোড়াকে দুরস্ত করতে ঘামের পানিতে বর্ষা নেমে যায়। ঘোড়া যা 'জানবর' একটা আছে না, একদম বিলকুল জেনানাকা মাফিক। মন বুঝে না চললে কিছুতেই বাগ মানানো যায় না। একটুতে ঘাবড়ে যায়, একটুতে বেঁকে বসে। ঘোড়ার উপর চড়বেন যেন ওর গায়ে আঁচড়টি না লাগে। যদি একটু লাগল তো ব্যস্, গড়বড় হয়ে গেল। ঘোড়ার থেকে নামবেন তাও আলগোছে। একটু কড়া ঝাঁকুনি ঘোড়ার পিঠে লাগল কি ব্যস্, মেজাজ বিগড়ে গেল। লাগাম ধরে টানলেন, একটু কড়া হল, কি চোট লাগল গায়ে, তো আর কাজ হবে না তাকে দিয়ে।

সহিস বললে, এমুন বুদ্ধি আছে কি পিঠে যে সওয়ার থাকবে তার বোসবার কায়দা দেখেই মালুম কোরে লিবে, এ সওয়ারের কি 'পাওয়ার' আছে। যদি বুঝে যে হাঁ, ই আচ্ছা আছে, 'ইস্‌পর' বিশোয়াস করা চোলবে তো সে সওয়ারের কথায় জান দিয়ে দিবে। আর যদি বুঝে যে ই আদমী কাবিল না আছে তো এক কদম ভি যাবে না। কেন, না ডর লেগেছে। সওয়ার তো কাঁচা। উ নিজে ভি গিরতে পারে আর 'জানবর'কে ভি গিরাতে পারে। তো জান কবুল, এক কদম ভি চলবে না। পিঠ থিকে সওয়ারকে গিরাইয়ে দিবে। এমুন খচ্চর আছে।

রেসের এক চাঁই বললেন, তোয়াজ। সেরেফ তোয়াজেই এ জানোয়ার বশ। আর রেসের ব্যাপার, জানেন তো, এক চুলে হার জিত ঠিক হয়ে যায়। সত্যিই চুল পরিমাণ, কথার কথা নয়। আর ঘোড়াগুলো তা যে বোঝে না, তা নয়। এমন স্পর্শকাতর জানোয়ার আর দুটি পাবেন না। বড়লোকের একমাত্র আদুরে মেয়েরও বাড়া। কথায় কথায় তার যেমন ঠোঁট ফোলে, মেজাজ বিগড়ে যায়, ঘোড়ারও তাই। ইসারাই যথেষ্ট। চাবুকের শব্দই ঢের। তাতেই যা করবার ওরা করবে। ঘাঘু জকি কখনোই ঘোড়াকে চাবুক মারে না।

দৌড় চলেছে ফুল ফোর্সে। গলায় গলায় চলেছে ঘোড়া। হিস্ হিস্ শব্দ, মৃদু মৃদু পায়ের ঠোক্কর। ওই যথেষ্ট। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে দিলেন এক ছিপটির বাড়ী কষিয়ে। ঘোড়া চমকে উঠলো। গতি মুহূর্তের জন্য কমে এল। ব্যস্, 'উইন'-এর বারোটা ওখেনেই বেজে গেলো। ঘোড়ার গায়ে যতটা ব্যথা লাগল, তার দুনো লাগল মনে। পাঁচ ঘোড়ার সামনে বে-ইজ্জৎ? যাস্‌শা কে আর দৌড় করায় দেখি? ঘোড়া বসল বেঁকে। আর ত্যাড়া ঘোড়াকে সিধে করবে কে?

ঘোড়ার হার জিতে জকীদের দায়িত্বই বেশী। ভাল ঘোড়া, সিওর জিত, সেরেফ 'ক্যালকুলেশনে'র অভাবে মার খেয়ে গেল। এই তো সেদিনকার রেসের

কথাই বলি। টিপ্‌স্‌ দিয়েছিলাম। ঘোড়াটা সিওর। প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিল ঘোড়াটা জিতবে। জিততোও, জকীটার সমঝোতার অভাবে পারলে না। কি করলে মশাই, ঘোড়াটাকে সেরেফ ফারাকে নিয়ে দোড়ুলে। অথচ ওটা দঙ্গলে ঘোড়া। ওটাকে ফাঁকে না রেখে জকীটা যদি দঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলত তো দেখতেন, কারো সাধ্যি হতো না ওকে ছাড়িয়ে যায়। আবার অনেক ঘোড়া সিধে বেশ দৌড়ায়, 'টার্নে'র মুখে এসে স্পীড্‌ কমে যায়, অনেকে আবার 'টার্ন'টাকে কাজে লাগায় পুরো। টুকুস করে ওই টানে আধ 'লেংথ্‌' মেরে দিলে। তাহলে আর পায় কে? যে জকী তার ঘোড়ার গলদ যত বুঝতে পারে তার তত সুবিধে।

এখানে ফ্ল্যাট রেসই আকছার হয়। কম পাল্লা, মাঝ পাল্লা আর দূরের দৌড়। চার থেকে ছয় ফার্লং-এর দৌড় কম পাল্লার দৌড়, নাম হল স্প্রিণ্ট্‌। সাত থেকে আট ফার্লং-এর দৌড়, মাঝ পাল্লা। 'মাঝ পাল্লা'কে রেসের মাঠে কেউ চেনে না, ওখানে বল্‌বেন 'মিড্‌ল ডিস্‌ট্যাণ্ট'। আর দশ ফার্লং থেকে পোনে দুই মাইল, এই হল কলকাতার রেস-ময়দানের মসজিদ। মোল্লাদের দৌড় এর বাইরে আর যায় না। এর নাম 'স্টেয়ার'। এক এক পাল্লার ঘোড়া অন্য পাল্লায় বড় বিশেষ যায় না। একেবারেই কি যায় না? মিড্‌ল্‌ ডিস্‌-ট্যান্সের ঘোড়া কি 'স্প্রিণ্ট্‌'-এ দৌড়োয় না? দৌড়োয় বৈ কি। সেখানে জকী যদি মাপজোক ঠিক রেখে দৌড় করাতে পারে তো কামিয়াব হয়। নচেৎ ফটাং।

এক একটা ঘোড়ার যেমন এক এক রকম পাল্লা তেমনি এক এক ঘোড়ার এক এক রকম ওজন। হুট্‌ করে রেসের মাঠে নামিয়ে অমনি দিলেই হল, কেমন? তার আর হিসেব কিতেব নেই, না? আগে দেখ, কি রেস হচ্ছে। এবার কি 'টার্মে' দৌড়বে, না কি 'হ্যাণ্ডিকাপে'? কি, 'টার্মে'? তা বেশ, আনো ঘোড়াগুলো, ওজনে চাপাও। সব ঘোড়ার ওজন সমান করে দাও। জিনের গায়ে পকেট আছে। ওজন চাপিয়ে দাও। বাজারে গিয়ে মাছ কেনোনি? পাল্লার পাষাণ ভেঙ্গে নাওনি? তবে, তেমনি করেই ঘোড়ার পাষাণ ভেঙ্গে নাও। তারপর নামাও দৌড়ে। দেখি কার হিম্মত কত?

এবার কোন্‌ দৌড়? 'হ্যাণ্ডিকাপ'? আচ্ছা আনো ঘোড়া। আবার পাষাণ ভাঙ্গতে হবে। তবে অন্য কায়দায়। আগের বার যদি সকলের ওজন সমান করে দিয়ে থাক, এবারে ওজন কমিয়ে বাড়িয়ে সকলের 'চান্স' সমান করে দাও। এই ঘোড়ার এত ওজন? সেকেণ্ডে ফার্লং 'ক্লিয়ার' করছে। ও ঘোড়াটা এর সঙ্গে পারছে না। ওজন বেশী আছে ওর। আচ্ছা এ ঘোড়াটায় ওজন একটু চাপিয়ে দাও। এমনি করে ওজন কমিয়ে বাড়িয়ে একটা সামঞ্জস্য আনো,

তারপর মাঠে নামাও। এই ওজন কমানো বাড়ানোর অঙ্ক কষে কষে একটি ভদ্রলোকের মাথার চুল বেবাক ফাঁক হয়ে গেল। সে-ভদ্রলোককে বলে 'হ্যাণ্ডি-ক্যাপার'। তাই বেশ মোটা রকম একটা টাকা ইনি চুলের বদলি পেয়ে থাকেন।

লালয়েৎ পঞ্চবর্ষানি শুধু মানুষের বাচ্চার বেলায়। ঘোড়ায় বাচ্চা দু বছর বয়সেই মাঠে নামে। তার আগেই তার তালিম ট্রেনিং 'কমপিলিট্'। ঘোড়দৌড়ের মাঠের সংগে সেই যে তার পায়ের মিতালী শুরু, সে সম্পর্ক আর বছর আটেকের মধ্যে ছিন্ন হয় না। দশ বছর বয়েস পর্যন্ত ঘোড়ার দম থাকে। ততদিনই তার কদর। তার দাম। তার নাম মুখে মুখে। দশ বছরের পর সচরাচর আর 'ফর্ম' থাকে না। মাঠ থেকে ঘোড়া ঢোকে 'স্টাড্ ফার্মে'। তখন তার কাজ বাচ্চা পয়দা করা।

ঠিকুজী কুলজী মিলিয়ে অশ্ব আর অশ্বিনীর 'কোর্টশিপ' চলে। ইংরেজীতে বলে 'ব্রিডিং'। বাপদাদার নাম রাখতে, বংশের মুখে বাতি দিতে জন্ম হয় বংশধরের। নতুন এসে পুরানোর সিংহাসন দখল করে।

নতুন ঘোড়ার পরিচয় হয়, রেসের সমাজে প্রবেশ হয় বাপ মায়ের জীবনের রেকর্ড দেখে। রেশুড়েরা বাজী ধরবে, চট করে বই বের করে দেখে নেয় কে এই নবাগতের বাপ আর কে এর মা। ও এরই ছেলে! ওর বাপ এই সালে মাদ্রাজে অমুক কাপ জিতেছিল। ওর মা কলকাতায় পর পর তিনটে সিজিনে ভেল্কী দেখিয়ে ছেড়েছিল। তাদেরই বাচ্চা। ধর 'উইন'-এ।

একটা বাজী জেতে, দুটো বাজী জেতে। আবার বাপ মায়ের নামটা লোকের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু লোকের চোখে চোখে? না, বুড়ো বাপ মা নয়, জোয়ান বাচ্চাটাই সেই জায়গা জুড়ে আছে।

আর বুড়ো বাপ? বিগত দিনের 'ফেভারিট'? সে কোথায়?

পাবলিক জানে না, জোয়ান বাচ্চাটা জানে না, শুধু সেই ঘোড়াটা জানে, আর জানে ঘোড়দৌড়ের এই মাঠটা। সে দেখেছে, আস্তাবল থেকে বুড়োটাকে বের করে আনতে। সে দেখেছে, খুব বেশী দূরে নয়, একটা ঘেরা জায়গায় তাকে নিয়ে যেতে। সে দেখেছে গোটাকয়েক সার্জেন্টকে কোনো একদিন খুব ভোরের দিকে আসতে। সেই শুধু পর ,পর গোটাকয়েক টোটার আওয়াজ শুনেছে। বুড়োর কাজ শেষ। মানুষের চোখের সামনে আর কোনদিন সে আসবে না। ঘোড়দৌড়ের মাঠটা নিশ্চিত জানে, কেন? আর জানেন জু-বাগানের কর্তৃপক্ষ। কারণ কোন বাঘকে কতটা মাংস দিতে হয়, সে হিসেব তাঁরা করেন।

তাই যখন ঘোড়দৌড় হয়, 'গ্যালপে'র তাড়নায় ঘোড়দৌড়ের মাঠের নরম

'সার্কাস'

মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, বিস্ময়হীন চোখ মেলে ঘোড়দৌড়ের মাঠটা বিজয়ী ঘোড়ার 'গ্যালপ' গুণতে থাকে। গ্যালারী ফেটে পড়ছে চীৎকারে। 'বাক্ আপ্'। আরো জোরে, আরো জোরে, আরো আরো জোরে। থার্ড থেকে সেকেণ্ড, সেকেণ্ড থেকে ফার্স্ট। 'প্লেস' থেকে 'উইনে'। আরো জোরে। আরো জোরে। 'বাক্ আপ্'। তারপর 'উইন' থেকে? মৃত্যুতে। সারা-জীবনের ঝটিকাগতির স্থায়ী পুরস্কারে।

মাহেশের রথ

সেই কবে, আজকের এই এখানে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা সেদিনটির দিকে নজর দিতে গেলে চোখের পাওয়ার বাড়িয়ে নিতে হয়, ভুরু দুটো কুঁচকে আসে আর কপালের ওপর জমে ওঠে অনেকগুলো হিজিবিজি দাগ। একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তার বয়েস এগারো, নাম রাধারাণী। রুগ্না মাকে সে ঘরে ফেলে এসেছিল, বন্য ফুল কুড়িয়ে কয়েকগাছি মালা গেঁথে এনেছিল মাহেশের রথে. বিক্রী করে মায়ের জন্য পথ্য কিনবে বলে। বৃষ্টি এল, হঠাৎ ভেঙে গেল রথের মেলা, মালা রইল অবিক্রীত। মালাগাছি বুকে করে নিরুপায় বালিকাটি মাহেশ থেকে ফিরে যাচ্ছিল, এইটুকু শুধু মনে আছে আর সবই আবছা হয়ে গেছে. হ্যাঁ আর মনে আছে মাহেশকে, মাহেশের রথকে, রথের মেলাকে।

কতদিন ধরেই তো আমার জীবনে ঘুরে ফিরে সমারোহ করে আষাঢ় আসছে। নবজলদে সজ্জিত হয়ে, বনে বনে শ্যাম ছায়াঘন দিনের মেলা বসিয়ে, কদম্ববনে পুলক সঞ্চার করে, সবুজ তৃণে তৃণে রোমাঞ্চ জাগিয়ে আষাঢ় আসে। রথযাত্রার মেলা বসে। মলিনমুখী একাদশী এক কিশোরীর মুখ আমার মনের দীঘিতে ভেসে ওঠে। আষাঢ়ের আকাশের সঙ্গে সে মুখের কত-না সাদৃশ্য, দুই-ই জলভারে ভারাক্রান্ত ও শ্যামকরুণ। সে মেয়েটি একা তো মনে আসে না, মাহেশকেও আনে। এমনি করে মাহেশের সঙ্গে আমার পরিচয়ের নিবিড়তা।

আষাঢ় প্রত্যাসন্ন হয়ে এলেই, আকাশে ঘন মেঘপুঞ্জের সমারোহ শুরু হলেই ভেবেছি এবার মাহেশে যাব। কিন্তু প্রতিবারের ভাবনাই আমার পলাতক হয়েছে। এবারে কি যোগাযোগ হল জানিনে, মাহেশে যাওয়া সত্যিই ঘটল।

মাহেশে এলাম। কী ভীড়! গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক শড়ক লোকে বোঝাই। পথের দু'পাশে বাড়ীর ছাতে ছাতে লোক, একজন কে বললে, এ আর কি ভীড়, এখন কটাই বা লোক, উল্টো রথে আসবেন, তখন দেখে নেবেন, পুরী ফেরতা যাত্রীরা সব আসবে তো, পথে পা ঠেকাতে পারবেন না, লোকে লোকে একেবারে 'জনমানবশূন্য' হয়ে যাবে।

পৌঁছাতে দেরী হয়েছিল। এসে দেখি রথ বেরিয়ে পড়েছে। পাঁচ সাতশ লোক রথের দড়া ধরে টানছে, বাজনা বাদ্য হচ্ছে, রথ চলছে। হঠাৎ কিসের শব্দ

হল, বাজনাবাদ্য থেমে গেল, রথ পড়ল থেমে। একটুখানি বিশ্রাম। হঠাৎ ফটাস্ করে আওয়াজ হল, বন্দুকের আওয়াজ, ফাঁকা-ফায়ার, বাজনাবাদ্য শুরু হল, পয়সা আনির বৃষ্টি, এমনকি টাকারও। রথের গায়ে পটাস পটাস টাকা পয়সা এসে পড়ছে, কুড়িয়ে নিচ্ছে সেবাইতরা, অন্য লোকের নো-অ্যাড্‌মিশন্। বড় বড় মই দিয়ে গোটা রথের চতুষ্পার্শ্ব ঘেরা, রথ চলছে তো মইএর বেড়াও, রথ থামছে তো মইও হল্ট। সেপাই শান্ত্রী ভলেণ্টিয়ার সদাজাগ্রত চক্ষু। মাছিটি গলতে দেবে না সেই বেড়ার ভেতরে। রথের উপর কলস চাপানো, কুড়নো পয়সায় ভর্তি হলেই মুখটি বন্ধ করে ফেলা হচ্ছে।

সেই বেড়ার মধ্যে একফাঁকে ঢুকে পড়লাম। হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন এক সেবাইত। বললেন, এখানে ঢুকেছেন কেন? বললুম, কাছ থেকে রথের কারুকার্য একটু দেখব বলে। একটু নরম হলেন, ও, তা বেশ দেখুন। তবে কি জানেন, কারুকর্মের নিদর্শন এ রথে বিশেষ পাবেন বলে মনে হয় না। মাহেশের উৎসবটাই পুরানো, এই রথটা নয়। পূর্বে ছিল দারুময় রথ, একজন এসে তাতে গলায় দাঁড় বেঁধে সুইসাইড্ করেছিল। তাই সেটাকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। তারপর শ্যামবাজারের কেষ্টবাবু, কৃষ্ণচন্দ্র বসু, এই লোহার রথটি বানিয়ে দেন, প্রায় হাজার পঁয়ত্রিশ চল্লিশ খরচা হয়েছিল। ওদের খরচেই এখনো রথটির রক্ষণাবেক্ষণ চলে।

সেই স্মরণাতীত কাল থেকে মাহেশে রথযাত্রার উৎসব হয়ে আসছে। মাহেশের ঘাটে এসে প্রভু স্নান করেছিলেন। হাটে ছিল এক ময়রার দোকান। স্নান করে প্রভুর ক্ষিদে পেল, সংগে পয়সাকড়ি নেই, হাতের কঙ্কণ বন্ধক দিয়ে ময়রার কাছ থেকে মিষ্টি কিনে খেলেন। পুরীর প্রধান পাণ্ডা স্বপ্ন পেলেন, ওরে আমার হাতের বালা নেই, বন্ধক দিয়ে মিঠাই খেয়েছি মাহেশের হাটে, যা আমার বালা খালাস করে আন। ধড়মড় করে পাণ্ডার ঘুম ভেঙে গেল। পড়ি কি মরি মন্দিরে ছুটলেন, দেখেন সত্যিই, প্রভুর বালা নেই। ছোট্ ছোট্। মাহেশে এসে খুঁজে-পেতে ময়রাকে বের করে, সে বালা উদ্ধার করলেন। যে ঘাটে প্রভু স্নান করেছিলেন, সেই জগন্নাথের ঘাটের উপরেই আগে মন্দির ছিল। গঙ্গার ভেঙে যাবার পর মন্দির উঠে এসেছে বর্তমান স্থানে, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক শড়কের উপরে।

চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৬ খৃষ্ট সালে, ৪৬৬ বছর আগে, মাহেশের রথের মেলা তারো আগের। তখন সেবাইত ছিল ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়। প্রত্যেক বছরই নতুন রথ বানানো হত। নতুন রথে চড়ে প্রত্যেক বছর

প্রভু, মাঝখানে বোন, আর ওপাশে ভাইকে নিয়ে মাসীর বাড়ী গিয়ে ফূর্তিফার্তি করতেন, আট দিন পর বাড়ীতে ফিরতেন।, প্রভু ঘরে ফিরে এলে সেই রথ, ঘোড়া মায় গড়ুর পক্ষীটি অব্দি দিয়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের ধুনি জ্বালানো হত, মড়াপোড়ানোর কাজেও লাগত।

চৈতন্যদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন কমলাকর চক্রবর্তী, আমরা তাঁরই বংশধর, সেবাইতটি বললেন, মহাপ্রভু আদর করে নাম দিয়েছিলেন পিপ্পলাই, তিনি ছিলেন দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল, পরে এ বিগ্রহের সেবাইত হন তিনিই। তারপর থেকে সেবার ভার আমাদের হাতেই আছে।

প্রায় দুশ বছর হবে এই মাহেশেরই এক ভক্ত, ওরা ছিল ময়রা, একখানা বেশ বড়সড় রথ বানিয়ে দেন। সেখানা পুরানো হলে এই শ্যামবাজারের কেষ্টবাবুদের পূর্বপুরুষ, ওদের দেশ ছিল আরামবাগ সার্বডিভিশনে, কৃষ্ণরাম বসু, বড় ভদ্রলোক ছিলেন কি না, এক বিরাট রথ বানিয়ে দিয়েছিলেন। শুনেছি ঘাড় টনটন করে উঠত চুড়ো দেখতে গেলে, এমনই বিরাট, তেরটা চুড়োই ছিল, বিবেচনা করুন একবার, কাণ্ডখানা কি?

শুধু কি রথ বানিয়েই খালাস, যাবতীয় ব্যয় তিনিই চালিয়ে এসেছেন। সেই রথ ভাঙলে তাঁর ছেলে গুরুচরণবাবু আবার একটা নতুন রথ বানিয়ে দিলেন। তা মশায়, সেটা গেল দৈবগতিকে পুড়ে। তা সে-ও প্রায় নব্বুই একশ বছরের কথা হল। গুরুচরণবাবুর ছেলে রায় বাহাদুর কালাচাঁদবাবু আবার একখানা রথ বানিয়ে দিলেন, সেখানায় যখন আর কাজ চলল না, তখন তাঁরই দৌহিত্তির বিশ্বম্ভরবাবু, তিনি একখানা রথ বানিয়ে দিলেন, সে রথের ছিল পাঁচটা চুড়ো, তা সে রথখানার কথা তো আগেই বললাম, প্রভুর কি লীলা কে জানে, একজন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলে। তারপরই এই লোহার রথ, চারতলা, নয়টা চুড়ো। সেই রথই চলছে। চলছে মানে কি চালাচ্ছেন তাই বিনা ক্লেশে চলছে। তাঁর ইচ্ছা না থাকলে এই তো পিচ্‌বাঁধানো পথ কাদা নেই, উঁচু-নীচু নেই, তেলের মতো 'পেলেন', চালাক দেখি, নড়াক দেখি ইঞ্চিখানেকও কেউ? হরিবোল হরিবোল, প্রভু হে দয়াময়। আজ ক বছর ধরে ঠাকুর খুবই প্রসন্ন, কোনই কষ্ট দিচ্ছেন না, বেশ যাচ্ছেন। কিন্তু বছর পাঁচেক আগে, উয়াঃ সে কী কাণ্ড মশাই, মাসীর বাড়ীর কাছ বরাবর গিয়ে রথ আর চলল না, চলল না তো না-ই। টানা হ্যাঁচড়া করে করে হয়রান, তারপর হাল ছেড়ে দিলুম। বিগ্রহকে কোলে করে মন্দিরে নিয়ে তুললুম আর ওমা, রথ গড়গড়িয়ে চলল। হরি হরি বল, প্রভু দয়াময় হে।

'সার্কাস'

সেবাইত ভদ্রলোককে নমস্কার করে ভিড়ের অরণ্যে ঢুকে গেলাম। ইতিমধ্যে বন্দুকে ফায়ার হল। ঠং ঠং, ঢং ঢং বাজনা বাদ্য শুরু হল, টাকা পয়সা, আনি সিকির বর্ষণ শুরু হল, হৈ হৈ করে রথ চলল। মই-এর বেড়ার ভেতর পয়সা কুড়োনোর ধুম পড়ল। দুপাশ থেকে সাবধান সাবধান, চাপা পড়োনা, হুঁশ রেখে চলো। এই পয়সা জমা হবে কলসীর ভেতর, কলসী যাবে সেবাইতের ভাণ্ডারে। যে সেবাইত এবারের মেলা ডেকে নিয়েছেন, এ সব প্রাপ্য তাঁরই। ডাক প্রতি বছরই হয়, তবে ফ্যামিলির মধ্যে, এ ঘর, নয় ওঘর, এ পকেট নয়, সে পকেট, উঠোনের সীমানা ছেড়ে অদ্যাবধি তা অন্যত্র যায়নি।

আরেকজন বললেন, এই যে দেখছেন পথের দুধারে দোকানপাট, এর খাজনা তোলাও এই কদিনের মতো জগন্নাথের অধিকারে। আর এ অধিকার আজকের নয়, নবাব আলীবর্দীর দেওয়া। বৃটিশ সরকারও এ অধিকারে দাঁত বসাতে পারেনি। দেখলেন না, রথ যাবে বলে কতদূর থেকে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। পথের মোড়ে পুলিশ কনেস্টবল দাঁড়িয়ে। ট্রাফিক ঘুরিয়ে দিচ্ছে কেমন।

কিন্তু আমি তো রথই দেখতে আসিনি, রথ দেখলাম, লোক দেখলাম, এবার ইচ্ছে কলা বেচাটাও দেখি। সেই তালেই ফিরছিলাম। একজন বললেন, কী আর দেখবেন, মালপত্তর যা এসেছে অধিকাংশই প্লাস্টিকের। সেদিন আর নেই, কোথায় বা আপনার ভেঁপু বাঁশী, আর কোথায় বা সেই মাটির ঘোড়া, গরু, পুতুল, কাঠের বন্‌বন্‌ গাড়ী। ছেলেবয়সে দুতিন মাইল ঠেঙিয়ে রথের আড়ং-এ জুটতাম। ছোট ছোট গাড়ী এক একটা কিনে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতাম, চাকার উপর চরকী ঘুরত বন্‌বন্‌। সে তো চরকী নয়, আমাদের মনেরই খুশী। আর মশাই পাঁপর, আর ফলের মধ্যে লট্‌কা, সেই ছোট ছোট ফলগুলো, তিনটে করে আঁটি, কেমন অম্লমধুর। আর মশাই বেলুন, আর ঘুড়ি। আঃ! চোখ বুজে ভদ্রলোক ছেলে বয়েসটায় একবার উঁকি মেরে নিলেন।

মাহেশে এখন শুধু পাঁপর আর চিনেবাদাম, আর যা আছে চোখে পড়বার মতো নয়, বরং কলকাতা ভাল। বৌবাজারে যে মেলা জমে তেমনি আর কোথায়? কত গাছগাছালির চারা আর পাখী, আর বেতের, বাঁশের ঝুড়ি ডালা।

হঠাৎ শুনলাম হৈ হৈ। কি? মুহূর্তে লোক জড়ো হল, পুলিশ এল পালে পালে, কটাকে গ্রেফ্‌তার করে নিয়ে গেল, আবহাওয়া থমথম, রথ

আর চলবে না। কেন? কি হয়েছে? মিলমজুররা প্রতিবার রথের দড়ি টানে, বহুদিন ধরেই টেনে আসছে, তেমনি প্রতিবারই রথের দড়ি টানবার আগে মদ টেনে আসছে, সেও আজ অনেকদিন। 'রঙ চড়ালে দুনিয়া বাদী', ভাবখানা এই রকম। 'দুনিয়া কেয়া হ্যায়' বলে ওরা লুঠপাট শুরু করে দেন, প্রতি বছরই করেন, এবারও তাই করতে গিয়েছেন। আর ভলোণ্টিয়াররা এসে বাদ সাধলে। অ্যাসা নেহি হোগা। বাদ সাধতেই বেধে গেল। শেষটায় পুলিশ এসে ফয়শালা করলে, দুষ্কর্মের পাণ্ডাদের ধরে ঠাণ্ডা গারদে চালান করলে। অমনি স্ট্রাইক। ন্যায্য অধিকারে হাত দিয়েছ, লুঠ করবার হক আমাদের বহুদিনের, সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ! টানবনা রথ। ওরা রথ টানলে না, এবার রথ টানলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা, হৈ হৈ করে এগিয়ে গেল।

একটু এগিয়ে এসেছি মন্দিরের কাছ বরাবর। বেশ ভিড় এক মহিলাকে ঘিরে। বছর পঁচিশেক বয়েস। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কি ব্যাপার? সর্বস্ব চুরি গেছে। রথ দেখতে আসছিলেন। স্বপ্ন পেয়েছেন। থাকেন অনেক দূরে। ছেলেপুলে হয় না, অনেক প্রার্থনা করেছেন জগন্নাথের কাছে। শেষে প্রভু স্বপন দিলেন। মাহেশে যা, দড়িতে হাত ঠেকা, তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে। স্বামী বিদেশে, লোক পেলেন না তাই একাই আসছিলেন। স্টেশনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা, ভিড়ে টিকিট কাটতে পারছিলেন না, সে কেটে দিলে। বললে, সেও আসছে মাহেশে। কত আলাপ। হোটেলে নিয়ে খাওয়ালে। মাহেশে এসে মন্দিরে ঢুকল, সে বললে, দিদি, গহনাপত্র নিয়ে ঢুকো না। যে ভিড় ভরসা হয় না। আমার কাছে রেখে দর্শন করে এসো, একটু তাড়াতাড়ি এসো, তুমি এলে আমি যাব, আমাকে আবার পুজো দিতে হবে।

ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, ঘুণাক্ষরেও অবিশ্বাস করলাম না গো। আমার কি মরণ হল, সব্বশ্শো ওর হাতে সমর্পণ করে ভেতরে ঢুকলাম। দেবতার মন্দিরে এমন প্রবঞ্চনা, হা জগন্নাথ, তোমার চোখের উপর এত বড় রাহাজানি, তুমি সহ্য করলে! জগন্নাথ, বুঝলাম, সত্যিই তোমার হাত নেই। ভলোণ্টিয়াররা সান্ত্বনা দিতে লাগল, অমন উতলা হবেন না। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে দেখুন কি হয়।

সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসছি। দেখলাম ছোট্ট একটা ছেলেকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি বলছে, আমি কিছু করিনি, সত্যি কিছু করিনি, আমাকে ছেড়ে দাও। পুলিশটি ধমক দিয়ে বলছে, চোপ, এখনো বলছি, বল

তোর দলে বড় কে আছে, ছেড়ে দেবো নইলে তোকে জেলে দেবো। ছেলেটি হাউ হাউ করে কে'দে উঠল, কেউ নেই আমার সংগে, আমি একা আর বাড়ীতে মা আছে, তার বড় অসুখ, আমায় ছেড়ে দাও। চমকে উঠলাম। কি মনে হল পিছু পিছু থানায় এলাম। কনস্টেবল দারোগাকে বললে, বড়া বদমাস, বড়া হোকে ডাকু হোগা। দারোগা বললেন, কি, এ কে? কনস্টেবল বললে, পকেটমার। ছেলেটি বললে, না আমি পকেট মারিনি। আমি তো মালা বিক্রী করছিলাম। দারোগা জিগ্যেস করলেন, তোর বাড়ী কোথায়? গোঁদলপাড়া। নাম কি? বিজু। পকেট মেরেছিস? না না। তবে কি করছিলি? মালা বেচছিলাম। কোথায় মালা? ফেলে দিয়েছে। কে? বলতে পারল না। কিন্তু বুঝলাম। এগিয়ে গিয়ে বললাম, দারোগাবাবু, আমি জানি ও পকেটমার নয়, ওকে ছেড়ে দিন। অনেক বলে কয়ে ছাড়িয়ে আনলাম। জিগ্যেস করলাম, মালা আছে? চুপ করে রইল, তার পর বললে, পুলিশ ফেলে দিয়েছে। বললাম, আচ্ছা, বাড়ী যাও। যেতে পারবে? ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ। ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল, কি আশ্চর্য যোগাযোগ। মাহেশের মেলায় বঙ্কিমবাবুর রাধারাণী কি রূপ পাল্টিয়ে এল?

জয়দেবের মেলা

কেমন করে যে দেশটার 'কামকোটি' নামখানা খসে গেল, কারা এসে কবে যে 'বীরভূমি' এই সাইনবোর্ডখানা ঝুলিয়ে দিলে, সে তথ্য আমার কাছে দূর ঠিকানার। লায়েক ইতিহাসবেত্তারাও যে নিশানা নিরীখে সব্যসাচী এমত মনে হয় না। মহেশ্বরের কুলপঞ্জিকা এক লাইনেই সেরে দিয়েছে, 'কামকোটি বীরভূম জানিবে নির্য্যাস।' তা না হয় জানলাম। কিন্তু জানিলে মানিতে হবে, এমন কি কথা? গোটা বীরভূমের সরকারী দলিলদস্তাবেজে 'কামকোটি' নামটি গরহাজির কেন? থাকগে পণ্ডিতদের উনুনে খিচুড়ি চাপিয়ে হাঁড়ি অবধি ফাটাবার বাসনা আমার নেই। কাজে কাজেই ও পথ পরিত্যাজ্য।

আমার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে বীরভূম কামকোটি কিনা তাতে মতদ্বৈধ থাক্‌তে পারে, কিন্তু বীরভূম যে আদৌ বীরের ভূমি নয়, বৈরাগীর ভূমি সে বিষয়ে আমার মত একেবারে অদ্বৈত।

বীরভূমে পা যখনই ঠেকাই কেন জানিনে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দুটো গিয়ে ঠেক্ খায় আকাশে। যাতায়াতের পথে কোনো একদিন এই দেশটির ঢলঢলে কাঁচা মুখখানিতে উদয় অস্তের ফেরীদার সূর্যদেব আলগোছে এক সোহাগের চিহ্ন এঁকে সটকে পড়েছিলেন। সেই প্রণয় চিহ্নই বোধ করি ঝলসানো বীরভূমের সর্ব-অঙ্গে মাখা। টানের দেশ, প্রায়-নেই-জল বললেই হয়। তবে বীরভূম মাটির সরসতার অভাবের কড়া-ক্রান্তি উশুল দিয়েছে লোকের মনে রসের দেদার জোগান দিয়ে। দেশটা বেশভূষার বাহার ছেড়েছে। যোগিনীর গেরুয়া তুলে গায়ে দিয়েছে আর মানুষগুলোকেও পরিয়েছে আলখাল্লা, নিজের ধুলোয় রঙদার করে। এদের দেশে রঙ, এদের বেশে রঙ, এদের মনে রঙ, রঙে রঙে রংছুট। গেরুয়া পাগলিনীর রঙ। প্রেমিকও পাগল। প্রেমের স্বভাব বোঝা দায়। তাই সোজা লোকও বাঁকা হয়ে যায়।

প্রেম কথাটি শুনতে ভালো
প্রেমের স্বভাব বাঁকা গরলমাখা
প্রেম ভেবে ভেবে অঙ্গ কালো॥
যদি প্রেম সাধ চাও আচারিতে
কুলসাধ রেখনা চিতে

'সার্কাস'

মিঠে বলে এঁঠো খেলাম
পেট ভরল না জাতও গেল॥
নিশিযোগে দীপভাসে
আনন্দ গুণ গায় সকলে॥
মেওয়া খেতেও নারে যেতেও নারে
উত্তমারে সেইদিনের দিন কেমনে ঠেলো॥

যে মেওয়া গলায় তুলেও গেলা যায় না, গলা থেকে ফেলাও যায় না তাই প্রেমমেওয়া। এই প্রেম পেতে চাও তো কুল ছাড়। গরঠিকানা হও। পাগল বনো। পাগলদের আবার ঠিক ঠিকানা কি? সাকিন মোকাম কোথায়? তাই এরা সবাই বেঠিক, সবাই বেভুল, এরাই বাউল। বিচিত্র আচার এদের, সচিত্র আকার।

বাউলের সংগে পড়ে, ঘুরে ঘুরে ভবের মাঝে ভেবে মরি
দেখে এদের রংগভংগ জবলে অংগ কিছুই ব্যাপার বুঝতে নারি॥
একতারা আছে ধরে, হস্ত নাড়ে, এই বুঝি ওর হাতে খড়ি।
জানেনা এসব তত্ত্ব মদে মত্ত, করে বেড়ায় ছলচাতুরী।
বাঁয়া বাজাচ্ছে যেটা, ঐ বেটা ভুলেও ভাবেনা হরি॥
তালে তো দেয়না রে তালে, বড় বেতাল তালবেতালে বাজায় জুড়ি॥
গুপিযন্ত্র যে ধরে ঝিমিয়ে পড়ে মৌতাত লেগেছে ভারি।
খঞ্জনি বাজায় যে জন বুঝি সে জন দম দিয়েছে আহা মরি॥
দেখি তোর একী বেহাল, যেন ইন্দ্রজাল দীর্ঘ ফোঁটার কারিকুরী।
গলাতে কণ্ঠি পরে, মাথা নেড়ে গাচ্ছে সবে আহা মরি॥
আনন্দলহরী করে, আনন্দভরে, নৃত্য করে বলে হরি।
নয়নে চিনে নেনা, করে সোনা সে ধন হরি নামের তরী॥

বাউলের রূপ বর্ণনা ওদের কথাতেই দিলাম। বাউলদের সম্পর্কে আগ্রহ ছিল। শুনেছিলাম মকর সংক্রান্তিতে বাউলদের এক মেলা বসে জয়দেব-কেন্দুলীতে। কেন্দুলী হচ্ছে বীরভূম জেলায়। পোষাকী নাম কেন্দুবিল্ব। 'পদ্মাবতী চরণ-চারণ চক্রবর্তী' কবি জয়দেবের খাস মোকাম। দুটোর সমাসে নাম পত্তন নতুন করে দাঁড়িয়েছে এসে জয়দেব-কেন্দুলীতে। জয়দেব যাবার বাসনা হল। সে বাসনা তাতিয়ে তুললেন দুই গুণীজন। রাজেশ্বর মিত্র এবং অহিভূষণ মালিক। একজন যদি সুরকার তো অন্যজন তুলিকা-সার। আর গুণ বোঝাই

'সার্কাস'

এই দুই ওয়াগনের মধ্যে 'বাফার'-রূপী সাংখ্যের নির্গুণ পুরুষকারের এক জ্যান্ত এক্সাম্পল স্বয়ং আমি।

পথ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলাম না। পানাগড় থেকেই মেলার কদিন বাস চলে। বর্ধমান আর অণ্ডাল থেকেও সিধা মেলার বাস ছাড়ে। সুলুক সন্ধান জানা ছিল না। অণ্ডালে নেমে ট্রেন বদলিয়ে উখরা স্টেশন থেকে বাস ধরলাম। নামলাম অজয় নদের এপারে। ওপারে জয়দেব। এপারে গ্রাম ওপারে গ্রাম মধ্যখানে চর।

ইস্কুলে যখন পড়তাম এ তখনকার গল্প। ভূগোলের মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'নদ কাহাকে বলে।' একটি ছেলে জবাব দিয়েছিল, 'আজ্ঞে নদীর মতো যাকে দেখতে অথচ নদী নয়, যাহার মধ্যে জলের বদলে থাকে শুধু বালু, তাহাকে।' সেদিন হেসেছিলাম। আজ নদ দেখে বুঝলাম আমার আগাম হাসিটা তার ঠোঁটে গিয়েই উঠেছে। অজয় নামেই নদ। জল বওয়া যেন মহা অপমানের কাজ। কেউ দেখে ফেললেই 'প্রেস্টিজ নট্' হয়ে যাবে। তাই ছিটেফোঁটা জল বালুর পোষাকের নিচে লুকিয়ে রাখবার জন্য সদা সচেষ্ট। মাইল প্রমাণ বালুর বিছানা মাড়িয়ে আমরাও জয়দেবে উঠলাম আর ডিউটি-খতম দেব দিনমণি রাত্রির জিম্মায় আমাদের গছিয়ে দিয়ে ঘরমুখো লম্বা দিলেন।

কোথায় উঠব, কোথায় থাকব কিছু ঠিক ছিল না। পথে শুনলাম, ভয়ভাবনার কিছু নাই। থাকবার স্থানের অভাব নাই। দু তিনতলা বাড়ি আছে। উকিল ব্যারিস্টার, কত বড় বড় বাবুরা এসে থাকেন। ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে। এসে দেখি, হরি হরি কোথায় দোতলা তিনতলা বাড়ি। একটা বড় কোঠা বাড়ি আছে অবশ্যি, কিন্তু তা গদীর মোহান্তের দখলে। অন্যান্য আস্তানা ভাড়া হয়ে গেছে। কলিকাতার এক ভদ্রলোক সপরিবারে গিয়েছিলেন। একটা মাঠকোঠার দুটো কামরা নিয়েছেন, ভাড়া ষাট টাকা। বাউল বোষ্টমদের কয়েকটা স্থায়ী আখড়া আছে। কাঙাল ক্ষ্যাপার আখড়ায় যেতেই স্থান মিলে গেল। ঘরের ভেতর বসেছিলেন এক বাউল। একগাল হেসে বললেন, জয়া ক্ষ্যাপার মেলায় এসেছেন, ভয়ভাবনা দূরীভূত করুন। মনের ভেতর আসন পাতুন আনন্দের।

বাউল আনন্দেরই জীবিতরূপ। বাউলতত্ত্ব বড় চমৎকার। আনন্দই কেবল। আনন্দ ধ্যান, আনন্দ জ্ঞান, আনন্দ শুধু সার। আনন্দ বন্যায় রসের তরীখানা শুধু পারাপার করছে। এই পাথার পারাবারের লক্ষ্যের পারে আছে বাউল তার নৃত্য নিয়ে গীত নিয়ে। আর অন্য যে পার সেই অলক্ষ্যে আছেন এক অলখ-রসিক। নানা কর্মে একেবারে চৌকস।

'সার্কাস'

মানব জন্ম রে ভাই তাঁতির তাঁত বোনা।
ভবের মাঝে মানব তাঁতে বুনছে কাপড় একজনা॥
(হরি বলে)
ও ভাই মানব জাতির চোদ্দ পোয়া মাপ
নানা বর্ণের সুতো তাঁতে উঠছে পড়ছে ছাপ
টেরিকাটায় টেনে ধরে পাপ
ও বাপ বিষনলী দিচ্ছে জোগান (হায় হায় রে)
বাঁটি নেয় তা ছয়জনা॥
আপনারে যে জড়ায়ে সুতো
আবার টানা গেঁথে নানা মারছে রে গুঁতো
দিনে দিনে গুণছে মনমতো
জীব কর্মসূত্রে মাকুর মতো
ওরে করতেছে আনাগোনা॥
ওই তাঁতি আছে তাঁতসালে বসে
তক্তি দাক্তি লাজনি করে বেঁধে মায়াপাশে
ওরে টেপার নলী টিপছে সাহসে
ও রামচরণ বলে তাঁতি মলে
তখন এ তাঁত চলবে না॥

এই মানব জন্মের মধ্যেই নানা রঙ্গ আছে। প্রতিটি কর্মই রঙ্গঠাসা। এই রঙ্গেরই রং অঙ্গে মাখো। আর তামাসা-রসে হাবুডুবু খাও। যতদিন দেহ ধরো ততদিন আনন্দ করো। দেহ-তাঁতি ফৌত হলে মৌতাত আর জমবে না। এই তত্ত্বই বোধ করি দেহতত্ত্ব।

ঘুরছিলাম ফিরছিলাম, এই আনন্দের তুফান গায়ে লাগাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম জয়া ক্ষ্যাপার কথা। আঁকিয়ে বন্ধুটি খাতা পেন্সিল নিয়ে বাউল-দঙ্গলে জাঁকিয়ে বসেছেন বাউলের ভাবরূপের ছাপ তুলবেন। বিদগ্ধ বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁ মশাই, জয়দেব-সংবাদ কি বলুন তো? এই ক্ষ্যাপার আসর এখানে কেন? বন্ধুটি জবাব দিলেন, বড় গোলমেলে ব্যাপার, সঠিক আর আমি কি বলব বলুন। এ বিষয়ে বিশজন মুনির অন্তত এক কুড়ি মত। কেউ বলেন, জয়দেব মিথিলা ফেরৎ। বিদ্যাশিক্ষাটি ওখানেই করেছেন। কেউ বলেন, তিনি এখানেই সিদ্ধাই লাভ করেন। আবার কোথাও পাই তাঁকে মহারাজ লক্ষণসেনের সভাকবি রূপে। পুরীরাজসভার হাজরে খাতায় তাঁর নাম প্রেজেন্ট আছে দেখি।

'সার্কাস'

বৌদ্ধ সাধন পদ্ধতি উত্তরকালে নানা খণ্ডিতভাবে ইতরজনের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। তন্ত্র ও সহজযান সাধনতত্ত্বই রাঢ় দেশে বিশেষ করে জনসাধারণের আচরণীয় হয়ে ওঠে। সহজিয়াভাবের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের একটা কোর্টশিপও তৎকালে হয়। আর তা শেষ পর্যন্ত গাঁটছড়াও বাঁধে। এই বৈষ্ণব সহজিয়াদের প্রধান হলেন নয়জন রসিক। কেন জানিনে জয়দেবও কেমন করে এই নবরসিকদের একজন, শুধু একজন নয় আদিজন বলে কল্কে পেয়ে এসেছেন। সহজিয়ামার্গে আর বাউল সাধনায় মিল অমিল প্রচুর আছে। কিন্তু বর্ডার লাইনে আগল তোলা নেই। এক পা এ ধারে এক পা ও ধারে দিয়েও দিব্য থাকা যায়। এই মেলায় যাঁরা জমায়েত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দু একজন ছাড়া বেশীর ভাগই দু দিকে পা দেওয়া।

ওদের মধ্যে ঘুরছিলাম, হেথা হোথা বসছিলাম, গান শুনছিলাম আর টুকটাক জিজ্ঞাসা করছিলাম। প্রকাণ্ড বটগাছের নিচে বাউলদের জমায়েত। নানা স্থান থেকে এসে হাজির হয়েছে। সুদূর ময়মনসিংহ আর এদিকে মানভূম, পাল্লা বড় কম নয়। তবু পথের পাড়ি জমাতে ঠিকে ভুল হয়নি কারো।

কলকাতার চিড়িয়াখানায় একটা ঝিল আছে। শীতকালে উড়ে-আসা পাখীতে সেটা ভরে টইটম্বুর। কোথাকার পাখী না আসে? মানস সরোবর আর সাইবেরিয়া, কত দিক দিক থেকে এসে জড়ো হয়। যতক্ষণ দেশে থাকে, ততক্ষণ কোন দলটা বা সাইবেরিয়ার, কোনটা বা মানস সরোবরের আর কোনটা বা গড়ুইন অস্টেনের ওপারের। ঝিলে এসেই মিলে মিশে একাকার, জাতবিচারে তালা ঝোলে। এদের মধ্যেও সেই একই ব্যাপার। যতদিন গেরস্থ ছিলে ততদিনই [illegible] তাঁতি কি জোলা। কিন্তু যেদিন থেকে আলখাল্লাটি সার করে কাঁথার ঝোলা কাঁধে তুলেছ, যেদিন ঘরের বার হয়েছ সেদিন থেকে তুমি শুধু বাউল। কামার কি কুমোর, নাপিত কি তাঁতি, হিন্দু কি মহম্মদী—তোমার সব লেবেল ঘুচে গেছে। এবার মন থেকে ঘরের চিন্তা ছাড়। ঘরের বাইরে মনকে আনলেই চলবে না, মনের ঘরে গিয়ে ঢুকতে হবে। বাইরে ঘোরাঘুরি কিসের জন্যে? রহস্য রস সবই তো ভেতরে।

ঘরে গেলে নারে মনা, বাইরে ঘোরালে
ঘরে গিয়ে দেখলি নারে মন পাগলা
একতালা খুলিয়া দেখ খোলা আছে নয়তালা।
তালায় তালায় ফুল ফুটেছে
ভ্রমর বেড়ায় মধুর লোভে

জোয়ারে সে ফুল ভেসে যায় গঙ্গা যমুনায়
চব্বিশে এক ছনের ছানি
নিয়লে বেঁধেছে বেণী
দশনম্বরে তার জুত গাঁথুনি তিন তারে টানা
ষোড়শ তালার উপরেতে হংসের বাসা
চারযুগে এক ডিম পাইড়াছে, ডিমেতে কুসুম কাঁচা
মধ্যম গেহ কদমতলা সদাই করে নৃত্যলীলা
দ্বিজদাস কয় ওরে পাগলা চেয়ে দেখলি না॥

সত্যি বলতে কি, আমাদের অবস্থা একটু শোচনীয় হয়েই দাঁড়িয়েছিল। আমরা পাকা জহুরী নই যে হাঁ দেখেই আসল নকল চিনে নেব। আমাদের কাছে সব 'ভুটানীরই ভোঁতা নাক, আসামী করবো কাকে' গোছ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তবে আবার একটা গল্প বলি, শুনুন। একদিন কথা হচ্ছিল, বোঁচা নাক ভুটানীদের সকলেরই এক রকম চেহারা, চেনা বড় মুশকিল। এক বন্ধু বললেন, তা হলে ওরা নিজেদের চেনে কি করে? ভিন্ন করার চিহ্ন একটা কিছু আছে।

সেই চিহ্নই আমরা খুঁজছিলাম। কিন্তু কেশের বাহার বেশের বাহার সকলেরই তো এক। লম্বা চুল, লম্বা দাড়ি। তাই এ পথে একদম আনাড়ি আমরা আর বাছবিচার করলাম না। একধার থেকে বাউলসঙ্গ করতে শুরু করলাম। যেখানে বাউল দেখি সেখানেই বসে পড়ি। কাঁচ হও কি কাঞ্চন হও আমার কি আসে যায়। কিছু গান শোনাও, ভাল যদি লাগে দুদণ্ড বসব। মওকা পেলে সঙ্গে করে নিয়ে যাব দু একখানা।

একপাশে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ বাউল। এক হাতে গোপীযন্ত্র আর অন্য হাতে ডুগি। গান শুনতে চাইলাম, কথা না বলে ডুগিতে তাল দিতে দিতে গান ধরলেন।

তাল খেয়ে তাল ঠাণ্ডা করো আমার মন
ঐ তালে জুড়ায় রে জীবন
তাল বাল্যকালে ভক্ষণ করে শিশুগণ।
ওরে কচি তাল খেতে ভাল অতি মিষ্ট তাহার জল
বাটির ভেতর হয় তরল অতিশয় পক্কতা হলে হয় কঠিন
তালের গুণ বলতে নারি তালের রসে নেশা ভারী
মেহরোগের উপকারী সকলেতে কয় বচন।

আবালবৃদ্ধ পুরুষ নারী চিবিয়ে খায় ছোবড়া মাড়ি
আঁটি রাখে যতন করি শাঁসটি খেতে যাদের মন।
ভাই দেখ তালের ডোঙ্গায় জলপথে হয় চলাচল
ওরে গড়ল ডোঙা চিতমাঝারে বুঝে নেরে কথার ঘেরে।
নীলকণ্ঠের এই বাণী তাল খেয়ে বেতালে গেলি
(ওরে) দেখবি যদি বনমালী তালবনে কর গমন॥

বীরভূম বৈরাগীর দেশ, ক্ষ্যাপাক্ষেপীর আস্তানা। একা কি জয়া ক্ষ্যাপা? বিল্বমঙ্গল নেই? কেন্দুলীর থেকে কুল্লে এক মাইল হবে কিনা সন্দেহ বিল্বমঙ্গলের সিদ্ধপীঠ। নান্নুর কোথায়? সেও তো এই বীরভূমেই। চন্ডীদাস ক্ষ্যাপার আপন আখড়া সেখানে। এখানে, এই বীরভূমের ক্ষ্যাপাক্ষেপীর ছড়াছড়ি। জয়দেব মেলাতে ক্ষ্যাপাক্ষেপীরই প্রাধান্য।

মেলাটার দুটোভাগ। একটা পণ্যের, অন্যটা পুণ্যের। পণ্যের দিকটা সচরাচর-দৃষ্ট। মাইলখানেক জায়গা ব্যাপী দোকান। পরিচিত পসরা সাজানো। খাবারের দোকান সুপ্রচুর। মনোহারী, বেলোয়ারী—সব বাইরে থেকে আমদানী। স্থানীয় শিল্প সবই কাঠ আর লোহার। হলের কাঠ, দরজার কাঠামো। এর মধ্যে চমক খেলাম, পাল্কীর ঠাট দেখে। যাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাসিন্দা বলে জানি তাকে হঠাৎ জ্যান্ত ঘুরে বেড়াতে দেখলে যে অনুভূতি জাগে, পাল্কী বিক্রি হতে দেখে ঠিক তার সহোদর অনুভূতি নাও যদি টের পেয়ে থাকি, তো যেটা সেদিন অনুভব করলাম সেটা যে ওরই মাসতুতো পিসতুতো তাতে আর ভুল নেই।

পণ্য আর পুণ্যের এই খিচুড়ীশালার রসুইকারটি নিশ্চয়ই কাঁচা। আসিদ্ধ খিচুড়ী থেকে সহজে আলাদা-করা চাল ডালের মতো দুটো দিক মিশ খায় নি।

মকরসংক্রান্তির ভোরে স্নান-যোগ। এই দিন এইখানে অজয় নদে স্নান করলে গঙ্গা স্নানের ফল লাভ হয়। কারণ কি? না সেই দিন এইখানে গঙ্গার আবির্ভাব ঘটে। কেন?

জয়দেব কেন্দুলী থেকে রোজ কুড়ি বাইশ ক্রোশ দূরে কাটোয়ায় যেতেন গঙ্গা স্নান করতে। তখন তিনি পুঁথি লিখছেন—গীত-গোবিন্দম্। কৃষ্ণ আগের রাত্রে রাধিকার কুঞ্জে আসেন নি। রাধিকা ভেবেছেন অন্য কোথাও তিনি রাত্রি যাপন করেছেন তাই অভিমানে তাঁর গাত্রদাহ। এ দুর্জয় অভিমান ভাঙতে কৃষ্ণ রাধিকার পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবেন। কিন্তু ইষ্টকে অত হীন করতে ভক্তের মন চাইছে না। শ্লোক অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। পাদপূরণ করবেন কি করে?

'সার্কাস'

জয়দেব অতিক্লেশে স্নান করতে চলেছেন কাটোয়ার ঘাটে। ভক্তবৎসল ভক্তের এই কষ্ট আর সহ্য করতে পারলেন না। জয়দেবের রূপ ধরে ফিরে এলেন। অসময়ে স্বামীকে ফিরতে দেখে পদ্মাবতী বিস্মিত। প্রভু একী! প্রভু বললেন, শ্লোকের পাদপূরণ হয়নি, শ্লোকটা মনে পড়তেই ফিরে এলাম। তুমি ভোজনের আয়োজন কর। ভোজনান্তে প্রভু ভেতরে শয়নে গেলেন। স্বামীর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পদ্মাবতী সবেমাত্র মুখে তুলেছেন, এমন সময় স্নাত জয়দেব আগমন করলেন। একী পদ্মাবতী, একী আচরণ তোমার! আমি অভুক্ত আর তুমি খেয়ে চলেছ। পদ্মাবতী হতভম্ব। বললেন, রহস্যটা বোধগম্য হচ্ছে না। আপনি ফিরে এলেন, পাদপূরণ করলেন, ভোজন করলেন, শয়নে গেলেন। আমি তাই প্রসাদ পেতে বসেছি। জয়দেব তুতোধিক বিস্মিত, চমৎকৃত। পাদপূরণ করেছি! ছুটে চললেন ঘরে। পুঁথি খুলে দেখেন কি আশ্চর্য। দেহিপদপল্লবমুদারম্। যে পদটি তার মনে মনে ছিল, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছিলেন না, রাধিকারমণ সেটি নিজ হাতে পূরণ করে দিয়ে গেছেন। স্বেচ্ছায় প্রসাদ পেয়ে গেছেন। ছুটে গিয়ে পদ্মাবতীর উচ্ছিষ্ট খেতে বসলেন। পদ্মাবতী বাধা দিতে গেলেন, জয়দেব বললেন, পদ্মা, তুমি অতুল ভাগ্যবতী, তোমার উচ্ছিষ্ট কি, এ-পাতে যদি কুকুরের উচ্ছিষ্ট থাকত তো তাও আমি খেতাম।

যেখানে স্বয়ং নারায়ণ হাজির হতে পারেন, সেখানে গংগা আসবেন, এ আর বেশী কথা কি? গংগা বললেন, বাছা তোমাকে আর কষ্ট করে আমার কাছে যেতে হবে না, আমিই তোমার কাছে আসব। তাই গংগা মকরসংক্রান্তির যোগে উজান বেয়ে আসেন। তাই তিন দিনব্যাপী এখানে অন্ন বিতরণ হয়। সমপংক্তিতে বসে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল অন্ন গ্রহণ করেন আর চীৎকার করে জানান, সাধু সাবধান, ফের করি অবধান। একজনের সাবধানবাণী সবাই মিলে প্রাপ্তি স্বীকার করেন, সমস্বরে বলে ওঠেন হাঁ—আ—আ।

অনেকেই বললেন, এ আর কি দেখছেন, এতো কিছুই নয়। আগে যা হত। আগে কি হত তা জানবার সুযোগ আমার ঘটেনি। যা দেখলাম তাতেই আমি তৃপ্ত। এই তৃপ্তির ভাব সংগী দুজনের মুখেও লক্ষ্য করলাম।

ফেরবার পথে একজন শুধু বললেন, এলাম বীরভূমে, কিন্তু না দেখলাম একটা বীর, না পেলাম একটুকরো বীরখণ্ড। আফসোস শুধু ওইটুকুই।

রাসের নবদ্বীপ

শুধু এক শ্রীরাধিকা নন, তাবৎ গোপাঙ্গনাগণের মনোরঞ্জনের জন্যই প্রয়োজন হয়েছিল রাস উৎসবের। বৃন্দাবনের কানু প্রেমের যে এজলাসের গোড়াপত্তন করেছিলেন, যুগে যুগে ভক্তগণের দৌলতে সে রাসোৎসবের রাশ অদ্যাপি ঢিলে হয়নি।

শ্রীচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে বিদিত। আর শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যের খাসতালুক। কিন্তু আশ্চর্যের কথা নবদ্বীপের যে রাস উৎসব তার সম্পূর্ণটাই শক্তির উৎসব। বৈষ্ণবীভাবের টিকিও দৃষ্ট হয় না।

জগাইমাধাই ছিলেন শাক্তসমাজের মুখপাত্র। কলসীর কানার আঘাতে প্রভু নিত্যানন্দের রক্তপাত ঘটিয়ে যে বন্যা তারা রোধ করতে চেয়েছিলেন, একদিন তারই স্রোতে এ'রা ভেসে গিয়েছিলেন। বৈষ্ণবীয় ভাবের পাথারে ডুবুডুবু শাক্ত সংস্কৃতি আপাত পশ্চাদপসরণ করে কালের শেলেটে ঢ্যাঁরা কাটতে লাগল। নবদ্বীপে আর শক্তি অভ্যুত্থান হয়নি। তেমনি বৈষ্ণবীভাবও নবদ্বীপের মজ্জায় ঢুকতে পারেনি। তাই নবদ্বীপের গেঞ্জিতে শাক্ত-সেণ্টই মাখানো; তবে উড়নীতে হরের্নামৈবকেবলম্। গঙ্গার ওপার থেকে যেমন সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-মৃদঙ্গ বাদ্য শুনে নবদ্বীপের গোটাটাকেই ঠাকুরবাড়ী বলে ভ্রম হয়, তেমনি বিদেশ থেকেও। আসলে আছে নবদ্বীপচন্দ্রের নামটাই, ধামটি বরাবরই বেহাত।

তাই নবদ্বীপ শাক্তভিতেই পোক্ত। আর রাসপূর্ণিমা তারই 'এনি-ভার্সারী সেলিব্রেসন।'

সম্বচ্ছরে নবদ্বীপও যা, অন্যান্য পাঁচটা মফঃস্বল শহরও তাই। নির্জীব জীবনযাত্রা। ক্ষীণ জীবন আর হীন জীবিকা দেখে বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই, এই অতি সাধারণ দেহগুলি কোন একদিন আবার চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে। উদ্দামতায়, উন্মাদনায়, চাঞ্চল্যে টগবগ, রঙ্গে রঙ্গে ডগমগ যে হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। এই একটি দিন এরা দাসের প্রবৃত্তি ঝেড়ে ফেলে প্রবৃত্তির দাস বনে।

শীতের প্রথম আভাষ, চাঁদের পূর্ণ আলো, শানাই-এর চাঞ্চল্য সুজনী সুর,

ঢোলকের উন্মাদনাময় সঙ্গত, সব মিলে একটা নতুন মানে এসে যায় জীবনে, আর সে শুধু এই একটি দিনের জন্যই। দ্বাপরের বৃন্দাবনের সেই রাতের সঙ্গে হেথাকার একটি বড় মিল চোখে পড়ে, বাঁশী শুনে ঘর ছাড়বার আকুলতা। বদল হয়েছে অনেক কিছুর। মুরলীর বদলে সানাই, যমুনা-তটের বদলে খোয়া বাঁধানো রাস্তা। গোপবালাদের বদলে নৃত্য করে গোঁফওয়ালারা। কিন্তু আকুলতা-টুকু ঠিক আছে। তেমনি আদিম, তেমনি অবিকৃত। এক বংশীধারীর পরিবর্তে এখানে শত সানাইদার। "রাধা রাধা রাধা"র বদলে "বলি মাগো সুরধনী, কাতরে তোমারে ভণি, কেন মাগো বহাও নাকো সুরা।" খেমটা আর পিলু বারোয়াঁর সস্তা সুর ও চটকদার সঙ্গতের সঙ্গে কোমর বেঁকিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে নাচ। চৌদ্দ থেকে চল্লিশ, চব্বিশ থেকে চৌষট্টি বছরের ভেদ নিমেষে লুপ্ত, বাছবিচারের বাধোবাধো ভাবটুকু ভাঁজ করে তৎক্ষণে পকেটে চলে গেছে। উচ্চ নীচ, ভদ্রজন আর জনগণ এমন মাইডিয়ারী মিলাজুলা আর কোথায় পাওয়া যাবে? এই রাসপূর্ণিমার রাতটুকু ছাড়া নবদ্বীপেই কি আর কোনো দিন তার দেখা মেলে?

এর সবটাই যে শোভন, সুন্দর, শালীনতানুরস্ত তা নয়, তবু জীবন্ত। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেহারা বদলাতে থাকে। বেলেল্লাপনা বাড়তে থাকে, খিস্তিখেউড় শিকল খুলে বেরিয়ে আসে। বাকী রাতটুকু এদেরই রাজত্ব। রোজকার ওজনকরা রুচি আর ভদ্রজ্ঞানের সামনে নোটিশখানা ঝুলতে থাকে 'আউট অব বাউন্ড'। সুন্দর তখন মদের বোতলে, শিব উলঙ্গিনীর পদতলে। সত্য শুধু জেগে এই ঘোর লাগা মানুষদের অন্তরে। জগৎকে জানিয়ে দাও উদ্দাম হয়ে বাঁচা যায়। বাঁধন ছিঁড়ে নাচা যায়।

একটা দুটো নয়, প্রায় শ'খানেক, যত রাস্তায় যতগুলো মোড়, ততগুলো প্রতিমা। তার মধ্যে পার্থসারথি, হরিহর আর কৃষ্ণকালী ছাড়া সব "ক"ই "কালী" হয়েছেন। প্রধান যে কালী, তিনি ভদ্রকালী। তিনি ভদ্র তাই বোধ হয় সারা অঙ্গে কালোর লেশমাত্র নেই। দিব্যি ফর্সা, টকটক কচ্ছে রং, বিরাট উঁচু (এখন হাত আঠারো। আগে হাত চব্বিশেক হতেন। ইলেকট্রিক হবার পর থেকে তারে ঠেকে যাবার আশঙ্কায় হাতচারেক কমেছেন) দশাসই চেহারা। দিব্যি কাঠামোর উপরে জাঁকিয়ে বসেছেন। নীচে এক বিরাট হনুমান আসন-সুদ্ধ গোটা প্রতিমাই মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছেন। দুই কাঁধে ফাউ হিসেবে রামলক্ষ্মণ দুভাইকে চাপিয়ে রেখেছেন। দেবী ভদ্রকালী সিংহবাহিনী।

'সার্কাস'

বিরাট বর্শা অসুরের বুকে বসিয়ে মিটিমিটি হাসছেন, যেন সুড়সুড়ি দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, কিরে, আর দুষ্টুমি করবি?

নবদ্বীপের রাস উৎসবে কেন জানিনে দেবীর এই রূপটিরই প্রাধান্য বেশী। খাঁটি ভদ্রকালীই অনেকগুলো আছে। আর রকমফের ধরলে প্রায় দশ আনাই তো এই মূর্তি। ভদ্রকালীর মধ্যে সেরা হচ্ছেন চারিচারাপাড়ার। প্রোসেশনের দিন পথে বেরুলে এঁকে দেখেই চোখ ট্যারা হয়ে যাবার উপক্রম। খুব পোক্ত চাকার উপর বসিয়ে ধীরে ধীরে তোয়াজ করে করে এঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। সারাক্ষণ সামাল সামাল। রাজপথের ইজ্জৎ সেদিন একদম ঢিলে ঢলঢলে হয়ে যায়। চওড়া রাস্তার এপাশ ওপাশ জুড়ে শ্রীমতী ভদ্রকালী আহ্লাদী মেয়ের মতো গজেন্দ্রগামিনী হন এবং মাঝে মাঝে বিগড়ে গিয়ে ভক্ত অভক্ত সবাইকে বিলক্ষণ বিপদে ফেলেন।

কল্পনা করুন, ভাসানের দিন প্রত্যেকটি প্রতিমা সারবন্দী হয়ে পাড়া ঘুরতে বেরিয়েছেন। রাস্তায় যতগুলো পাথরকুচি প্রায় ততগুলোই লোক। তার মধ্যে রাস্তা জুড়ে বের হলেন ভদ্রকালী। ধীরে ধীরে এক মিনিটের পথ এক ঘণ্টায় অতিবাহিত করতে করতে চলেছেন। হঠাৎ হৈ হৈ। কী ব্যাপার? ভদ্রকালীর ধুড়ো ভেঙেছে। ব্যস্, সব কাজের আঁটি পোঁতা হয়ে গেল। আবার ধুড়ো বদলাও, চাকা লাগাও, ঘণ্টা দেড়েকের মতো একেবারে নিশ্চিন্ত।

ভদ্রকালী ছাড়া এই ফ্যামিলীর মধ্যে গণ্যমান্য হচ্ছেন আমড়াতলার মহিষমর্দিনী, জোড়াবাঘ গৌরাঙ্গিনী, বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি।

এর পরেই আসেন শ্যামা পরিবার। একেবারে ট্র্যাডিশন্যাল কালী। করালবদনী, লোলজিহ্বা, বিকটদর্শনা, উলঙ্গিনী, আলশথালশ কেশপাশ, পদতলে শয়ান শান্ত শিব। সবচেয়ে বড় তেঘরিপাড়ার শ্যামা। আকাশে উঠতে পারে না, তাই উন্মার্গগামী হবার শখ মেটাতে কারিগর এই শ্যামা মূর্তি গড়ে। ভদ্রকালীর মাথা ছাড়িয়ে ভেংচি কাটবার চেষ্টা করতে গিয়ে আশেপাশের কথা আর চিন্তা করবার ফুরসৎ হয়নি। তাই ভদ্রমহিলা শুধু মাথাতেই বেড়ে গেছেন। শ্যামারও আবার বর্ণফের, নামফের আছে। নৃত্যকালীর রঙের সঙ্গে এড়ো-কালীর বর্ণভেদ নজরে পড়ে। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণের পাশাপাশি ধূসর বর্ণের, শ্যামবর্ণের কালীও উঁকিঝুঁকি মারেন।

এঁদের মধ্যেই আবার বিশিষ্টা হচ্ছেন শবশিবা। শবের উপরে শায়িত শিব। শিবের উপরে উপবিষ্টা শ্যামার গঠন-বৈশিষ্ট্য সহজেই নজরকে টানে।

'সার্কাস'

কৃষ্ণকালীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। গণেশজননী, কাত্যায়নী, অন্নপূর্ণা আর কমলেকামিনী দেবীরাও আছেন।

এদের সকলের সঙ্গে স্পষ্ট তফাৎ চোখে পড়ে গঙ্গার। মকরবাহিনী গঙ্গা, একপাশে শিব, অন্যদিকে নারায়ণ। সম্মুখে শাঁখে-ফুঁ ভগীরথ।

পার্থসারথি অবশ্য নির্ভেজাল কৃষ্ণপুজো। হরিহরের অর্ধেক শ্রীকৃষ্ণ অর্ধেক শিব।

রাসপূর্ণিমার দিনের বেলাতেই পুজো সমাপ্ত হয়ে যায়। সন্ধ্যার সময় থেকেই rush শুরু হয়। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে রাশ-আলগা উদ্দামতা আসর বিছাতে শুরু করে। ঢোল সানাই-এর সঙ্গে গান শুরু হতে থাকে। "গোলাপ, তোর বুকে যে কাঁটা আছে, তাতো আমি জানি, তা বলে কি তোমায় ছোঁব না।" কিম্বা "তোমায় তো দিয়েছি সখি, দিয়েছি তো আমার সবি, তবু কেন প্রাণে মার ঘুরিয়ে তোমার নাকের ছবি।" সদ্য রং ধরে ওঠা ভদ্র মুখে কিছু উদ্ভট গানও শোনা যায়, "একটা এঁড়ে গরু দুধ দেয় দশ সের, এক টানে কি দুই টানে হায়।" সানাইদার বাজিয়ে চলে। রঙের উপর রঙ চড়ে। মুখের বাঁধন ঢিলে হয়ে আসে। হৈচৈ বাজনার কটা দল এগিয়ে আসে। হা রা রা রা রা। "এই গিজিঘিনাতো বাজাও।" ডগর কাড়া ঢোল ঢাক উদ্দাম বেজে ওঠে। লাফঝাঁপ শুরু হয় প্রচণ্ডভাবে। "এই চুপ। গান ধর, গান ধর।" টলতে টলতে একজন এগিয়ে আসে। ঢোলের উপর হাত রেখে দাঁড়ায়, বাকীরা ঝুঁকিয়ে থাকে। "এই সানাই বাজা—ও। মাথা খাও ঠাকুরজামাই কাল সক'লে বাড়ি যেও। আজকে যদি থাক রেতে—" অমনি হৈ হৈ করে বাধা দেয় কজনে। এই খবরদার। নো খিস্তি। ভাল গান গাও। আরে যা শালা ভাল গান শুনবি তো কেত্তন শুনগে যা। রাত দশটা পার হয়ে গেছে। বাজাও গিজি-ঘিনাতা। হা রা রা রা রা। আচ্ছা আচ্ছা ভাল গান হোক। চুপ চুপ। এই সানাই ধর। "আহা পা টলে টলে খানায় পড়ে সে ভারি মজা। সে ত ভারি মজা সখি। 'জলদ বাজাও'। সে তো ভারি মজা।" হায় হায়। কোমর বেঁকিয়ে নাচ শুরু হয়। ছেলে বুড়ো যুবা সবার চোখেই লাগে নাচের ঘোর। ওদিকে ভোর হতে আর কত বাকী?

যারা একটু হুঁশিয়ার, একটু সন্ধানী, একটু রসিক তারা একটু খোঁজে থাকো। সুযোগ মতো ফরমাস কর। 'কত্তা এবার একটা ইমন'। কান ভরে সানাই শুনে নাও। ঢোল বাজাবার কসরৎ দেখ। 'একখানা দরবারী। এই নাও বিড়ি নাও।' 'একখানা কেত্তন।' 'একখানা মালকোষ।' তারপর চোখের

সামনে থেকে সব গলতে শুরু করবে। এই শহর, এই মানুষ। সুরের কোটাল নামবে। ধীরে ধীরে ডুবে যাবে জগৎ সংসার সুরের পাথারে। 'আঃ কি মাইরী র‍্যাবিস, এই বুড়ো লারে লাপ্পা বাজাও।' হ্যাঁ হ্যাঁ লারে লাপ্পা হোক। লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা। হায় হায়। শুরু হল নাচন। কেটে পড় ওখান থেকে। ধর আরেকজনকে দাও সিগারেট। 'কি পুরিয়া বাজাব? ভীম পলাশ?'

তারপর এক সময় রাত কাবার। পরদিন ভাসান।

দুপুরের পর থেকে আয়োজন। তারপর যাত্রা। হৈ চৈ লারে লাপ্পা নাচ ভীড় মারামারি সবই চরমে। রাত বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমা বিসর্জন। সব উত্তেজনার শান্তি।

পরদিন থেকে আবার ভদ্র, নিরীহ, নির্জীব জীবন। প্রবৃত্তির দাস আর কেউ নয়। সবায়েরই আবার দাসের প্রবৃত্তি নিয়ে ঘরকন্না।

কলকেতা কীর্তন

কলৌ নামৈব কেবলম্। কলিতে শুধু নামই স্মর। নাম গানই হচ্ছে কীর্তন। ক-এ কৃষ্ণ নয়, কালী নয়, কলির শহর কলকেতা, আমার তাই কলকেতা কীর্তন। কোথা দিয়ে শুরু আর কোথা গিয়ে সারা তা ভেবেই দিশাহারা।

কলকেতার রূপের কি শুরু শেষ আছে? মহিমার কি আদি অন্ত আছে? কি করে ফোটাবো? গদ্যে বলবো না পদ্যে?

কোন শব্দ কোন ভাষা
পূরাবে যে অভিলাষা
তাহা কিছু না পাই উদ্দেশ।
জয় জয় কলিকাতা
মোহ নাশা মোক্ষ দাতা
তব ক্রোড়ে হই যেন শেষ॥

এই আমার অন্তিম প্রার্থনা। পালার শুরুতে একেবারে আখেরি চাওয়া চেয়ে নিয়ে গাওনা শুরু করলুম।

খোশ গল্পটা সবাই জানেন। একবার চারটে অন্ধকে হাতী দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। হাত বুলিয়ে হাতী দেখে চারজনে চারটে রিপোর্ট দিলে। জবাবগুলো একেবারে সরকার আর বিরোধী দলের সওয়াল জবাবের জ্ঞেয়াত-গোত্তর। কারো সঙ্গে কারো মিল নেই। যার হাত হাতীর পায়ে ঠেকল, সে বললে, হাতীর চেহারা থামের মতো, যার হাত কানে ঠেকল, সে বললে, হাতী কুলোর মত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তত্ত্বের গন্ধ পেলে যাদের নোলায় জল সক্ সক্ করে তাঁরা বলেন, মুরুখ্খু, গল্প পড়েই ক্ষান্ত দিও না, এগিয়ে গেলেই 'মরাল' পাবে। হাতীটা হল পৃথিবী, আর আমরা বেবাক ব্যক্তি ওই অন্ধ দর্শক। হাত বুলিয়েই ঠাহর করে যাচ্ছি। আমাদের জ্ঞানের দৌড় ওই অব্দিই।

বলতে পারতুম, আমার দেখাটাও এমনিতরো, কিন্তু তাতে সত্যকথন হত না। আমার কলকেতা দেখা চার অন্ধের হাতী দেখা নয়, এক অন্ধের হাতী

দেখা। তাই কখনো থাম দেখব, কখনো কুলো দেখব, কখনো শুঁড়কে ভাববো বোম্বাই জোঁক।

অতএব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঁয়তাড়া না কষে গুরু গোঁসাই স্মরণ করে যাত্রা শুরু করলুম।

কলকেতা কলকেতা তো খুব করে যাচ্ছেন। পিওর কলকেতা কতটুকু? না যতটুকু কর্পোরেশনের চৌহদ্দি। অতএব সেই পথেই চলি। পথের কথাই আগে বলি।

উত্তর থেকে আসতে চান? কাশীপুর রোড থেকে কাশীনাথ দত্ত রোড। সেখান থেকে 'নাক বরাবর ডান দিকে চোখ রেখে' চলুন কালীচরণ ঘোষ রোড, তারপর রামকৃষ্ণ ঘোষ লেন। এবার খানিক দক্ষিণে আসুন—ব্যস্, আগের কালের ইস্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর শড়ক। 'রেল কম ঝমাঝম্'। যদি বরাতকে পাকিস্তানে চালান না করে থাকেন তো 'পা পিছলে আলুর দম' বনবার কোন চান্স নেই। রেল শড়ককে পাশ কাটিয়ে ঝপ্ করে ঢুকে পড়ুন নয় খালের পাশে। ধার ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই বেলেঘাটার খাল। বেলেঘাটা খালের দক্ষিণ পাড় দিয়ে পশ্চিম দিকে টাল খেলেই পাগলাডাংগা রোড। চিংড়িঘাটা রোডের সংগে গোত্তা খেয়ে দক্ষিণমুখী খানিক ছুটুন। তারপর চিংড়ি শেষ, শেষ হল তো মুখ বদলে নিন ট্যাংরা দিয়ে। ট্যাংরা রোড। সাউথ ধরে পুববুধারে এগুলেই পাবেন তপ্সে। খা-সা মশাই। এতো বাউণ্ডারী নয়, একেবারে মাছের বাজার। দরদামের সময় নেই, ধরো আর খালুয়ে ভরো। তপ্সে নর্থকে কায়দা করে ততক্ষণে পেঁাছে গেছেন এণ্টালী-পার্ক সার্কাসের হে পারে, হিউজ রোডে। হিউজ রোডের পুব্ ফুট ধরে ধরে গুটি গুটি এগুলেই 'আহা ভেতরে বাহিরে সে কী মেশামেশি।' একেবারে 'টাইনে'র 'বাহে' আর গ্রামের 'বাহে'তে মোলাকাত। উত্তর বাঙলার গ্রামের লোকদের 'বাহে' বলে। তাদের রীতি প্রকৃতি সরল বলে হুঁশিয়ার লোকেরা তাদের সংগে মজা মেরে দুটো সুখ সুলুপো উশুল করে নেন। একবার এক বাহে দুধ বেচতে এসেছে। বাবু শুধুলেন, কি হে দুধ ভাল তো? হেঁ হেঁ করে বাহে বললে, কর্তা কি যে বলেন? একেবারে আসল গোরুর দুধ। দুধ যে নকল গোরুর নয় তা জানি, বলি খাঁটি তো? খাঁটি হবে না বলেন কি, দুধ তো নয় বটের আঠা। কিন্তু আমার যে জল মেশানো দুধ চাই হে, ডাক্তারের হুকুম। বাহে একগাল হেসে বললে, কিছু কি আর না মিশিয়েছি স্যার, আমরা টাইনের (টাউনের) বাহে, খাঁটি দুধ বেচিই না।

'সার্কাস'

হিউজ রোডের পুব্ মুড়োটা নাক ঠেকিয়েছে দুটি প্রমাণ সাইজের পয়নালির সঙ্গে। একটি বেশ চালাক দেখলেই টাইনের। অন্যটি আশপাশ মফঃস্বলের। তপ্সে রোড কয়েক চক্কর এধার ওধার মেরে আবার সরে পড়েছে। কলকেতার সীমানায় গেটে পাহারা দেবার ডিউটি তারপর থেকে খানিকক্ষণ পড়েছে তিলজলা মসজিদবাড়ী লেনের উপর। এ তল্লাটে আমদানী শুধু চামড়ার আর ছুট লোহা আর ধোপা আর কাঠ মিস্ত্রীর। গন্ধে তিষ্টুনো দায়। একটু পা চালান মশাই। তারপর পুব দক্ষিণে পাড়ি মারলেই তিলজলা রোড। হরেক রকম চিজ বোঝাই তেত্রিশ নম্বর বাসের একটুক্ষণের সংগী। যেন হাটুরে পথের সাথী। মিঞা, যাবেন কন্দুর? রাজা বাজার, আপনি? চাঁদনী চক। লেন তবে বিড়ি ধরান। আচ্ছা, আদাব আরজ। আদাব আরজ। ভাবখানা এই। বেশ যাচ্ছিল, তিলজলা মসজিদবাড়ী, দক্ষিণে মোড় নিয়েই ফ্যাসাদ বাধালে। হুস-হাস ট্রেন যাচ্ছে। খটাংখট মালগাড়ি। সেরেছে। বের হই কোথা দিয়ে। ডায়মণ্ডহারবার, ক্যানিং লক্ষ্মীকান্তপুর লাইনের হাত যদিও এড়ালুম, ফের পড়লুম গিয়ে বজবজ লাইনের কবলে। জট ছাড়িয়েই রসা রোড। এবার একটু জিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এক কাপ গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে চাঙ্গা শরীরকে আরো দক্ষিণে ঠেলে দিন। টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। আরো দক্ষিণে যান তো পোর্ট কমিশনারের ডক বানাবার বিরাট পতিত জমি। ছড়িয়ে আছে ওদিকে সেই ডায়মণ্ডহারবার রোড ইস্তক। এই তামাম ভুঁই চক্কর খেয়ে আর ধারে পড়লেই সার্কুলার গার্ডেন রীচ খিচ খিচ করে উঠবে। গার্ডেন রীচের এই মাথা আর সেই মাথা দৌড় মেরে পুব দিকে এগুলেই প্রিন্স দিলওয়ারজার গলি। তারপর পোর্ট কমিশনারের জমি। আর তারপরই ভোঁপ ভোঁপ জাহাজ ইস্টিমারে শুয়োর-ঠাসা হুগলী নদী। পাড় ধরে পাড় ধরে এগিয়ে যাও সেই পশ্চিম দিকে। আরো আরো আরো। হ্যাঁ, এই হল পরামাণিক ঘাট রোড। তারপর কাশীপুর রোড। যেখান থেকে যাত্রা করা, সেই ঠেঁয়ে আবার এসে পড়া। সুকুমার রায়ের মতো 'আমড়াতলার মোড়' থেকে যাত্রা করে 'চলতে চলতে দেখবে শেষে রাস্তা গেছে বেঁকে।' তারপর—

> 'দেখবে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে পথ গিয়েছে কত,
> তারি ভিতর ঘুরবে খানিক গোলক ধাঁধার মতো।
> তার পরেতে হঠাৎ বেঁকে ডাইনে মোচড় মেরে,
> ফিরবে আবার বাঁয়ের দিকে তিনটে গলি ছেড়ে।
> তবেই আবার পড়বে এসে আমড়াতলার মোড়ে।'

'সার্কাস'

একটার পর একটা রাস্তা দিয়ে শিকল গড়ে প্রায় একত্রিশ বর্গমাইল পরিমাণ যে জায়গাটুকু কর্পোরেশন বেঁধে রেখেছেন সেইটুকুই কলকেতা। বিঘের হিসেবে ঊনষাট হাজার আর তারো উপর একানব্বই বিঘে জমির পরে শহর কলকেতা ঘর বাড়ী পার্ক পুকুর ইস্তক গড়ের ময়দানখানা ট্যাঁকে পুরে খাড়া।

শুনেছি কাশী নাকি বিশ্বেশ্বরের খাস তালুক। সেখানে হাজার পাপ করেও কেউ যদি মরে তো তার আখেরি মোকাম কৈলাসে। যমের বাপের সাধ্যি কি কাশীর সীমানায় ঢোকে। যমের দাপট কাশীতে গিয়েই তেজ পক্ষের স্বামীর মতো ঠাণ্ডা মেরে যায়। ঠিক তেমনি ব্যাপার কর্পোরেশনের। এই একত্রিশ বর্গমাইলের মধ্যে তার দাপট যমকেও বাপ ডাকিয়ে ছাড়ে। কিন্তু কেল্লা এলাকায় দাদার আমার সব পাওয়ার খোলা শিশির কপ্পুর হয়ে যায়। কেল্লা ইজ কেল্লা। এখনো সে ফোর্ট উইলিয়ম। স্বাধীন বাঙলায় ক্লাইভ স্ট্রীট নেতাজী সুভাষ রোড হয়ে গেল। কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার হল আজাদ হিন্দ বাগ। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম, ফোর্ট উইলিয়মই থাকল। তার টিকিতে টান দেবে অমন লম্বা হাত কার। ফোর্ট উইলিয়ম কলকেতার কাশী। তার বিধি-বন্দোবস্ত আলাদা। কর্পোরেশন তার দেওয়ালে দাঁত ফোটাতে পারে না। আরো খানিকটে জায়গা হেস্টিংসের কিছুটা, ক্লাইভ রো-এর উত্তর মাথা দক্ষিণ মাথা আর স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে হুগলী নদীর কিনারের জায়গাটুকু কর্পোরেশনের ট্যাক্সকে লবডংকা দেখায়।

শহর কলকেতা শুধু বাঙলার নয়, বাঙালীরও শুধু নয়, তামাম দুনিয়ার। যার আর কোথাও ঠাঁই নেই তার কলকেতা আছে। বোম্বাই দিল্লী মাদ্রাজও শহর। কিন্তু কলকেতার পাশে কিছু না। এত লোক, এত বৈচিত্র্য তারা কোথায় পাবে? এক বর্গমাইলে ৭৭ হাজারের উপর লোক বাস করে এখানে। সন ১৬৯৮ সালে কোম্পানী মাত্তর ১৩০০ টাকায় তিনখানা গ্রাম ইজারা নিয়ে কলকেতার পত্তন করে। আঠারো বছর পরে লোক গুনে দেখা যায়, সব নিয়ে লোক হলো একুনে বারো হাজার। আর স্বাধীনতা পাবার পর ১৯৫১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেল সাড়ে পঁচিশ লাখের কাছাকাছি। প্রতি ঘণ্টায় গড়ে সাতজন জন্মাচ্ছে আর প্রতি দু ঘণ্টায় গড়ে নয়জন মরছে।

হাওড়া ইস্টিশান থেকে মোগলসরাই সিধে চারশ এগারো মাইল। মেল গাড়ী চেপে বারো ঘণ্টা দৌড় দিলেই মোগলসরাই। কলকেতা শহরে যে

'সার্কাস'

রাস্তাগুলো আছে তাদের মাদী মদ্দা আণ্ডা বাচ্চা ধরে ধরে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে দিলে তারাও হাত বাড়িয়ে মোগলসরাইকে ছুঁই-ছুঁই করে।

অলিতে গলিতে কলকেতা একেবারে গোলকধাঁধা। গইগেরামের লোকের মতো সদাসতর্কতার আঁচলে গিঁট দিয়ে না চললেই গুবলেট। একবার, তখন আমি কাঠ বাঙগাল, কলকেতা দেখতে এসেছি এক মুরুব্বীর সংগে। শেয়ালদায় নামা মাত্তর আমার আক্কেল সেই যে ল্যাজ তুলে দৌড়ুলো আর তার নাগাল পেলুম না। মুরুব্বীটি এর আগেও বার কতক এসেছেন। তাই তাঁর ভরসায় নাও ভাসিয়ে হালটি তাঁকে দিয়ে পালের দড়ি ধরে বসে রইলুম। মুরুব্বী বললেন, এই খুব কাছেই বৌবাজার আর চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ের মোড়টা। হেঁটে গেলে পাঁচ মিনিট, বাসে চড়ে আর কি হবে, কি বলিস? সায় দিলুম। কলকেতায় যা দেখি তাই ভাল লাগে। মফঃস্বলের লোক। প্রত্যহ যা দেখি, প্রত্যহ যা শুনি, তার সংগে কলকেতায়-পা-দেওয়া দিনের কোনো সম্পর্ক নেই। এ একেবারেই সৃষ্টিছাড়া। মফস্বল যদি গোরুর গাড়ী তো কলকেতা হাওয়া গাড়ী। কি গতি! কত প্রাণবন্ত! জড়তাহীন উন্দামতা। চিরযৌবনা উন্মাদনা আর উত্তেজনা। বৌবাজারের ফুটপাতে পা দিতে না দিতেই একেবারে আলুর দম! মুরুব্বী বললেন, লাগল না কি হৈ ছোকরা। ক্যাবলার মতো জবাব দিলুম, আজ্ঞে না। কিন্তু মনে মনে জানলুম কলকেতা আমাকে কোল দিলে। কানে কানে বললে, এখানে গতি। খুট খুট পা ফেলো না। চল ঊর্ধ্বশ্বাসে। গুনে গুনে পা ফেললে আবার পপাত হতে দেরী হবে না।

ধুলো ঝেড়ে পায়ের অসাড়তা ভেঙে উঠে দাঁড়ালুম। বুঝলুম ঝিঁঝিধরা গেঁয়ো পায়ে এখানে চলা যাবে না। এর চলন স্বতন্ত্র। সেই থেকে কলকাত্তাই চলন রপ্ত করতে চেষ্টা করেছি। পেরেছি তা বলব না। কলকাত্তাই চলন এ যুগের চলন। ভাল না খারাপ, এগুচ্ছি কি পিছুচ্ছি সে হিসেব আমার রাখবার নয়। এখানে চলাটাই নয়, ঠিক চালে চলাই আসল। ভুল ঠিকানায় পেঁাছে গেলেও মজার কমতি নেই। অতএব চল চল কলকেতা, কলির কলকেতা। কলিতে সার শুধু কলিকাতা। আমার কেত্তন, এরই কেত্তন।

হাওড়ার ইস্টিশান

কএ যদি কৃষ্ণ নয়, কালী নয়, কলকেতা; তো হ-এ ও হরি নয়, হর নয়, হাওড়া। ওপার হাওড়া এপার কলকেতা, মাঝখানে এক বিভেদ; হুগলী নদী, ওরফে ভাগীরথী, মুখের কথায় গঙ্গা।

ওপারে হাওড়া, হাওড়ার ইস্টিশান। পাটকিলে তার রঙ। মাথায় ঘড়ির তাজ। আর চার পাশে সব ইয়ার বক্সী—ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিক্‌শা, এমন কি জলুস-চটা ঘোড়ার গাড়ি। সকাল থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত প্রত্যহই পুরো মাইফেল। জোড়া জোড়া সমান্তরাল ইস্পাতের লাইন পাঠিয়ে হাওড়ার ইস্টিশান তাবৎ দূরের টিকি বেঁধে রেখেছে। যখন যাকে দরকার, কি কাছে পেতে ইচ্ছে, দিল্লী বোম্বাই মাদ্রাজ, কি আরো জানা অজানা, চেনা অচেনা অজস্র স্থানকে, এই জোড়া লাইন ধরে টান মারে আর সুড় সুড় করে তারা এসে হাজির হয় গাড়ির রূপ ধরে ধরে। এটা কি? বোম্বে মেল। ওটা কি? দিল্লী এক্‌সপ্রেস্। আর ওইটে? মাদ্রাজ মেল। নাগপুর প্যাসেঞ্জার, মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার, দানাপুর, কিউল, সাহেবগঞ্জ—অজস্র অজস্র।

মেল, এক্‌সপ্রেস্, প্যাসেঞ্জার,—এরা তো সব রেল বংশের কেষ্ট বিষ্টু। দূর পাল্লায় পাড়ি জমায়। এ ছাড়া লোক্যাল আছে। খুচরো খেপের কারবারী। কিন্তু এদের তুচ্ছ করেন আপনার সাধ্যি কি? রেল কোম্পানীর তোষাখানায় রেস্ত জোগানোর এক মোটা হিস্যা এদের। এ ছাড়া আছে পার্সেল আর গুড্‌স্ মানে মালগাড়ী। পার্সেল আর গুড্‌স্ বেশী তবে বোধ করি তেমন দর্শনধারী নয়, কলকেতার বড় চাকুরের বাড়িতে হাফ শিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে খুড়তুতো ভাই, এসেছ যখন থাক, দেহে শক্তি আছে, বাজারটা আসটা করো, কিন্তু বাপু খবরদার, ওই ভূতো চেহারা নিয়ে সদরে বেরিয়োনা, লোকজন হরদম আসছে, কে ফস্ করে পরিচয় জিগ্যেস করে বসবে আর মাথা কাটা যাবে। তাই মালগাড়ির স্থান হয়েছে হাওড়া ইস্টিশানের খিড়কীতে। ও তল্লাটের নামই গুডস্ শেড্ হালফ্যাসানের বাবু বিবির নজর ওদিকে পড়বার কথা নয়।

পার্সেল ট্রেন বড় উপর-চালাক। ব্যাটা আসলে বয় মাল।

'সার্কাস'

কিন্তু কখনো সখনো প্যাসেঞ্জার নিয়ে জাতে ওঠবার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। দেহটাকেও ঘষে মেজে চেকনাই ছাড়বার বৃথা আয়াসে ব্যস্ত। যেন গ্রামের মেয়ে 'ডেরেস্' করে 'থ্যাটার' দেখতে 'ইস্টারে' এসেছে। ব্যক্তিটি খলিফা সন্দেহ নেই। ঠেলে ঠুলে প্যাসেঞ্জারদের মধ্যেই আপন ঠাঁই বাগিয়ে নিয়েছে। হোকনা তা একেবারে একটেরে, সেই বার নম্বরে।

আমরা যারা নিত্যি নিত্যি যাতায়াত করি হাওড়া দিয়ে, আজকাল কেউ বারো নম্বর প্লাটফরমটায় ভুলে ভুলুক মেরেও চাইনে। ও যেন বাবুর আগের আমলের কোট। টনকো আছে, কিন্তু পুরোনো, তাই এখন উঠেছে চাকরের গায়ে। এখন আমাদের কারবার এক থেকে এগারো নম্বরের সঙ্গে।

মেন বিল্ডিং ছেড়ে ডি এস অফিসের দিকে দুপা গিয়েই ডান দিকে মোচড় মারুন। সার সার কতকগুলো আফিস। হাওড়া কণ্ট্রোল। কানে হেডফোন আর চোখের সামনে নক্শা। সদা সতর্ক লোকগুলোর মুখ থেকে অনবরত বেরুচ্ছে, হ্যালো বর্ধমান, সাঁয়ত্রিশ আপ্? এই ছাড়লো। তো ছকের উপর পিন পোঁতো। হ্যালো আসানসোল, টু ডাউন? খবর নেই। তো ফোন চলল আরো দূরে। হ্যালো কাটোয়া, হ্যালো ব্যাণ্ডেল, হ্যালো খানা, হ্যালো অণ্ডাল? থার্টিন ডাউন? ইলেভেন আপ? অমুক গুডস্? তমুক পার্সেল? লাইট ইঞ্জিন, সাটল্? কে কোথায় কখন কোন্ লাইনে, আসছে কি যাচ্ছে, নাকি উল্টে পড়ে আছে সব খবর কণ্ট্রোলে। জিগ্যেস করতে না করতে জবাব। ফোর ডাউন? এখনো আসানসোল ছাড়েনি। এক ঘণ্টা সাঁয়ত্রিশ মিনিট লেট। কণ্ট্রোল অফিস ছাড়িয়ে একটু এগুলেই জলুসহীন এক প্লাটফরম্। 'খাঁচা' ঘরের সামনে। খাঁচা ঘর কি? না স্ট্রং রুম্। রেল কোম্পানীর বিরাট সিন্দুক। পার্সেলে যে সব দামী দামী মাল আসে তা গাড়ি থেকে খালাস করে কোথায় রাখা হয়? এই 'খাঁচা' ঘরে। মোটা মোটা লোহার শিক দিয়ে ঘরটা সুরক্ষিত। তাই কুলীরা বলে খাঁচা। ও সব টং ফং আংগরেজী বোলি, দেহাতি আদামী আমরা, আমাদের মুখে ঠিক্সে বাজে না। তার চেয়ে এই বেশ বাবা, সিধা সাধা খাঁচা ঘর। এই খাঁচা ঘরের সামনেই প্লাটফরম নম্বর বারো। এখন আর কেউ ফিরেও চায় না।

কিন্তু সে আরেকদিনের কথা। হাওড়া ইস্টিশানের এত বড় ইমারত ওঠেইনি। এত জমজমাট, এত এরিয়া, এত বাস-ট্রাম ট্যাক্সি, রিক্শার ভিড় কিছুই ছিল না। শুধু ছিল ঠিকে ঘোড়ার গাড়ি। সেদিন তাদেরও চেকনাই ছিল, কারণ তারাই ছিল একমাত্র যান। যাতে চেপে সাহেব-বিবি কলকেতা

যেতেন। আর জলুস ছিল এই প্ল্যাটফরমটার। তখন এ বারো নয়, একমেবাদ্বিতীয়ম্। একমাত্র প্লাটফরম। সে আমলের তাবৎ প্যাসেঞ্জারের 'একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান'। অরিজিন্যাল হাওড়ার ইস্টিশান ছিল এই তল্লাটেই।

রেল কোম্পানীর সুয়োরাণী হয়েছে এখন ও-মহল—এগারোটা প্ল্যাট-ফরমের গর্বে ফাট ফাট নতুন বিল্ডিং। প্রতিদিন সাতান্নখানা গাড়ি ছাড়ছে, সাতান্নখানা গাড়ি আসছে।

প্রতিদিন কুড়ি হাজার মাথা কোলাপসিবল্ গেটের চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকছে, আর বেরুচ্ছে যেখান দিয়ে, গড়ে যেখানে টিকিট বিক্রী হচ্ছে দৈনিক এক লাখ টাকার, নিশ্চয়ই তার আদর বেশী হবে। কে মনে রাখে পুরাতনে? তবু কোনো কৌতূহলী যদি হট্টগোলের স্রোত ঠেলে পুরানো মহলে এসে পড়েন কখনো, খাঁচা ঘরের পাশ দিয়ে পার্সেল আফিসের দিকে এগুতে গেলেই তাঁর নজরে পড়বে, আপন অভিমান বুকে চেপে দাঁড়িয়ে থাকা এক অভিজাত পিত্তল ফলকের উপর। মাঝখানে এক তারা। উপরে আর নিচে ইংরেজী হরফে খোদাই করা কটি কথা অরিজিন্যাল জিরো মাইল, ই আই আর। এখান থেকেই ই আই রেলের শুরু। এই হল পুরোনো হাওড়ার প্রথম প্ল্যাটফরম। এক পার্সেল ছাড়া এখন আর কে পোঁছে তাকে।

এলাহী কথাটার যদি কোনো আকার থাকে, তবে তা নিঃসন্দেহে হাওড়া। ভারতের আর কোথাও দৈনিক এত গাড়ি যায় আসে না, আর কোথাও এত প্যাসেঞ্জার নামে ওঠে না, পৃথিবীর আর কোনো ইস্টিশানে এত বিচিত্র যানবাহন নেই, এত বেশী যানবাহন নেই।

মশাই, চাট্টিখানি কথা নয়, এই ইস্টিশানের স্টাফ কত জানেন? পুরো পাঁচটি হাজার। চোদ্দশ' আটাশজন তো কুলিই আছে। তাতেও কি কুলোয়, হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিনে! অজস্র ডিপার্টমেণ্ট অজস্র লোক, এদের সবার উপরে কর্তা হলেন স্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। অফিসও হেথা, কোয়ার্টারও হেথা। উঁচু গাছে হাওয়া লাগে বেশী, বুঝলেন স্যার। আমরা শা—রা চুনোপুঁটি, কে চায় আমাদের দিকে। সিফট্ ডিউটি করে যাচ্ছি, কখনো ভোরে, কাকপক্ষীর ঘুম না ভাঙতেই আফিসে এসে হাজরে দিচ্ছি, কখনো ইভনিং ডিউটি, কাজ যখন সেরে উঠলাম তখন জগৎ ঘুমে অচেতন। বড় বড় বাবুদের বড় বড় কথা বুঝলেন না, এই দেখুন না, ওদের দশটা পাঁচটা ডিউটি, তবুও ওদের এখানেই কোয়ার্টার। কেন? না বিগ্‌গান যে! আর আমরা স্যার সাতষট্টি মাইল পাড়ি

মেরে সেই ধাপধাড়া গোবিন্দপুর থেকে ডিউটি করতে আসছি। পোড়া পেটটি না থাকলে চাকরীর মুখে ঝাড়ু মেরে কবে চলে যেতাম। হ্যাঃ!

আর আর সব ডিপার্টমেণ্ট তো পাবলিকের চক্ষুর আড়ালে থাকেন। কিন্তু গেটের টি সি মানে টিকিট কালেক্টর আর বুকিং ক্লার্ক, এরা যাবেন কোথায়? তাই যত খেঁচাখেঁচি এদের সংগে। আর সব কাজ ঢিমে তালে কিন্তু ট্রেনের কম্ম টাইমে চলে। ঘড়ির কাঁটার তিলেক পরিমাণ কারচুপীতেই কোয়েশ্চেন্ অব্ লাইফ্ অ্যাণ্ড্ ডেথ্, স্যার। তাই কারো আর তর সয়না। একবার ভিড়ের সময় এসে দেখবেন না টিকেট কাউণ্টারে। চক্ষু ঠিকরে বেরিয়ে যাবে।

তিনটে শিফট্ বুকিং কেরাণীদের, আট ঘণ্টা ডিউটি। ছ ঘণ্টা টিকিট বিক্রী, দু ঘণ্টা তার হিসেব। হেডে আর মাথা থাকে না স্যার। হাওড়ার কাউণ্টার। সাত আট হাজার টাকা করে দৈনিক এক এক কাউণ্টারে উশুল। থার্ড ক্লাশ কাউণ্টারের কথা বলছি। বুঝুন দেখি, টাকা বাজিয়েই বা নেব কখন, নোটটাই বা দেখি কখন, আবার হিসেব করে পয়সাই বা ঠিক ঠিক ফেরৎ দিই কি করে। একটু সময় নিলেই তো দুনিয়া অন্ধকার। খদ্দেরের গালের চোটে স্বগ্গ থেকে ঠাকুদ্দা নেমে আসেন। আর তাদেরই বা দোষ দিই কি করে? মনে সর্বদা ভাবনা, এই বুঝি তাকে রেখে ট্রেন ছেড়ে দিলে। মনের আতংকে কার মেজাজ ভাল থাকে? আমারই কি থাকত? তারপর আবার লাইনে দাঁড়াবার যন্ত্রণা। কর্তারা প্রতি বছর তো রেল বাজেটে বক্তৃতা ঝাড়ছেন পাবলিকের সুবিধে করে দিচ্ছেন বলে। খালি বাত, খালি ব্যোম্ ঝাড়া মশাই। এই হাওড়া, এত ইনকাম, এখানে কত মান্থলি ইসু হয় জানেন? বিশ হাজার! বললাম না, ধারণা করতে পারবেন না, কিন্তু থার্ড ক্লাশ টিকিট কাউণ্টার মাত্তর তিরিশটি। তাও আঠারোটার বেশী একসংগে কাজ হয় না এতে কি হয় বলুন। 'রাশ্ আওয়ারে' বুকিং কেরাণীদের বুকের রক্ত জল হয়ে গংগায় গিয়ে জোয়ার তোলে। একটুও বাড়াচ্ছিনে স্যার। আমার এক বন্ধু, তার টি-বি হয়ে গেছে, কাজের চাপে, এখন কাঁচড়াপাড়ায় ভুগছে, হাওড়া বুকিংকে বলত কুকিং অফিস্। রেল কোম্পানী তার কেরাণীদের এখানে পাঠিয়ে ভাজে, ভেজে তেল বের করে। সেই তেলে রেলের চাকা সড়গড় রাখে। কথাটা কি মিথ্যে স্যার?

বাইরে শুনুন, শুনবেন বুকিংএর চাকরী রাজার চাকরী। কেন? না টু-পাইস্ ইনকম্ খুব। স্যার রেলের চাকরী, কোথায় উপরির কারবার নেই, বলুন তো। 'অল্ বার্ড ফিস্ ইটার ওনুলি মাছরাঙ্গা ইজ্ থিব্', শুধু মাছ-

রাঙ্গাটাই দোষী, বেড়ে জাস্টিস্ দাদা। উপরি না পেলে রেলচাকুরের ছেলে অব্দি ভূমিষ্ট হয় না, তা জানেন?

তবে বলি শুনুন। রেলের বেশ বড় গোছের অফিসার, কেষ্টবিষ্টু গোছ, তার ওয়াইফের সময় হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ডেলিভারী হয় না। এগারো মাস পার হয়, তবু না। ডাক্তার বদ্যি হার মানলে, শেষকালে এলেন এক রিটায়ার্ড রেলের ডাক্তার। তাঁর তিনপুরুষে রেলে কাজ। তিনি দেখে শুনে বললেন, গোলমাল কিছু নেই, প্রসূতি সুস্থ, বাচ্চার অবস্থাও ভাল। তবে শুধু হাতে ওকে বের করা যাবে না, ঘুষ লাগবে। ঘুষ না পেলে বেরুবে না, ব্যাটাচ্ছেলে রামঘাঘু। ছেলের বাপ বললে, ঠিক হ্যায়, কি চাই? ডাক্তার চাইলেন এক আংটি। আংটিটি হাতে দিয়ে ডাক্তার কুটুস করে কাজটি হাঁসিল করে দিলেন। ছেলের হাতের বদ্ধমুষ্টি খুলতেই টুক্ করে আংটিটি খসে পড়ল। এই তো মশাই এখানকার রেওয়াজ। ঘুষ নেওয়া রেল-চাকুরের বার্থ রাইট।

কিন্তু এর আরেকটা দিকও আছে। তাহলে সেটাও শুনুন। ওই খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকি, আর প্রাণটা চ্যাপ্টা করে বেরুই। প্যাসেঞ্জাররা সব ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে আসেন তো। টিকিটগুলো খোপ থেকে নামাতে হবে, পরের টিকিটখানায় সিরিয়াল ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে হবে, একখানা গড়বড় হলেই দাও গাঁট গচ্চা। গচ্চা তো হরবখৎ দিতে হচ্ছে। তারপর ঘটাং করে পাঞ্চ করো, তারপর তো খদ্দেরকে দেওয়া। কিন্তু সব প্রথমে পয়সা নাও গুনে। অধিকাংশ লোকই টিকিটের দাম জানে না। কোথাকার টিকিট? বোলপুর। দিন দু টাকা চোদ্দ আনা ন পাই। তো সে দিলে একখানা দশটাকার নোট। তো হয়ে গেল মশাই। সে নোটটি ভাল করে দেখতেই দু মিনিট কাবার। ওদিকে কাউণ্টারের বাইরে চিল্লাচিল্লী লেগে গেছে। একখানা টিকিট দিতে ক ঘণ্টা লাগে, ও মশাই! বলি দাদার কি রাতে ভাল ঘুম হয়নি। ও স্যার, টিকিট দিতে দিতে গাড়ী যে বর্ধমান পেঁাছে গেল। এখন বলুন, শত মুখের অগ্নি উদ্গীরণ আমি সামলাই কি করে? অন্যমনস্ক হয়ে নোটটি যদি নিয়ে ফেলি, আর সেটি যদি জাল নোট, কি বাতিল নোট হয়, তখন? হেড্ অফিস থেকে 'ডেবিট' হয়ে আসবে। আর মাস মাইনে থেকে কচাং—তত টাকা কর্তন করে রাখবে। ভবিষ্যতের কথা নয়, নিয়ত হচ্ছে। কিন্তু পাবলিক তো সে খবর জানে না। একবার বলে দেখুন তো, মশাই নোটটা পাল্টে দিন। দেখবেন তখন। চোদ্দ হাজার জেরা। কেন, নোটটার কি পেট খারাপ হয়েছে? শুনুন কথা! সেই ভিড়ের মাথায় এই সব চুলকুনিতে কার মেজাজ ভাল থাকে। তখন

কাউণ্টারের সামনে ওই অজগর লাইন দেখেই তো প্রাণ হাফ হয়ে গিয়েছে। হয়ত একটা জবাব দিলাম। একটু কথান্তর হল, হয়ে গেল রিপোর্ট। অফিসার আছেন না পিছনে, কোথায় সাবর্ডিনেটদের একটু সাহায্য করবে তা না উল্টো। এসেই কাউণ্টার থেকে হয় সরিয়ে দিলে, নয় সস্‌পেণ্ড করলে। পাওয়ার দেখাবার যে কয় কায়দা আছে সব একে একে ঝেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে গেলেন। নয়ত এসে ধমক দিলেন, জলদি করুন। বুকিংএ অত স্লো হলে চলবে না।

সে তো আমরাও বুঝি বাপু। সাধ করে কেউ কাজ আটকে রাখে না। আমি বলি, কাউণ্টারে নোট দেবার দরকার কি? পয়সা ভাঙিয়ে, টিকিটের দামটা গস্ত করে দিলেই তো আদ্ধেক সময় বেঁচে গেল। আরে দাদা, আগে এই হাওড়া ইস্টিশানেই টাকা ভাঙানোর দুটো কাউণ্টার ছিল। সেটি তুলে দিয়ে ফায়দাটা কি হল? জিগ্যেস করুন না রেল কোম্পানীকে।

এই যে দেহাতী প্যাসেঞ্জাররা কাউণ্টারে কাউণ্টারে ঘুরে ঘুরে অযথা হয়রান হচ্ছে, সময় নষ্ট করছে, গাড়ি ফেল করছে, আমাদের সময় নিচ্ছে, জোচ্চর দাগাবাজদের কবলে পড়ছে, রেল-কোম্পানী দেখছে তা? কি হয় বলি শুনুন। গ্রামের লোক। সাদাসিধে আদমী। ঘ্যান ঘ্যান করছে, বাবু এখানে বালিয়ার টিকিট মিলবে? কেউ একজন মাথা নেড়ে দিলে তো তার পিছনেই দাঁড়িয়ে গেল। আধ ঘণ্টা পর কাউণ্টারে যখন এল, দেখা গেল সেটা কাটোয়ার কাউণ্টার। যত বলি, বাপু তোমার টিকিট এখানে মিলবে না, তত কাকুতি করে। দিয়ে দাও বাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। তখন ধমক লাগাই। সরে যায়। আরেক কাউণ্টারে গিয়ে ঝামেলা বাধায়। এমন একজন কেউ কি নেই, এদের একটু সাহায্য করতে পারে! কেন, প্যাসেঞ্জার গাইড? তারই তো কাজ এইসব। প্যাসেঞ্জার গাইডের টিকি আজ পর্যন্ত কেউ দেখেছে মশাই? ওরা মানুষ না পায়জামা তাই তো কেউ আজ পর্যন্ত জানল না। আর হেড্ অফিসটিও করেছে এমন একটেরে, এন্‌কোয়ারীতে না জিগ্যেস করলে হদিশ পাওয়া মুস্কিল। অবিশ্যি হেড্ অফিসে ওঁরা পারতপক্ষে থাকেন না। প্যাসেঞ্জার গাইড্‌কে খুঁজছেন? তবে এখানে কেন? ওই চায়ের স্টলে দেখুন। সেইটে ওদের ব্রাঞ্চ অফিস। গেলুম। আরে ব্বাপস্। স্যুট বুট পরে অ্যাসা চেহারা বাগিয়েছেন, যে জন্‌বুল্ মান্‌জর না মাজেস্টর, কৈ কহিবে? কাছে এগুতেই বুক ঢিপ ঢিপ, শুধুবো কোন প্রশ্ন? আমারই যদি এই অবস্থা তো মুল্‌কী আদমীদের অবস্থাটা কি হয় বুঝে দেখুন।

অথচ প্যাসেঞ্জার গাইড্‌রা একটু গা লাগালে আদ্ধেক মামলা ডিসমিস করে দিতে পারেন। লাইনে গিয়ে কোথা যাবেন কোথা যাবেন করলেই বেরিয়ে পড়বে ভুল ঠিকানার প্যাসেঞ্জার। তাদের ঠিক কাউণ্টার বাতলে দাও। ভাড়া কত বলে দাও। দ্যাখ ঠিকমতো পয়সা ফেরৎ পেল কিনা।

একদল জোচ্চর মশাই হাওড়ায় ঘুরে বেড়ায়। লিলুয়া রামরাজাতলার টিকিট গুচ্ছের কিনে রাখে। গ্রামের লোকেদের ভিড়ের কাছেই ওদের ঘোরাঘুরি। দূরপাল্লার টিকিট একজন কিনলে। হয়ত বললে, বাবু দেখিয়ে তো, ঠিক হ্যায় কি নেহি। এদের পাল্লায় পড়েছে কি তার ও-কম্ম হয়ে গেল। হাতসাফাইয়ের খেল দেখিয়ে আসল টিকিট গায়েব করে দিলে, তারপর লিলুয়ার টিকিট গছিয়ে, ঠিক তো হ্যায় বলে, কেটে পড়লে। কিম্বা পুরোনো টিকিটই একখানা গছালে। যদি হাওড়াতে ধরা পড়ল বেচারা তো বুকিং ক্লার্ককে নিয়ে টানাটানি। তার কাউণ্টার তক্ষুনি বন্ধ করে সার্চ, পয়সা বেশী হয় কিনা? ওদিকে দোষী যারা তারা হাওয়া দিলে। কত কেস্‌ যে হাওড়ায় হয় দৈনিক, কে তার খোঁজ রাখে?

ভোর চারটে পনেরো, তখনো চতুর্দিকে ঘুম ছড়ানো থাকে। হাওড়া ইস্টিশান জেগে ওঠে। দিনের প্রথম ট্রেন আসবার সময় হল। চারটে পনেরোয় পুরী প্যাসেঞ্জার। টি সি গিয়ে গেটে দাঁড়াল, কুলীরা প্ল্যাটফর্মে। বুকিং ক্লার্কও এসে খাঁচায় ঢুকেছে। চারটে পঞ্চাশে ছাড়বে পয়লা ট্রেন, মেদিনীপুর লাইট ট্রেন। টিকিট বিক্রীর সময় হল। কিন্তু তারও ঢের আগে থাকতে বুকিং বাবুর কাজ। শুধু কি টিকিট বিক্রী। তার আগে টিকিটের ক্লোজিং নম্বর মিলিয়ে নিতে হবে না? পাঞ্চ মেসিনে তারিখ বদলাতে হবে না?

চোখ থেকে ভাল করে ঘুম ছোটেনি, জোর পাওয়ারের আলো চোখে এসে ঘা দিচ্ছে। একাউণ্টস্‌ অফিসের বারান্দায় কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে গায়ে ব্যথা হয়েছে। ভোর চারটেয় ডিউটি, বাইরে থাকে, বুকিং বাবুকে আসতে হয়েছে গত রাত সাড়ে নয়টায়। কোয়ার্টার কোয়ার্টার করে হন্দ হয়ে গেল। রেস্ট রুম বানাচ্ছে কোম্পানী আজ আট বছর ধরে। সাতটা টি বি কেস বেরিয়ে গেল, রেস্ট রুম বানানো হল না। চেয়ারগুলোতে ছারপোকা ভর্তি। হাওড়া ইস্টিশন থেকে ডেলি কত আয় হয়? গড়ে দৈনিক লাখ টাকা। তাহলে বউনি শুরু হল। কাউণ্টারের বাইরে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। লোক এসেছে। কিন্তু কাজ যে এখনো বাকী? খাতায় স্টেশনের নাম তুলতে হবে। গতকাল হিসেব মেলেনি। সাড়ে বারো টাকা সর্ট। হিসেবেই গোল হল, না টাকা বেশী দিয়ে দিল? চারটে টাকা চলবে

বলে মনে হয় না? দশটাকার নোটটা কি 'ফোর্জড্', জাল? না 'কেমিকেলি ইরেজড্'? বার্মার নোট থেকে বার্মা কথাটা কেমিকেল দিয়ে ঘষে তুলে দিয়েছে? টিকিটই বেচব না নোট এক্সপার্ট হব। একশ বাহান্নটা ইস্টিশানের নাম টুকতে হবে খাতায়। পরশু ছিলাম ফরেনে, আড়াইশ'র উপর নাম লিখেছি। আজ সর্ট কিছু মেক্-আপ্ করতেই হবে। নইলে মাস গেলে আর মুখে অন্ন জুটবে না। প্রতি মাসে 'সর্ট' যায়। ছ' হাজার থেকে চার হাজার টাকা ডেলি এক এক কাউণ্টারের আদায়। প্রতিদিন একজন লোক এত কাজ করতে পারে কখনো। লোক বাড়াও, কাউণ্টার বাড়াও, কাজ কমাও। সর্ট হবে না। কাজেই অসৎ কাজ কেউ করবে না। কাজ নাও, আরামও দাও।

কাজ কাজ কাজ। ঢেউ-এর পর কাজের ঢেউ আসে। আর অচল অটল হাওড়ার ইস্টিশান, মাথায় এক ঘড়ির তাজ পরে, বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি, রিকশ, ঘোড়ার গাড়ীর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল। অজস্র ভিড় বাড়ে। দূরের যাত্রী, লোকাল যাত্রী। মোট ঘাট। দর দস্তুর। চেঁচামেচি। বিকেল থেকে রাত্রি। দশটা তিরিশ। বর্ধমান লোকাল। শেষ ট্রেন এসে গেল। বুকিং-এ তখনো লোক। চুঁচুড়ো দিন একখানা। শ্রীরামপুর দুটো। ওতোরপাড়া আড়াইটে। দশটা পঞ্চাশ। ব্যাণ্ডেল লোকাল। দিনের শেষে ট্রেন ছেড়ে দিল। ঝিমুনি এসেছে হাওড়ার। বাস ট্রাম চলে গেছে কখন! রিকশ, ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ী নেই। গেটে তালা পড়েছে। তখনো বুকিং ক্লার্ক তহবিল মেলাচ্ছে। দ্যাখ তো চায়ের দোকান খোলা আছে কি? খিদে পেয়েছে প্রচুর। সাড়ে এগারো, জিরো, ঘড়ির কাঁটা ঘুরে বাজল একটা। বুকিং বাবু ক্লোজিং নম্বর লিখছেন। ঘুম আর নেই, শুধু ক্লান্তি। ঘাড়ে পিঠে টন্ টন্ ব্যথা। রাত দেড়টা। হাওড়া বুকিং-এর আলো নিভলো। টাকা পয়সা জমা করে আবার সেই একাউণ্টস অফিসের বারান্দার টেবিল। ভাল বেঞ্চখানায় আরেকজন এসে শুয়ে পড়েছে। তার মর্নিং ডিউটি।

কুলি, এই কুলি

আগে এত ছিল না, এই টিণ্ডেল-ফিণ্ডেল, মেট, সর্দার, সাত-সতের। কুলিরা সিধা এসে মোটটি তুলত, গাড়িতে গিয়ে বসিয়ে দিত, কি গাড়ি থেকে মোট নামাত। তারপর প্ল্যাটফরমের বাইরে দাঁড়ান হাওয়া-গাড়িতে মোট তুলে পয়সা নিত। এমন তেমন বুঝলে মোট-গাঁটরিসহ কুলি কে কুলি হাওয়া হয়ে যেত হাওড়া থেকে। প্রচুর হয়েছে।

তা বলে সকলেরই কি এক রীতি? তা কখনো হয়? তাহলে দুনিয়া চলবে কেমন করে? হাওড়ার কুলিদের বাইরে একটু বদনাম আছে। দেবতা-ভেদে ওরা পুজো পাল্টায়। যেই দেখল হ্যাট, কোট, বুট অংগে, আর্দালি, চাপরাশী আছে সংগে, মুখ ড্যাম, ফুল, সোয়াইনের কামান দাগছে, অমনি বিনয়ের মুখোশখানা কামিজের ভেতর থেকে বের করে ঝেড়ে পুঁছে মুখে বসালে। তারপর কথাটি না কয়ে কাজ-কম্ম চুকিয়ে দিয়ে সাহেবের সামনে হাত পাতলে। যদি সাচ্চা সাহেব হয়, কথা কইবে না, যা হাতে আসবে দিয়ে দেবে। বেশি পেলে খুশি মনে সেলাম কর, কম পেলে মনে মনে খিস্তি কর, কিন্তু মুখে কিছু বল না, আর সেলামটিও ঠুকে যাও।

শক্তের ভক্ত আছি বলে নরম মাটিতে নখ বসাবো না? বড়সাহেব যে ঠোক্করটি দিলে, বউএর উপর দিয়ে তা যদি না-ই তুললুম, তবে আর আর্যবংশের মুখ রইল কোথায়? সাহেবদের কিছু বলো না, বিনা ঝামেলায় যেতে দাও। কিন্তু তা বলে ঝামেলা ছেড় না। দ্যাখ, কে এল? বাঙালী বাবু? ছোকরা নাকি? সংগে কে? এক খুবসুরৎ জেনানা? আরে বড়ো আপ টু ডেট্ আছে। এখানে হাঙ্গামা হবে না, 'আসান্‌সে' কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে। জোয়ানীর এক রীতি আছে না? দু-চার আনার জন্য খিচখিচ করবে না। মাল তুলে দাও। বাবু বিবিকে বসতে দাও আরামে। তো সির্‌ফ্ এক বাত পুছো, ক্যায়া বাবুজী আরাম তো মিলা? ব্যস্ তার পর মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হেসে হাতটা বাড়াও দিকি। কিছু না বলতেই দেখবে একটি টাকা। যদি একটু কঞ্জুষও হয় তো এক আঠ আন্নি, একটি আধুলি। এই হল ভাল কুলির ইষ্ট মন্তর।

তবে যদি সুবিধেমত লোক দ্যাখ তো ঝাঁপিয়ে পড় তাদের উপর। খিচখিচ কর, ঝামেলা বাধাও, হাঙ্গামা উঠাও। কি বাবু, এক কুলি, এক কুলি করছেন, সাতটা মোট আছে, তিন কুলিকা কমে হবে না। দেখিয়ে বাবু, তিন

টাকা লাগবে কমসে কম। কি তিন টাকা! মগ্‌কা মুল্লুক পায়া হ্যায় নাকি? তোমাকে নিতে হবে না বাবা, তুমি রাখ দেও। আচ্ছা বাবু, তো ঢ়াই টাকা। না বাবা, কাঁহে দিগদারি করছ। হাম তিরিশ বছরসে হিল্লী দিল্লী করছি, বুঝা, সাত ঘাটকা পানি হামরা পেটমে খলবল করতা হ্যায়। হামারা সাথমে শুধু শুধু পেঁয়াজি করে কই ফয়দা হবে না। তার চেয়ে যা বলছি বাপ্‌কা সুপুত্তুর হোকে তাই কর। একটি কুলিকে মাল দিয়ে সপ্ত-সাগর চষে এলুম, আর উনি এলেন নবাব খাঞ্জা খাঁএর নাতি। কুলি বুঝলে 'মিস্ ফায়ার'। দেখতে নরম কিন্তু ভেতরে শক্ত। তো চলল কাকুতির পালা। একটু দেখে-শুনে দেবেন বাবু। বাপু এত বাত না বলে গাড়িতে ওঠাও না। কথা পরে হবে। গাড়িতে মাল উঠল। দুটি সিকি বের করে কুলির হাতে দিতেই, কি বাবু, কি দিচ্ছেন? ঠিক দিচ্ছি বাবা। আবার ঝামেলা, আবার খ্যাঁচাখেঁচি, চেঁচামেচি, কথাতে কথাতে অশেষ ধস্তাধস্তি। তারপর দু পক্ষ এক-গা ঘামে নেয়ে উঠলে প্যাসেঞ্জারের পকেট থেকে এক আনি বের হল একখানা।

গ্রামের লোক হলেই কুলিদের পোয়া বারো। মেয়েরা একা হলে বিশেষ ট্যাঁ-ফোঁ আজকাল করে না। কেননা, পাবলিক এসে পড়বে। তেমন-তেমন জাঁহাবাজ মেয়ের সংগে টক্কর লাগলে বাপ ডাকিয়ে ছেড়ে দেবে। তাই কুলিরা পারতপক্ষে আওরাতের মোট বইতে চায় না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে। অবিশ্যি আপ্-টু-ডেট্ জানানাতে এদের তত আপত্তি নেই, যতটা কিনা তীর্থফেরতদের বেলায়। পুরীর গাড়ি, বানারস-গয়ার গাড়ি এলে এদের হৃৎকম্প। তাই যত তাড়াতাড়ি পারে, থার্ড কেলাস জানানা ডিবিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য ধারে কেটে পড়ার চেষ্টা করে।

কিন্তু তাতেই কি পার আছে? অ-রে অ কুলি! এই মিনসে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি, নামা না মোটগুলো। আস্তে আস্তে, আঃ ওটাতে গংগা আছে রে মুখপোড়া। ফেললি তো! বলি চোখের মাথা কি গুলে খেইছিস্! আহ-হা, ওটা সোজা করে নামা। উল্টুস নি। যদি কিছু ভাঙে তো তোরই একদিন কি আমারই একদিন। অ-মা, অ-কি, দিলি তো জলটুকু ফেলে। হারামজাদা, নচ্ছার, উট, বললুম না যত্ন করে নামাতে। গেরাজ্যি হল না। বেরো, শুয়ার, তোকে মোট বইতে হবে না।

গালাগাল খেতে হবে, কিন্তু মুখে কিছু বলা চলবে না। উত্তর-প্রত্যুত্তর হলেই আর দেখতে হবে না। ভদ্রমহিলা এদিক-ওদিক চেয়ে বলে উঠবেন, বলি অ গার্ড বাবু, অ পুলিশ, অ ভালমানুষের ছেলেরা, তোমরা উপস্থিত থাকতে এই

ছোটলোক নচ্ছারটা আমাকে নাহক অপমান করছে গা। জিনিসপত্তর ভেঙে তচনচ করে দিলে। বলি দেশ কি অরাজক হয়েছে? আইন কি নেই?

আইন নেই মানে? প্রত্যেকটি লোক আজ আইন পকেটে নিয়ে ঘোরে। কিসের থেকে কি হল, কার দোষ, সে বিচারে কাজ কি? মার শালাকে। শুরু হল পাবলিকের বিচার। একেবারে মোক্ষম, দুদ্দাড়, দুমদাম। মারপিটের পর, কুলিটিকে আধমরা করে পাবলিক বললে, শালে, জানানাকে অপমান কর। মাফ মাঙো। মাপ চাও। কিন্তু যার কাছে মাপ চাইবে, তিনি ততক্ষণে আরেকটি কুলি ঠিক করে মালপত্তর ঠিকে গাড়িতে চাপিয়ে গাড়োয়ানকে বলছেন, পটলডাঙ্গায় চল বাছা। আর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে কুলিটি চেল্লাচ্ছে, মাঈজী পয়সা। মাঈজী তখন কোমরের খুঁটের প্যাঁচ খুলছেন। কথাবার্তা বিশেষ বলছেন না। কুলি ওদিকে সমানে চেল্লাচ্ছে, মাঈজী, পয়সা দিজিয়ে। এতক্ষণে মাঈজীর ট্যাঁক থেকে পয়সা বেরুল। বেছে বেছে তেলা দুআনি দুখানি বের করে ধমক লাগালেন, মিনষের রকম দ্যাখ না, যেন পালিয়ে যাচ্ছি। বাবা বাবা, এত তীথ্থ ঘুরে এলুম, কিন্তু তোমাদের মত ছিনে জোঁক আর কোথাও দেখলুম না। খুরে দণ্ডবৎ।

আর ডেঞ্জারাস হচ্ছে শেঠজীরা। গাদা গাদা মোট-মুটরি নিয়ে যাতায়াত করবে। কিন্তু মুটিয়াকে পয়সা দিতে গেলেই প্রাণ বেরোয়। ঝক্কাঝক্কি করতে করতে কুলিদের মুখের জল শুকিয়ে যায়। আধপয়সা নগদা খসাতে আধ ঘণ্টার কথা খসাতে হয়।

আজকাল তো বশে এসেছে। কি দেখছেন বাবু। বত্রিশ সাল তো এই 'প্লাটফরামে'ই (প্ল্যাটফর্ম) হয়ে গেল। এখুন লেবর ডিপার্ট হয়েছে। আগে সেসব কিছু ছিল না। গোরা টি সি, টিশন সুপ্রেণ্টেণ্ট, মেম 'বুকিন ক্লরভি' ছিল। লেবর মানজর ছিল উ ভি এক গোরা। তো সে সাহেবের মর্জির উপর সব। আমার সঙ্গে সাহাবের ভাব তো আমি ঢুকিয়ে লিলাম আমার আদমীকে। তো তখন এত কুলিও ছিল না, প্যাসেঞ্জারও না। এখন তো খুব কড়াকড়ি আছে।

একজন দুজন তো নয়, চোদ্দশ আটাশ জন কুলি হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে। তুমি আমি মন করলুম আর ট্রেন থেকে মোট নামিয়ে পয়সা কামালুম, সেটি হবার জো নেই এখন। দুনিয়া বড় কড়া। তুমি কুলির কাজ করতে চাও? কোথায় তোমার বাড়ি? কি পরিচয়? কে তোমায় চেনে? এসব যদি জানা হল তো বেশ, দ্যাখ, লোক আর লাগবে কি না? লেবার সুপারভাইজারের কাছে যাও। এগারো নম্বর গেটের কাছে তাঁর অফিস। কণ্ট্রাক্টারের হাতেই এই

ব্যবসা। রেল কোম্পানীর কাছ থেকে তিনি এই কাজের ঠিকে নিয়েছেন। প্যাসেঞ্জাররা যাতে হয়রান না হয়, কষ্ট না পায়, তাদের কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তা দেখাই এই অফিসের কার্য। এই অফিসের দুটো হাত, এক হাতে প্যাসেঞ্জারদের মালপত্র চলাচল দেখছেন, আর হাতে খালাস করছেন পার্সেলের মাল।

কুলি ভর্তি করতে হবে এই আফিসের মারফৎ। কি নাম তোমার? বল। কোথায় ঘর? বল। কে চেনে এখানে? বল। ফটো তুলিয়েছ? দেখাও। আচ্ছা যাও। পুলিশে খবর দিই। তারা খোঁজখবর করুক তোমার বিষয়ে। রিপোর্ট পাঠাক। সন্তুষ্ট হলে খবর দেব। কাজে লেগো। অমনি অমনি কি হয়? তোমাকে লাইসেন্স করতে হবে, এই অফিস থেকে। মাসে তিন টাকা ফি। লাইসেন্স পেলে তোমার কামিজে তার নম্বর সেঁটে রেখো। তোমার বাঁ হাতেও পিতলের যে চাক্তিখানা লাগানো থাকে, সেটা কি? সেটাও লাইসেন্স নম্বর। সেটা যদি প্যাসেঞ্জার চায় তো দিয়ে দিতে পার। প্যাসেঞ্জারের মনে ভরসা বাড়বে।

আজকাল অবিশ্যি মালপত্তর খোয়া বড় একটা যায় না। আমাদের হাতে ভারটা আসা ইস্তক অনেক কণ্ট্রোলে এনেছি। লেবার সুপারভাইজারটি বললেন, পাবলিক কম্‌প্লেন হবার সংগে সংগেই আমরা তদন্ত করি। নালিশও কমে আসছে। প্যাসেঞ্জাররা যদি এক কাজ করেন তো বড়ই ভাল হয়। প্রতিটি কুলির কাছে তাদের পরিচয় দেওয়া কার্ড আছে। ওদেরকে কাজে লাগাবার আগে সেই কার্ডটি দেখে নেবেন। তাতে কুলিটার একটা ফটোও সাঁটা আছে। যদি কোন গোলমালে পড়েন, কিচ্ছু ভয় নেই, সটান আমাদের আফিসে চলে আসবেন, রাতদিন লোক থাকে প্যাসেঞ্জারকে সাহায্য করবার জন্য। কুলির নম্বরটা যদি মনে থাকে ভালই, ফটো দেখেও চিনে ফেলতে অসুবিধে হবে না, যে কি রকম কার্ড আছে। আপনার মাল নিয়ে সরে পড়েছে? রেট বেশী চেয়েছে? না কি কুকথা বলে মর্যাদাহানি করেছে? সটান এই অফিসে এসে সেরেফ নালিশটা পেঁছে দিন তো, ব্যাটার ঘাড়ে হাউ মেনি হেড্ একবার দেখে নিই। প্রতি মোট চার আনা, এই হল এখানকার রেট। প্রতি মোট মানে প্রত্যেকটা আইটেম নয়। আপনার বেডিং, ট্রাঙ্ক, জলের কুঁজো কি টুক্রি এই নিয়ে ওজন যদি এক মণ পর্যন্ত হল তো ওটাকে এক মোট ধরব। বাইরের গাড়ী থেকে ট্রেনের কামরায় পেঁছে দেবে। মজুরী চার আনা। আজ নগদ কাল ধার। এর এদিক-ওদিক হয়েছে কি নম্বরটি টুকে নিয়ে সটান চলে আসুন তো একবার। কিম্বা তারই বা কি প্রয়োজন, প্রতিটি প্ল্যাটফর্মেই টিণ্ডেল পাবেন, সর্দার পাবেন, জুনিয়র

'সার্কাস'

সুপারভাইজার পাবেন, সিনিয়র সুপারভাইজার পাবেন। তকমা-আঁটা চেহারা। একটু ঠাহর করে তাদের বের করা, ব্যস্ তারপর নালিশটি ঠুকে দেওয়া। দেখতে দেখতে ত্যাড়া ঘাড় সিধে হয়ে যাবে। বলে জোড়নে পড়লে বাঁকা কেষ্ট অব্দি কালী হয়ে যায় আর এ তো মশাই কুলি। হ্যাঃ।

. একটি বুড়ো কুলি বললে, জুলুমবাজী ভাল নয়, এটা তো সবাই জানে, হাওড়ার কুলিরা জুলুমবাজ, এটাও সবাই জানে, কিন্তু জুলুম কি সবাই করে বাবুজী? জানো, আমাদের উপর কত জুলুম হয়? তিন টাকা লাইসিন ফি মাহিনামে। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, তো কুলি ভি বাড়তে যাচ্ছে। ফটু ভি তোলাতে হচ্ছে। খর্চা ভি আমাকে দিতে হচ্ছে। পোষাক-ওষাক সব কুছ আমার। চার আনা মোট তো পেট চলবে কেমন করে। আরো খেল আছে। শুনুন। রেল কোম্পানীর পার্সেল ট্রেন থেকে 'লোডিন-আনলোডিন্' (মাল তোলা, মাল নামানো) নিয়েছে কনট্রাকটার। কোম্পানীর কাছ থেকে রুপিয়া খিঁচে লিচ্ছে, নিজের পাকিট ভরছে। আর আমরা রোজ এক এক ঘণ্টা, দো দো ঘণ্টা, তিন তিন ঘণ্টা বেগার খাটছি।

এটা জানতুম না। খুরে ঘুরে সন্ধান নিলুম। বুড়ো কুলিটা বললে, ফোকটসে খাটায় না বাবু, পয়সা দেয়। কত শুনবেন? প্রতিদিন এক ঘণ্টা খাটলে মাসে বিশ আনা। তিন ঘণ্টা রোজ খাটলে মাসে চল্লিশ আনা। আপনারা কত দেন? এক মোট চার আনা। তো কেন জুলুম হবে না? পেট কি মানবে বাবু? এত কুলি হয়েছে, তার উপর টিণ্ডাল, উণ্ডাল, সর্দার, মেট, ফলানা কে জানে কত, ওদেরকে রোজগারের হিস্যা দিতে দিতে ঘরে যখন যাব, তখন কি থাকবে আমার হাতে আর বালবাচ্চার মুখে ভি কি দেব?

একটু থাক, নিজেই দেখবে। ভাল ভাল মোট, যেখানে কিছু বক্শিস মিলবে, সে সব আপন আদমীকে দিয়ে দিবে। শালা সর্দার বনেছে। আমি একটা ভাল মোট ধরব তো তার মধ্যেও একটা আপন আদমী ঢুকিয়ে দেবে। কেন? না কত বকশিস পাই দেখতে। মাঝে মাঝে এমন ইচ্ছা হয় কি—

বুড়ো চুপ মেরে গেল। এক তকমাধারী সর্দার আসছে। বুড়োর চোখ জ্বলছিল। চোখ তো নয়, আগুনের মালসা। একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা চিমটে করে সেই মালসা থেকে তুলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে যেন তাতাচ্ছিল, লোক আসতে দেখে খপ করে তারই মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর একটু হেসে বললে, আচ্ছা, নমস্তে বাবুজী।

পারাপার

বিদেশী বেনে বহর ভেড়ালে এপারে। সুতোনুটিতে নোঙর করলে, শালকের নয়। ওধারে জল কম। জাহাজ বাঁধা সম্ভব হয় না। ' তাই শিবপুরে জুত হল না, ডক গড়ল খিদিরপুরে।

তখন চলাচল পায়ের জোরে, কি গো-গাড়ীতে, কি খট্ খটা খট্ ঘোড়ার পিঠে। এ হল ডাঙগায় ডাঙগায়। আর জলে? নৌকা, কি জাহাজ। মাস্তুলে পাল আর পালে বাতাস। খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে সাত সমুদ্রে খেয়া মার। এদেশের লোক পেঁছাও সেদেশে, সেদেশের মাল গছাও এদেশে। তাই হল। বিদেশী মুলুকের মাল এনে তুললে কলকেতায়। সুতোনুটি গোবিন্দপুর কালীঘাট তখন কলকেতা হয়ে বসেছেন। ব্যাপারে ব্যবসায়ে ফুলে ফেঁপে একেবারে বিয়ের জল গায়ে লাগা এক মেয়ে যেন। এমন চেকনাই।

এতো এপারের কথা। আর ওপার? ইংরেজের নেকনজর পড়ল না বলে দিনকতক মুখ ঘুরিয়ে রইল অভিমানে। তারপর ঘোমটা আড়াল চোখদুটো ওপারের ভরা যৌবনের বাড় বাড়ন্ত দেখতে লাগল আর হিংসে রিষেয় বুক পোড়াল। এপার কলকাতা, আর ওপার হাওড়া।

কিন্তু এমন আড়ি আর ক'দিন? ইংরেজের দৃষ্টি ওধারেও পড়ল।

নদী ডিঙিগয়ে ওপারে উঠলে। কপালে পরালে সোহাগের টিপ। সেই থেকে এপার ওপার এক হবার বাসনা পুষেছে মনে মনে। যত দিন যায় তত কাজ বাড়ে। কাজের ফিকিরে এপারের লোক ওপারে, আর ওপারের লোক এপারে নিত্য পারাপার করে। কি উপায়ে? না দিশী মাঝির পান্‌সি ভাউলের সওয়ার হয়ে। প্রধান ঘাট দুটো। এদিকে শিবপুর আর ওঁদিকে শালকের বাঁধাঘাট।

কিন্তু নদী নয়তো, সাক্ষাৎ শমন। এই বেশ শান্ত, কোথাও কিছু নেই। এই বান ঢুকল সাগর থেকে। তখন রব উঠল সামাল সামাল। কে থাকল কে গেল সে হিসেব পরে দেখো। মাঝি এখন কর পার, মাঝখানে ডুবিলে তরী কলঙ্ক তোমার। কিন্তু তরী হুঁশিয়ার মাঝির হাতেও অজস্র ডুবেছে। ধনে প্রাণে মারা গেছে কত যে অজস্র লোক তার হিসেব কে রেখেছে? ১৮৪০ সনে মানে একশ দশ-বার বচ্ছর আগেকার এক রিপোর্টে জানা গেছে, সে সময় সালিয়ানা শ-আড়াই লোক সশরীরে গঙ্গা পেতেন। গিন্নীর খোঁচায় তিতি

'সার্কাস'

বিরক্ত হাওড়ার লোকেরা তখন প্রায়ই কলকেতা রওনা দিতেন। মনোগত ইচ্ছে, অল্প খর্চায় স্বর্গে যাবার চেষ্টা করা।

ইদিকে ব্যবসা পত্তরও বেড়ে উঠতে বিঘ্ন ঘটছে। যত ফ্যাসাদের গুরু-ঠাকরুণ এই নদীটি। ওকে বাগে আনা বড় সহজ কম্ম নয়। পারাপারের সুরাহা করবার নানা ফিকির চলতে লাগল। শেষকালে আমদানী হল এক ভোঁপা কল। আঃ মানুষের কি কেরামত। বৈঠা লাগে না পাল লাগে না, কোম্পানী কি কলই বানাইছে মিঞাভাই। গলগল করে চোঙগার মুখে ধোঁয়া ছাড়ে, ভোঁ-ও ভোঁ-ও চিক্কির ছাড়ে, ঘস ঘস পানি, উথাল পাথাল করে, আর কোম্পানীর কল এপার ওপার পাড়ি দেয়। সন ১৮২৩-এর আগস্ট মাসের গল্প। এমন নাকি অদ্ভুত কল গঙ্গায় ভেসেছে। চল চল আর্মানীর ঘাটে। ছুটোছুটি লুটোপুটি। নদীর দুধার লোকে লোকে ছেয়ে গেল। কি তাজ্জব! মাঝগঙ্গায় ভাসছে দ্যাখ, যেন পেল্লায় এক পানকৌটি। প্রথম যে ইস্টিমার এপার ওপার ফেরী মারলে, তার নাম ডায়েনা।

কিন্তু কলের জাহাজও ফেল পড়ল। তখন রোয়াব উঠল পুল বানাও। হাওড়া আর কলকেতা এতদিনে অনেক নিকট হয়েছে। 'এই যে, কেমন আছেন'-এর সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়ে 'কেমন আছো'-তে এসে ঠেকেছে। এতেও চলছে না। এবার দৃঢ়বন্ধন চাই। খেপ মারা কাজে প্রাণ ভরছে না আর, আকাঙ্ক্ষা মিটছে না।

এক পুল বানাবার তোড়জোড় শুরু হল। তোড়জোড় নয়, কথাবার্তা। মাঝে মাঝে বাতচিৎ হয় আবার চাপা পড়ে যায়। গভর্নর সাহেবের খানা টেবিলে খোসগল্পের ফাঁকে কেউ হয়ত কথাটা তুলে বসেন। বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। খাওয়াটা বেশ জমে। খাওয়া শেষ তো কথারও ইতি। আর মাঝে মাঝে বাগড়া মারে, এই দিশী জাঁদরেল বাবুরা। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবুও বটেন প্রিন্সও বটেন, সে আমলের এক প্রধান চাঁই, হুগলীর নদীতে পুল চাই বলে সোরগোল তুললেন। ফাঁকা আওয়াজ নয়, টাকার আওয়াজও শোনাতে রাজী হলেন। বাবু জয়কেষ্ট মুখুজ্জেও তাঁর দোহারকি করলেন।

সন ১৮৪৪-এ রেল বসল। সব প্রথমে হাওড়া থেকে হুগলী। তার পরের বছর রেল পৌঁছুল রাণীগঞ্জ। তার সাত বছর বাদে কাশী অবধি পৌঁছে গেল। তারপর আরো দূর দূর চলে গেল। দেশ থেকে দেশে। এদ্দিন হাওড়া ছিল কলকেতার মুখের দিকে চেয়ে। এবার তার আপন মূল্যে নিজের গরব।

চোখ বুজে আর থাকা যায় না। রেল আসা না পৃথিবী আসা। খেয়া

ইস্টিমার আর পানসি ভাউলেতে পৃথিবী আঁটে কখনো! পুল চাই, পুল। মানুষ যাবে, মাল যাবে, গাড়ী যাবে। তার ব্যবস্থা করছ কোথায়?

পুল হবে? কেমন পুল গো? ঝোলা সাঁকো না ভাসা সাঁকো? প্রথমে কথা হল ভাসা পুল হবে। তার পরক্ষণেই আবার কর্তাদের মতি বদলাল। বললেন, ভাসা পুল নয়। ঝোলা পুল হবে। ১৮৫৫ থেকে ১৮৭১ এই ষোল বচ্ছর ধরে খালি জল্পনা-কল্পনা চলেছে। পুলটা ঝুলবে না ভাসবে?

পুলটা ভাসলই শেষ পর্যন্ত। বড় বড় কর্তাদের সব ভাবনার শান্তি হল ১৮৬৮ সালে। ঠিক হল বেড়াল ঘুমাক আর জাগুক ঘণ্টা বাঁধা এবার হবেই তার গলায়। কে এমন মন্দ আছে এই দিগরে? কে বাঁধতে যাবে ঘণ্টা? কেন, সরকার। সরকারই শেষ পর্যন্ত কাজটা হাতে নিলেন। ঠিক হল একটা ট্রাস্টের হাতে ব্যবস্থা বন্দোবস্ত তদ্বির তদারকের ভারটা দেওয়া হবে।

তখন বাঙলার তখ্‌তে রাজ্যপাল নন, গদীয়ান আছেন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নর। তাঁকেই ভার দেওয়া হল ঝক্কি সামলানোর। টাকা জোগাবেন, পুলে যাবার পথ তৈরী করাবেন, খর্চাটা যাতে উঠে আসে, মাথট বসিয়ে তার ব্যবস্থা করবেন। কাজ কি একটা যে এক কথায় হিসেব লেখা হয়ে যাবে। পুল বানাবার যোগাড় না হয় করা গেল, সে পুল সঠিক রাখবে কে? মেরামত করবে কে? কেন পোর্ট কমিশনার। তার উপরই ভার পড়ল হেফাজতের। একেবারে এর জন্য এক আইন বানিয়ে সেই আইন মোতাবেক হাওড়াপুলের সারাজীবনের জিম্মা দিয়ে পোর্ট কমিশনারকে বলা হল, প্রতিগৃহ্যতাম্। পোর্ট কমিশনার বলে উঠল, প্রতিগৃহ্যামি।

জায়গা নিয়ে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উঠেছিল। কিন্তু এদিকে ডালহৌসী স্কোয়ার ততদিনে জেঁকে উঠেছে, আর ওদিকে হাওড়ার ইস্টিশান। যেই কেউ শালকে শিবপুরের নাম করে আর হাওড়া ডালহৌসী গর্জে ওঠে, মোদের দাবী মানতে হবে। তাই হলো। মল্লিক ঘাটের আড়পারই হচ্ছে হাওড়ার ইস্টিশান। এরাই শেষে এপারে ওপারে মিলনের ঘটকালি করলে।

স্যর ব্র্যাড্‌ফোর্ড লেস্‌লী। ভাঙন নয়, গড়নের কারিগর। তাঁরই কেরামতীতে নদীতে বাঁধন পড়ল। ভাসা পুল এপার ওপার ডাঙ্গায় ডাঙ্গায় জুড়ে দিলে। ১৮৭৪ সালের অক্টোবর মাসে, আজ থেকে ঊনআশী বচ্ছর আগে সব প্রথম কলকেতার লোক হাবড়ায় আর হাবড়ার লোক কলকেতায় পায়ে হেঁটে পার হল। দুনিয়ার কাছে কলকেতার দরজা হাওয়া হয়ে খুলে গেল। পুল বানাতে টাকা লাগল বাইশ লাখ।

'সার্কাস'

বড় বড় জাইগাণ্টিক নৌকোর উপর পুলখানা বসানো। মাঝখানটা, চিচিংফাঁক, তো খুলে গেল, উত্তরের গঙ্গায় বন্দী হয়ে যেসব জাহাজ ইস্টিমার ফোঁস ফোঁস ফুঁসছিল, তারা দক্ষিণে সাগরে গেল, নৌকো, কিস্তি, বোট, গাধাবোটও সুট সুট করে তাদের পিছু পিছু রওনা দিলে। দক্ষিণ থেকে আগত যারা পুল খোলার অপেক্ষায় গঙ্গার জলে চিৎ হয়ে (আকাশে কড়িকাঠ নেই, গোনার অসুবিধে) দুদণ্ড ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন, মওকা পেয়ে তাঁরা উত্তর দিকে রওনা দিলেন।

মানুষ যাবে, তো জাহাজ ইস্টিমারের এধার ওধার যাতায়াত বন্ধ কর। জাহাজ ইস্টিমার যদি ছাড়লে তো মানুষকে আটকাও। নোটিশ পড়ল, বেলা অত ঘটিকা অত মিনিট হইতে অত ঘটিকা অত মিনিট পর্যন্ত হাওড়ার পুল খোলা থাকিবেক। সেই সময় মধ্যে যাবতীয় গমনাগমন বন্ধ। পোর্ট কমিশনারের আদেশানুসারে।

আ খেলে যা। টেলিগেরাপ এসেছে মশাই, ছেলে মর মর, দুটো সাঁয়ত্রিশের ট্রেন না ধরলে পেঁছুতে পারব না। আর আপনি পুল খোলবার টাইম পেলেন না! গমনাগমন বন্ধ বলে তো মুখ ঘুরিয়ে বসে আছেন, এখন আমি করি কি, একটা বিহিত কিছু করুন? বিহিত করবার আর আছে কি, নৌকোয় পার হয়ে চলে যান। অগত্যা। আবার সেই নদীর হাতে প্রাণ সমর্পণ।

১৯০৬ সালের জুন অবধি এমন চলেছে। তখন দিনের বেলাতেই পুল খুলে জাহাজ নৌকা পাশ করতো পোর্ট কমিশনার। জুন থেকে ব্যবস্থার বদল হল। ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য গভীর রাত্রে হাওড়ার পুল খোলা হত। কলকেতার লোক ভুলেই গেল যে এ পুল খোলা হয়। শুধু ক্বচিৎ কদাচ শেষ ট্রেনখানা বেজায় লেট থাকলে তার চড়নদারেরা সে রাত্রে আর কলকেতায় পেঁছুতে পারত না। এসে দেখত মাঝখানের পণ্টুনখানাকে টেনে নিয়ে একপাশে রেখেছে, আর পিল পিল করে জাহাজ ইস্টিমারের স্রোত এধার ওধার যাতায়াত করছে। ভোঁ ভোঁ শব্দে সে তল্লাট তখন সরগরম।

শুধু পুল খোলা আর বন্ধ করার জন্যই নয়, অসুবিধে আরো বাড়তে লাগল। লম্বায় ১,৫২৮ ফিট, গাড়ীঘোড়া চলার রাস্তা চওড়ায় ৪৮ ফিট আর লোকচলার রাস্তা চওড়ায় কুল্লে সাত ফিট। এই তো ভাসা পুলের বহর। গাড়ী ঘোড়া মনিষ্যি বাড়ছে তো বাড়ছেই। ওইটুকু চওড়া স্থানের মধ্যে তা আর ধরে না। বড় পুল চাই। আবার চাই চাই দাবী উঠল।

'সার্কাস'

এবার আর ভাসা পুল নয়। ঝোলা পুল। একজনকে থামিয়ে আরেক-জনের যাওয়া নয়, এমন পুল বানাও যাতে একই সংগে সবাই যাবে, উপরে ডাঙ্গার বাহন, নিচে জলের যান।

১৯৩৬ সালে বাঙলার সরকার আবার নড়ে বসলেন। এক বিলাতী কোম্পানীকে ঠিকে দিলেন। ক্লিভল্যান্ড ব্রিজ এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানী লিমিটেড ঝোলা পুল বানাবার ভার পেলেন। বিস্তর টাকার মামলত। ১,৬০৫,০০০ ষোল লক্ষ পাঁচ হাজার পাউন্ড। এক পাউন্ড ভাংগালে দিশী টাকায় ফেলে ছেড়েও তের টাকা মেলে। চোখ একেবারে চড়ক গাছে উঠে পড়বে স্যার, হিসেবটা কষলে।

কি পেল্লায় ব্রিজ! য্যায়সা লম্বা ত্যায়সা চওড়া। ভেতরে ঢুকলুম না যেন আস্ত এক শহরের মধ্যে সেঁধিয়ে গেলুম। যেন ময়দানবের শহর। উঁচু দিকে চাই তো ঘাড় মটমট করে। এপার থেকে ওপার হল ১৯০০ ফুট। ঝোলাপুলের কেলাসে হাওড়ার পুল পৃথিবীর মধ্যে থার্ড। আর চওড়াও কি কম নাকি? দুই ফুটপাথের মাধ্যিখানের ফাঁকটাই হল সত্তর ফুট। ফুটপাথ পনের ফুট। আর দুই তীরে ওই যে দুই চুড়ো আকাশে গিয়ে ঢুঁ মারে, তার এক একটাই হল গিয়ে তিন শ ফুট উঁচু।

ওই অত উঁচুতে বসেই এক ভদ্দরলোক পা ঝুলিয়ে জোছনা রাতে মনের সুখে তান ধরেছিলেন। তারাগুলোকে গান শোনাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দুষ্ট লোকের প্রাণে তা সইবে কেন? কারা যেন টের পেয়ে পুলিশে খবর দিলে। তারপর হৈ হৈ। নাম, নাম। পড়ে যাবেন মশাই। পড়ে গেলে মরে যাবেন, ওখান থেকে মরলে আর বাঁচতে হবে না। কিন্তু কে শোনে? কে ভ্রূক্ষেপ করে সে কথায়? ওই উপরে, ফুরফুরে হাওয়ায় যার প্রাণের পুলক পেখম মেলেছে তার কাছে কি তুচ্ছ কথার পুচ্ছ নাচানি ভাল লাগে। যে চেঁচাচ্ছে চেঁচাক। ভদ্দরলোক আকাশ পানে গান ছুঁড়তে লাগলেন, সাঁঝের তারকা আমি পথ হারায়ে এসেছি ভুলে। শেষকালে দমকল ডেকে এই পথভোলা পথিককে পথে নামাতে হয়। তারপর বোধ হয় রাঁচীর ঠিকানায় চালান দেওয়া হয়েছিল, ঠিক মনে নেই। আরেকবার দুই বন্ধু শহরের গরমে টিঁকতে না পেরে হাওড়া ব্রিজের মাথায় চেপেছিলেন দুহাত তাস খেলতে। দমকল তাদেরও নামিয়েছিল। পরে জানা গেল সেটা কড়া সিদ্দির এফেক্ট। আরো জনা তিনেককে পুলিশ ওঠবার আগেই ধরে ফেলেছিল।

'সার্কাস'

কেন এমন হয়? কার হাতছানি এরা পায়? এদের নিয়ে এ রহস্য ব্রিজটা কেন করে? জানেন? আমি জানিনে।

তবে এটা জানি হাওড়ার নতুন এই প্রকাণ্ড ব্রিজটি প্রথম খোলে ১৯৪৩ সালের পয়লা এপ্রিল নয়, পয়লা ফেব্রুয়ারী।

ঘাটপাণ্ডা

ঘুম নয়। যেন নাছোড় কাবুলী। লাঠি ঘাড়ে চোখের দরজায় বসে থাকে। পাওনা না চুকিয়ে বিদেয় করে সাধ্য কার? উঠতে মন আরো আগে। রাত্তির তার ডিউটি খতম করে সেই যে সময়ে 'কল-বয়' পাঠায় দিনের কাছে, ('কল-বয়' কি? রেল কোম্পানীতে কাজ করা থাকলে আর বিত্তান্তটা ব্যাখ্যা করতে হত না। রেলের গার্ড কি ইঞ্জিন-ড্রাইভার কি ক্রু-বাবু মানে চেকার, তাদের যখন গভীর রাতে কাজে বেরুতে হয়, তখন সময় হিসেব করে এক লোক ছোটে তাঁদের ঘুম ভাঙাতে। এই যে ঘুম ভাঙানো খোকা, একেই বলে 'কল-বয়') গঙ্গা থেকে সেই সময়ে কেমন এক নতুন হাওয়া ভেসে আসে, বড়বাজারে একটি রা নেই, হাওড়ার পুল জোর-বাতির একনরী হার গলায় পরে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে, ওপারে হাওড়া ইস্টিশানের একচোখো ঘড়িটা কাঁটা দিয়ে টু মেরে মেরে ওপারের সময়কে এপারে এনে ফেলে যখন, মন চায় তখনই ওঠে। কিন্তু আলিসা, কিন্তু কুঁড়েমি। বেঞ্চের উপর চাটাই মাদুর, তার উপরে একটা বিছানামত, তার উপরেই দেহখান। ভোরের হাওয়ায় ঠাণ্ডা লাগে তো আধখানা বিছানাই জড়িয়ে নাও গায়ে। কিন্তু না, এইবারে ওঠো। গান শোনা যাচ্ছে প্রভাতী বুড়োর। নাইতে আসছে, তার মানেই চারটে বাজে।

প্রভাতী বুড়োর থেকে ভোরে আর কেউ নাইতে আসে না। ওই হল ঘাটপাণ্ডাদের 'কল-বয়'। বড়বাজারের ঘাটে চল্লিশটে ঘাটপাণ্ডা। যজমানরা নাইতে আসবেন। শুকনো-সাকনা কাপড়-জামা সঙ্গে থাকে, সেগুলো রাখবার ব্যবস্থা কি? না ঘাটপাণ্ডার টুকরী। জুতো খুলে রাখুন ওর আলমারীটার মধ্যে, জামা-কাপড় টুকরীতে। তারপর নিশ্চিন্তে নেমে যান গঙ্গার শীতল গর্ভে। চানটান সেরে উঠে আসুন। নিশ্চিন্তে এগিয়ে যান ঘাটপাণ্ডার কাছে। ওর এলাকার চাটাইয়ে দাঁড়িয়ে ভিজে কাপড়টি ছেড়ে রেখে শুকনো কাপড় অঙ্গে পরুন। চান করেই প্রসাধন। ব্যবস্থা আছে। আর্শি আছে, চিরুণী আছে। চুল আঁচড়ে মুখ দেখুন। ফাঁকা ফাঁকা ঠেকলে তিলক-মাটির ছাপ লাগিয়ে নিন, চন্দনের প্রলেপ লাগান মুখে। আর্শিতে মুখের ছায়ার চেহারা দেখে মালুম করুন, বাহার খুলল কেমন।

'সার্কাস'

যজমান একবার আসতে শুরু করলে আর ফুরসৎ কোথায়? তাই নিজের কাজ সেরে রাখতে হয় সেই প্রত্যুষকালেই। শুধু তো টুকরিই নয়, টুকটাক আরো দ্রব্য রাখতে হয়। ধরুন দাঁতনকাঠি। অত ভোরে যজমান আসবে, এসেই এক কাঠি দাঁতন চাইবে। যদি দিতে না পারলুম তো জগন্নাথ জানেন, ও খদ্দের আর আমার বাক্স-মুখো হবে না। একা তো নই, এই যে ঘাটটুকু দেখছেন, এই বড়বাজারের ঘাট, এখানে চল্লিশটে পাণ্ডার পারমিশন আছে। তার বেশী আর একজনেরও বসবার হুকুম নেই। বিনা হুকুমে কেউ বসবে? পোর্ট কমিশনারের রেজিস্টার্ড গোমস্তা আছে কি করতে। রিপোর্টটি করে দিলেই ঘাড় ধরে সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বের করে দেবে।

আইন বড় কড়া। ইচ্ছেটা খুস খুস করল আর একটা বাক্স নিয়ে ঘাটে এসে পাণ্ডা হয়ে বসলুম, সেটি হচ্ছে না। পাণ্ডা হতে চাও, তো পোর্ট কমিশনারকে দরখাস্ত কর। সব লিখে জানাও, কি নাম, সাং মোং (সাকিম মোকাম) কোথায়, কে তোমার বাপ, পাণ্ডাগিরি ক'পুরুষ ধরে করছ ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর সে দরখাস্ত পোর্ট কমিশনারকে পাঠাও, সেখান থেকে হুকুম পেলে তবে বাক্স পেতে বসতে পার।

যারা আছে এখানে, সবাই বনেদী। কেউ দু'পুরুষ, কেউ চার পুরুষ কাটালে এই চানের ঘাটের শানে বসে। বাঁধানো ঘাটের মেঝেতে আমরা আর কার্নিশের খাঁজের ওই পায়রাগুলো বনেদিয়ানায় এক বয়েসী।

যদি একেবারে দক্ষিণ থেকে ধরেন তো কালীঘাট। খুব পুরানো ঘাট। চান করলে অক্ষয়-পুণ্যি। তাই খদ্দেরপাতি ওখানে বেশী। পাণ্ডাদেরও দু'পয়সা হয়। তারপর চাঁদপাল, প্রিন্সেপ্, আর্মানীঘাট, বাবুঘাট, এদিকে এই বড়বাজারের ঘাট, গোয়েঙ্কার ঘাট, হাওড়ার পুল ছাড়িয়ে জগন্নাথ ঘাট, আহিরীটোলার ঘাট, বাগবাজারের ঘাট—এগুলো নাম করা। পাণ্ডাও আছে।

বাবা এই ঘাটে সারাজীবন পাণ্ডাগিরি করে দেহ রেখেছেন। তাঁর বাবাও এই ঘাটে জীবনপাত করেছেন। এই যে চন্দনের বাটি দেখছেন এটা বাবার, এই যে তিলক-ছাপ দেখছেন এটা ঠাকুরদাদার। বহুদিন এসব বাক্সে ভরা ছিল। জোয়ান বয়স, ভাবলাম কি, ঘাটে আর বসব না। কাকাকে বাক্সটাক্স দিয়ে এধার-ওধার ঘুরলাম। দু-চারটে কাজও করলাম। কিন্তু ভাল লাগল না। দু'চার বছর পরে কি মনে হল, পোর্ট কমিশনারে দরখাস্ত করে হুকুম নিয়ে নিলাম। এখন তো পঁচিশ বছর হয়ে গেল।

'সার্কাস'

মাঝখানে পোর্ট কমিশনার বললে, 'লাইসেন' দিতে হবে। এমনি খেতে পয়সা পাইনে 'লাইসেন' কোথা থেকে দেব, খুব গোলমাল হল। যজমানদের গিয়ে ধরলাম। তারা বললে পোর্ট কমিশনারকে, বাপ-দাদার আমল থেকে যেমন চলছে, তেমনই চলবে। পাণ্ডাদের কাছ থেকে পয়সা-টয়সা নেওয়া চলবে না। যজমান সব ভারী ভারী আছে কিনা। তাদের কথা পোর্ট কমিশনার ঠেলতে পারে না।

শুনুন তবে এক মজার গল্প। আর্মানীর ঘাটটা শীলবাবুরা বানিয়ে দেন। এ গল্প আমার বাবার মুখে শোনা। সেই তখনকার আমলেই খর্চা হয়েছিল প্রায় লাখ টাকা। অমন মজবুত ঘাট। তা পোর্ট কমিশনার বললে, ওখানে গুদোম বানাবো। শীলেদের মত চাইলে। তাঁরা বললেন, বেশ, আমাদের আপত্তি নেই। তবে কি না যেমন ঘাটটি ভাঙবে, অবিকল সেই নক্সামত আরেকটি ঘাট বানিয়ে দিতে হবে। ব্যস্, একথার পর পোর্ট কমিশনার ঠাণ্ডা।

বাবুরা ঘাট বানিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ ছেড়ে দিয়েছেন পোর্ট কমিশনারের হাতে। ঝাড়ুদার খরচা, লাইট খরচা সব তার। ঘাট পাবলিকের পাঁঠা বটে, তবে ল্যাজের দিকে কাটবার কোন উপায় তার নেই। চান করতে পুরুষ আসছে, মেয়ে আসছে। তাদের দেখে কেউ খিস্তিখাস্তা বেমালুম চালিয়ে যাচ্ছে, এ দৃশ্য যদি ইন্সপেক্টরের নজরে একবার পড়েছে তো যার এলাকায় এসব হচ্ছিল, সেই পাণ্ডার দফা গয়া হয়ে গেল। এখানে যত পাণ্ডা, তত নম্বর। আমার নম্বর সতের। যদি আমার এখানে কোন বেচাল, বেয়াদপি ধরা পড়ে তো আমার পাণ্ডাগিরি একেবারে ঠাণ্ডা।

ওই যে দেখছেন, কোণের দিকে এক ছোকরা বসে আছে, ওর বাবার নামে ছিল পারমিশন। অফিস-ফেরতা কেরানীবাবুদের কেউ কেউ ওর কাছে আসতেন। ওর কাছে গাঁজা-টাজা সব থাকত। বাড়িতে অফিসে লজ্জা করে, এই ঘাটের ঘুপসীতে বসে দুটান তাই দিয়ে ঘরে ফিরতেন। পড়বি তো পড় একদিন ইন্সপেক্টরের মুখোমুখি। ব্যস্, আর যাবে কোথায়? হয়ে গেল। শেষে অফিসে হাঁটাহাঁটি দৌড়-ঝাঁপ। কিছুতেই হল না। বুড়ো তো পাগল হয়ে উঠল। তারপর একদিন না-পাত্তা হয়ে গেল। ছেলেটা ছিল নাবালক। সেই শেষ পর্যন্ত নম্বরটা পেল। তবে নিয়ম হচ্ছে, নাবালকের গার্জিয়ান-স্বরূপ কেউ না থাকলে রেজিস্টার্ড গোমস্তাই টাকাকড়ি উসুল করে দেয়।

রোজগার আর কত হয় আমাদের? বড় জোর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা

মাসে। যজমানদের কাছে বাঁধা বরাদ্দ আছে। সেই যা ক'টা পয়সা মাস গেলে আসে। নগদ খদ্দেরে আর কত হয়? রোজ দু-চার-পাঁচ আনা।

তবে যাকে তাকে ডেকে ভরসা পাইনে। কত রকম যে ফিকিরবাজ লোক আসে, তার কি ঠিক আছে? একবার হল কি? দুজন লোক এল চান করতে, নতুন লোক। জামা-কাপড়ের নমুনা দেখে তো আমাদের জিভ্ লক লক করে উঠল, এ-শাঁস কার কাছে যায়? আসুন আসুন বাবু! সবাই টুকরি এগিয়ে দেয়। শেষে একজন তো পাকড়াল। বাকী সবাই তাকে পারে তো চোখ দিয়ে গিলে খায়। জামা-কাপড় খুলে, গামছা এনেছিল সঙ্গে, তাই পরে তো চান করতে গেল। ফিরে এসে জামা-কাপড় পরেই একজন চেঁচিয়ে উঠলে, আমার টাকা? আরেকজন চেঁচালে, আমার সোনার বোতাম? দ্যাখ দ্যাখ করতে করতে বিস্তর লোক জমে গেল। পাণ্ডাকে ধরে এই মারে তো এই মারে। সে বেচারার তো হয়ে গেছে। হৈ-চৈ শুনে পুলিশ এসে তো ধরে নিয়ে গেল তাকে। দু মাস সাজাও হল। পরে জানা গেল, পাণ্ডা নির্দোষ। যার সোনার বোতাম চুরি গিয়েছিল, কারসাজিটি তার। সে নিজেই এক পাকা চোর। বন্ধুর টাকা গাপ করে সরে পড়ার চেষ্টায় কেসটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ভাগ্যি ভাল যে শয়তানটা ধরা পড়ে গেল। আর একবার এক চোর, আরেকজনের কাপড় পরে পালিয়ে গেল, আর সে কাপড়ের দাম দিতে হল বেচারা পাণ্ডাকে।

তবে আরেকটা ঘটনা বলি। এক অর্ধোদয় যোগে, এই ঘাটে, দুজন ভদ্দরলোক এলেন, আর তাঁদের সঙ্গে এক বৌ। চান করবেন। ও'দের দুজনে আমার কাছে এলেন। টুকরি এগিয়ে দিলাম। ও'রা জামা-কাপড় ছাড়লেন। বৌটিকে মেয়েদের ঘাটে এক পাণ্ডার হাতে তুলে দিয়ে এলাম। তারপর বসে আছি। তিন ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল। দুজনের একজনও এল না। চার ঘণ্টা পরেও না। আর এলোই না। কি বলব বাবু। খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মেয়েদের ঘাটের পাণ্ডারও সেই দশা। আর বিলম্ব না করে পুলিশে খবর দিলাম। পুলিশ জামা-কাপড় নিয়ে গেল। পয়সা কড়ি নাকি অনেক ছিল। কিন্তু পুলিশও বের করতে পারল না। সবাই বললে, মরে গেছে। তিন-তিনজন একসঙ্গে মরল, একটু আশ্চর্য লেগেছিল। তার চার-পাঁচ বছর পরে, পুরী গিয়েছিলাম, সেইখানে সেই বৌটিকে দেখেছি বাবু, অন্য এক ছোকরার সঙ্গে। কি তাজ্জব।

এখন তো এইরকম দেখছেন। মেয়ে ছেলে একসঙ্গে চান করছে। সেকালে

এমন পারত না। আমার বাপ একটা ঘটনা বলেছিল, সেটা বলি শুনুন। সে অনেক দিনের ঘটনা। আমার ঠাকুর্দা তখন পাণ্ডা। বাবা ছেলেমানুষ। গঙ্গার ঘাটে তখনো এমন কোঠা ওঠেনি। পাণ্ডারা বসত ঘাটের কিনারে। যার যার বড় বড় ছাতা ছিল, সেই ছাতা দিয়ে রোদ আটকাতো। বিষ্টিকালে ভিজতেই হত। তখন শহরে এত মানুষ ছিল না। তেমন জলেরও ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। দূর দূর থেকে আসত সব গঙ্গা নাইতে। তখন তো এখনকার মত এত মোটর-গাড়ি-টাড়ি হয়নি। টমটম ফিটন ছিল, পাল্কী ছিল কোন কোন বাড়িতে। বাবুরা আসতেন টমটম, কি ফিটন, কি পাল্কী-গাড়ি করে। আর অন্দরের মেয়েছেলেরা আসত পাল্কী চড়ে। সেই অন্দর মহল থেকেই তারা পাল্কীতে উঠে দরজা বন্ধ করে দিত, পাছে কেউ দেখে ফেলে। আর গঙ্গার ঘাটে এসেও পাল্কী থেকে নামত না। বেয়ারাগুলো সেই দরজা বন্ধ পাল্কী গঙ্গার জলে ডুবিয়ে আবার বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেত। এই ছিল সেকালের নিয়ম।

আমি যখন গঙ্গার ঘাটে গেলুম, তখন স্নানার্থীর ভিড় চারদিকে গিসগিস করছে। ফাঁকে ফাঁকে পাণ্ডার সঙ্গে আলাপ জমালুম। পুরুষ ঘাটের পৈঠায় দু-তিনটে হিপোপটেমাস রোদ পোয়াচ্ছে? না, হিপো নয়, পালোয়ানের পো। সব্ব অঙ্গে কাদা মেখে জাঙ্গিয়াসার চেহারাগুলো আরামের আমেজে তা দিচ্ছে। ওপাশে একজন উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে আছে, আর চটাস-পটাস ঘাড়ে গর্দানে তৈলমর্দন চলেছে। একপো তেল চার আনা, সেদিন আর নেই। তেল মাখার লোকের অভাব পড়ে গেছে। মালিসের ব্যবসা ক্রমেই মন্দা।

তেল যাঁদের দিতে হয়, তাঁরা নদীতে আসেন না, তাঁরা এখন সরকারী গদীতে। তাঁদের নাগাল এদের হাত পাবে কেমন করে?

জীবন সংগ্রামে

চকাচ্চক, বাবু

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েছিলুম। জামাটা কাপড়টা বদলাতে খুব একটা সময়ের বাজে খরচা করিনি। হনহন করে পা চালিয়ে শ্যামবাজারের পাঁচ মাথাটায় পোঁছে ঘড়ি দেখে বুঝলুম তাড়াতাড়ি করা ভুল হয়েছে। সময় যথেষ্ট আছে।

—"এই যে বাবু চকাচ্চক। আসুন পালিশ করে দিই। আয়না করে দিই। মুখ দেখতে দেখতে বাড়ী চলে যান।"

ছোকরাটাকে দেখে আকৃষ্ট হলুম। জুতোটারও অবশ্য সংস্কারের দরকার ছিল। পা এগিয়ে দিলুম ওর কাঠ-বাক্সটার উপর। বাক্সটা ছোট্ট। একটা সাধারণ প্যাকিং বাক্স কেটে এটা তৈরী। তিনটে শিশিতে তিন রঙের গোলা রঙ (ওর মতে ভাল কালি)। লাল, কালো আর সাদা। তিন-চারটে বুরুশ। একটা একটু ভালো। বাকী কটা রোঁয়া ওঠা। দুটো 'কিউই' বুট পালিশের বড় কৌটা, একটা "চেরী ব্লসমে"র তিনটে 'কোবরা'র, ফণা ওঁচানো পরিচিত গোক্ষুর বন্ধুটি, একটা "টিয়াপাখী" আর গোটা কয় বকলসধারী "কুকুর" আর দু খণ্ড, বহুতর রঙে ছোপানো মেটে মেটে কাপড়ের টুকরো, আর কর্মঠ সততচঞ্চল দুটো ছোট ছোট হাত। ওর ব্যবসার প্রধান পুঁজি এই।

ওর বাক্সের উপর লাগানো ঢালু কাঠখানার ওপর আমার একখানা পা রাখলুম। ছেলেটি একটু ঝুঁকে পা-খানাকে টেনে নিলে। একবার গোড়ালী আর ডগা ধরে নেড়ে চেড়ে সুবিধে মতো বসিয়ে নিলে। তারপর শুরু হল ওর কাজ।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ খুব জোর একটা হাসির আওয়াজে চোখ ফিরিয়ে দেখলুম ছোকরাটি চোখ টিপে পাশের ছোকরাটিকে হাসতে মানা করছে। ওর ঠোঁটে দুষ্টুমীভরা হাসিটি হাল্কা চালে এধার-ওধার আনাগোনা করছে। আর পাশের ছোকরাটি মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে আর হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। —হোঃ হোঃ হোঃ—

'সার্কাস'

১

—"গিরধারী, অ্যাই গিরধারী খামোশ। চুপ কর।" যথাসম্ভব আমার নজর বাঁচিয়ে ওকে বারণ করতে করতে আমার পায়ে বুরুশ ঘষছে।

—"হোঃ হোঃ হোঃ আরে বাপ্।"

আমি হঠাৎ জিগ্যেস করে বসলুম, "কি হয়েছে?"

—সঙ্গে সঙ্গে গিরধারীর হাসি বন্ধ হয়ে গেল। এই ছোকরাও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে শুরু করে দিলে। আমার কেমন সন্দেহ হল। আবার জিগ্যেস করলুম, "কিরে হাসছিলি কেন, এই গিরিধারী।" ছোকরাটি যেন আমার কথা শুনতেই পেলে না। পথচারীদের দিকে অধিক মনোযোগ দিলে।

—"পালিশ বাবুজী? আসুন।"

কিন্তু কিছু যে একটা লুকোচ্ছে এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। আমারও কেমন রোখ চেপে গেল। জানতেই হবে ব্যাপারটি কি? শেষ পর্যন্ত আমার কৌতূহলই জয়ী হল। ছোকরাটি যথেষ্ট অনুতপ্ত হয়ে বললে, "গিরধারীর কোন কসুর নেই বাবুজী। আমি ওকে বললুম, বাবুদের চোখ দুটো বিবিদের চোখে থাকে। শাদী না হলে বাবুদের চোখ ফোটে না। আর এ বাবুর এখনও চোখ ফোটে নি। তাই ও হাসতে শুরু করল।"

ওর কথার ধরনে আমিও হেসে ফেললুম।—"কি করে জানলি আমি শাদী করিনি?" আমার কথায় কৌতুকের সাড়া পেয়ে ও সাহস পেল। খুশীতে ওর চোখদুটো ইঁদুরের চোখের মতো চকচক করে উঠল।

"সে আমি বুঝলুম।"

"কি করে বুঝলি?"

দার্শনিকের মতো বলে উঠল, "বাবু আপনার জামা কাপড় কত পরিষ্কার, আজকেই বদলি করেছেন হয়ত। কিন্তু জুতোটায় সাত-আট দিন কালি পড়েনি। বিবি থাকলে এমনটি হত না।"

ছোকরাটির কথায় বিস্মিত হলুম, বড় জবর চোখদুটি তো! চকচকে চঞ্চল দুটো চোখ, মুখখানা ময়লা, তবু বুদ্ধিদীপ্ত। ছোট কপাল আর খাড়া চুলে উদ্ধত স্বাধীনতার ছাপ মারা। কালি লেগে লেগে চুলের রং বাদামী হয়ে গেছে।

"তোর নাম কি?"

"আপ্পা রামাইয়া।"

"ঘর কোথায় তোর?"

"গুন্টুর জেলা।"

'সার্কাস'

তারপর ধীরে ধীরে শুরু হ'ল এক ইতিহাস। ছোকরাটির বয়েস বছর ১২।১৩ হবে। সাত বছর আগে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় আসে। তারপর মা ওকে ছেড়ে চলে যায়। কষ্ট করে দিন কাটতে থাকে, বেশীর ভাগ সময়ই ভিক্ষে করে খেয়ে আর ফুটপাথে, প্ল্যাটফর্মে শুয়ে। ভিক্ষের রোজগারের স্থিরতা নেই, নিশ্চয়তা নেই। চেষ্টা করতে থাকে ভালোমতো রোজগারের। এমন সময় ওর নজরে পড়ে ওরই সমবয়সী একটা ছেলের দিকে।

রামাইয়া চৌরঙ্গীতে ঘুরছিল সেদিন। তখন লড়াই-এর মরশুম। সাহেব, কালা সাহেব ফৌজে সহর ছাওয়া। সেই ছেলেটি এমনি একটা বাক্স পেতে বসে একটা সাহেবের জুতো পালিশ করছিল। সাহেব ঠন্ করে একটা আস্ত টাকা ফেলে দিলে। আরে ব্বাবা! একটা টাকা! রামাইয়া ছেলেটির কাছে গেল। তার সঙ্গে ভাব করলে, বন্ধুত্ব পাতালে। সে-ই ওকে এক আড্ডায় নিয়ে গেল। সেখানে সর্দারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে সর্দার সব কথা শুনে ওকে দলে ভর্তি করে নিলে। চুক্তি হল, ওর সারাদিনের রোজ-গারের অর্ধেক সর্দারকে দিতে হবে। তার বদলে সর্দার ওকে দেবে বাক্স, বুরুশ। কালি ওকে কিনে নিতে হবে। সে পয়সাও অবশ্য প্রথমটায় সর্দারই ওকে দিয়েছিল ধার হিসেবে। টাকায় দু' আনা হিসেবে সুদও নিত আগেভাগে আদায় করে। প্রথম প্রথম অসুবিধে হত। হাত চলত না। কাজ ভাল জানত না, কালির ভালমন্দ বুঝত না। কালি লাগাবার কায়দা জানত না। তবে রক্ষে এই যে, সেটা লড়াই-এর সময়। কাজ কিছু না কিছু জুটতোই। না খেয়ে থাকতে হত না। তবে মাসখানেকের মধ্যেই কাজ রপ্ত হয়ে গেল। লজ্জা ভাঙলো। রোজগারও বাড়লো। একদিন ওর পাঁচ টাকা রোজগার হয়েছিল। অবিশ্যি সে একদিনই। নইলে রোজানা কামাই ছিল আড়াই টাকা, দু'টাকা। সর্দারকে দিয়ে কালিটালি কিনে দিন এক টাকা, বারো আনা থাকত। লড়াই খতম হল। সাহেবরা দেশে চলে গেল আর ওদেরও কপাল পুড়লো। এখন সারাদিন আট আনা রোজগার হয় কি না হয়।

ওর খুশীভরা চোখ দুটো বিষণ্ণ হয়ে আসে। গোটা শরীরের ওপর পড়ে ক্লান্তিক্লিষ্ট এক ছায়া। কোথাও-না-ফেলা এক দৃষ্টি হেনে বলে, "দিনকাল বড্ড খারাপ।"

বললুম, "এ কাজ ছেড়ে অন্য কাজ করিস না কেন?"

"অন্য কাজ?" ওর চোখ দুটো তীক্ষ্ম হয়ে আসে। "কাহে? এ কাজটা

'সার্কাস'

ভালই আছে বাবুজী। রোজগার কোন্ কাজেই বা এমন বেশী। কাজ করি আপন খুশীতে। কেউ 'বলনেঅলা' নেই। এই নিন বাবু। আয়না বানিয়ে দিয়েছি।"

পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ছেলেটিকে আর একবার ভাল করে দেখে নিলুম। ও আর আমার দিকে চাইলে না। ওর কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমার জুতো চক্‌চক্ করছে। আলো ঠিকরে পড়ছে। ও এখন চায় এক-জোড়া মলিন জুতো, নিঃশোষিত প্রাণ। ও তাকে দেবে নতুন জীবন নতুন সৌন্দর্য নতুন দীপ্তি।

ভাবছিলুম কি বৈপরীত্য! ও যখন সকালে এসে বসে, তখন কত তাজা, নতুন জীবনে পূর্ণ। বেলা গড়িয়ে চলে। বহু ময়লা জুতো দীপ্তিময় হয়। ওর দীপ্তি ক্ষয় হয়। ও যখন সন্ধ্যের সময় বাক্স হাতে ঘরে ফেরে, ওকে তখন দেখায় ঠিক প্রথম আসা জুতোর মতোই মলিন, নোংরা আর তেমনি বিপর্যস্ত।

ওর কাছে আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ও আর আমার দিকে চাইবে না জানি, তবু আমি আর একবার চাইলুম। ওর দুটো সন্ধানী চোখে তখন বড় ব্যস্ততা, নতুন খদ্দেরের খোঁজে।

"এই যে বাবু চকাচ্চক। আয়না করে দেবো। মুখ দেখে লিবেন বাবু।"

অগ্রদানী

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে। বিধাতা তো বটেনই। তবে মরলোকে আকারভেদ, পরলোকে কি তা জানিনে। জন্মালে ধাইএর স্পর্শ আপনাকে পেতেই হবে। বিয়ের দিনে পুরোহিতের মন্ত্র আপনার কানে ঢুকবেই। আর মরে যে ট্যাক্‌স ফাঁকী দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবেন সেটি হচ্ছে না। পথ আগলে আছেন অগ্রদানী। তিনি এসে দানটি গ্রহণ করলেন, তবে সিটি বাজিয়ে আপনার পরপারের রেলগাড়ী গা নড়িয়ে চলতে শুরু করবে।

লোকটি যে সুরসিক তা তার কথা বার্তায় বেশ বুঝিয়ে দিলে। শুধু তাই নয়, বাড়ীটি মৃত্যুর স্পর্শে ম্যাজমেজে হয়েছিল এই কটা দিন। কর্তাটি পরলোকে পাড়ি দেবার সময়, মনে হল বাড়ীসুদ্ধ হাসিখুশী, খোলা-মেলা ভাবগুলোকে কোন অদৃশ্য সিন্দুকে চাবি আটকে রেখে গেছেন। সে চাবির

হদিশ আর কেউ রাখত না। ভাগ্যিস পূর্ণ ভশ্চায এসেছিল। চাবির সন্ধান ছিল তার কাছেই। এক মুহূর্তে সিন্দুক খুলে বের করে আনলে সেগুলো, ভিজে আবহাওয়া শুকিয়ে উঠল। মুখে মুখে হাসি ফুটল।

আজকাল কি আর সে দিন আছে মশায়, কটা লোক 'সৎকাজ' করে বলুন। এই দেখুন না লিষ্ট করব, এক গাদা, শ্রাদ্ধের ফর্দ। কিন্তু এর মধ্যে কটা জিনিস কিনবে এরা, কিনবার কি যো আছে। সব আমাকে "মূল্য" ধরে দেবে। আমিই যোগাড় করে দেব।

এতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করলাম, মূল্য ধরাটা কি?

আমার দিকে বিস্মিত হয়ে চাইলেন পূর্ণ ভশ্চায।

—মূল্য মানে দাম। এই যে খাট, বিছানা, ঘড়া, থালা, ঘড়ি এই সব দান-সামগ্রী—শ্রাদ্ধ ভেদে এক এক রকম দান। ষোড়শ করবেন না দান সাগর, বৃষোৎসর্গ না অন্নজলি, তা যাক গে, মরুক গে, শ্রাদ্ধ করতে গেলেই দান লাগে আর সামগ্রী না হলে কি দান করবে? এই দান-সামগ্রী পূর্বকালে নতুন কেনা হ'ত; এবং শ্রাদ্ধান্তে এই সব জিনিস দান করে দেওয়া হ'ত। এই আমরা অগ্রদানীরা আগু বাড়িয়ে সে দান গ্রহণ না করলে আত্মার সদ্গতি হ'ত না মশায়। এখন কোন সামগ্রী তো দূরের কথা বৃষকাষ্ঠটা অবধি আমাদের যোগাড় করে আনতে হয়। বদলে মূল্য ধরে পাই। একটা খাটের দাম কম করেও প'য়ত্রিশ টাকা, তোষক দশ, বালিশ তিন, চাদর তিন, থালা-বাটি ঘড়া গাড়ু ধরুন আরও কুড়ি পঁচিশ—তা'হলে কত হল হিসেব করুন। এত টাকার জিনিস আমি যোগাড় করে এনে দেব, আবার আমাকেই এগুলো গ্রহণ করতে হবে। তার দরুন পাব কি জানেন, সামগ্রী-বাবদ হয়ত গোটা তিরিশেক আর দক্ষিণা হয়ত ছোঁয়াবে গোটা চারেক। তিরিশ টাকা তো ভাড়াই গুনে দিতে হবে জিনিসগুলোর। ওই চারটি টাকাই যা—তাও যদি অচল না হয়।

এবার আমার বিস্ময়ের পালা।

—আবার অচলও চালায় না কি?

—নাকি কি মশায়, হরবখত্ চালাচ্ছে। একে তো দক্ষিণা তক্ষুনি তক্ষুনি বাজিয়ে দেখে নেবার নিয়ম নেই—যত নিয়ম আমাদের বেলায়। এই তো খুব বেশী দিন নয়। বছর সাত আট হবে। পাণ্ডুয়ার ওদিকে এক নাম করা জায়গার জমিদার বাড়ি গিয়েছিলাম ওদের বুড়ো কত্তার কাজে। ইস্টিশান থেকে নেমে পাক্কা তিন কোশ রাস্তা কুপিয়ে তবে গে যেতে হয়।

গেলাম। ভেবেছিলাম পাড়াগেঁয়ে জমিদার, প্রাপ্তিট্রাপ্তি ভালই হবে। গিয়ে বুঝলুম, কি গুখুরী করেছি। কিচ্ছু দিলে না, একেবারে হাড় কিপ্টে। দুজন ছিলাম। পাঁচটি টাকা দক্ষিণে দিয়ে সেরে দিলে। ক্ষুণ্ণ মনে তো ইস্টিশানে ফিরে এলাম। টিকিট কাটতে দিলাম। সঙ্গের লোকটি এসে বললে, এ টাকা দুটো অচল। বুঝুন একবার, বাপের একটা সদ্গতি করছিল, তা সেটাও ফাঁকি দিয়ে।

পূর্ণ ভশ্চাযের মুখে খই ফুটতে লেগেছে। হাঁফ নিতে একটুখানি থামল, তারপর শুরু করলে।

আবার গেলাম অতখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে। বাবুকে ধরলাম। বাবু মুখে তো বিনয়ের অবতার। খুব খাতির করলে। পারেন তো পাদ্য অর্ঘ্য দেন আর কি। কিন্তু আসলে মশায় একেবারে চোলাই করা ছোটলোক। টাকাদুটো পালটে দিতে বলতেই মুখ কাঁচুমাচু করে বললে, বড় লজ্জায় ফেললেন ঠাকুরমশাই, তখন যদি দেখে নিতেন। কিন্তু এখন কি করে দেই। আমাদের আবার ক্যাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিনা।

একটানা এতগুলো কথা বলে পূর্ণ ভশ্চায় চুপ করল। একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, সব নিয়মই এক এক করে উঠে গেছে, কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি তো আর আমার নিয়ম বন্ধ করে দিতে পারি নে। কুল-গত প্রথা বজায় রাখতেই হবে। ডাকলেই দান নিতে যেতে হবে। কর্তাদের আমলে ভাবনা ছিল কি? দান নিলে সমাজে নীচু হতে হ'ত। তবু অগ্রদানী না হলে সমাজে চলত না। তাই দানের বহরও ছিল কড়া। জমি জায়গীর অবধি দান মিলত তাদের। আর এখন? যা কিছু 'মূল্য' ধরা। আরে বাবা সবাইকেই তো মূল্য ধরে আসলে ফাঁকী দিচ্ছিস্। একবার যমকে মূল্য ধরে মৃত্যুকে ফাঁকী দে দিকিনি! অগ্রদানী নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে উঠল, ওর হাসির ছোঁয়াচ লেগে গোটা শোকার্ত বাড়ীটার উপরই যেন একটা আনন্দের পলস্তারা পড়ল।

কই গো তোমাদের যে সাড়াশব্দ নেই। দেখছেন তো নিজে চক্ষেই।

আমার দিকে চেয়ে বললে, ওই যে একটা কথা আছে না—

কার শ্রাদ্ধ কে বা করে
খোলা কেটে বামুন মরে।

প্রজাপতির নির্বন্ধ

কন্যাদায়ে পড়েছেন? না-কি ছেলের বে'র ভাবনা? অবিয়েত সোমত্ত কোন আত্মীয়-কন্যা বুঝি বুকে চেপে বসেছে? জল নামছে না গলা দিয়ে?

তা ভাবনা কি আপনার। আপনি পুরুষ মানুষ। বৈঠকখানায় বসে গুড়ুক টানুন, আড্ডা মারুন ইয়ারবক্সী নিয়ে। যদি তারপরও কিঞ্চিৎ উৎসাহ বর্তমান থাকে, কখনও সখনও অসতর্কভাবে জিজ্ঞাসা করুন পাত্রপাত্রীর কথা। দিনটা রবিবার হলে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের পাতাটা আষ্টেপৃষ্ঠে চোখ দিয়ে চষে যান।

কিন্তু খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন খবরের কাগজ কোমর বেঁধে আসরে নামেনি, সেইদিনও। আপনি, পুরুষ মানুষ, বৈঠকখানায় তেমনিই আড্ডা মেরেছেন। কিন্তু অন্দরমহলের তো আর অমন নিশ্চিন্ত নির্ভর থাকলে চলে না। তাই তারা সর্বদা তৎপর। আপনি যখন তাস-পাশায় ফেঁসে গেছেন, অন্দর তখন লোক পাঠিয়ে নিরি ঘটকিনীকে ডাকিয়ে এনে ফিসফিসিয়ে চলেছেন।

পানে ছোপা একরাশ দাঁত বের করে চোখ দুটো কপালে তুলে নিরি বলে চলেছে, ও মিনসের কথা বলনি মা, বলনি। ওর যা খাঁই তাতে রাঘব বোয়াল ইস্তক পেন্নাম করে পালায়। ওখেনে সুবিধে হবে না। তবে বলছ যখন চেষ্টা চরিত্তির করে দেখতে পারি। তবে কুটুম্ব ভাল হবে না মা। চামার, সাক্ষাৎ চামার।

ব্যস সম্বন্ধের এইখানেই ইতি। আর এগুবেন এমন মনের জোরের জড়তক উপড়ে গেল নিরি ঘটকিনী।

আবার উল্টোটিও হয়। আবার নিরির আগমন, আবার ফিসফিসানি। লালচে লালচে দাঁত বের করে চোখ দুটো কপালের উপর তুলে নিরি বলতে থাকবে, বললে না পেত্যয় যাবে মা, কাত্তিক ঠাকুর যেন শাপভ্রষ্ট হয়ে নেমে এয়েছে। আর তেমনি মা বাপ। কি মিষ্টি কথা। বুড়ো মিনসে যেন একেবারে সাক্ষাৎ ভোলানাথ। যেমন আমাদের মেয়ে তেমনি তাদের ছেলে, আমি বলছি মা একেবারে রাজযোটক হবে। এ পাত্তর হাতছাড়া কর না।

নিরি যে ধাক্কা অন্দরে দিয়ে গেল তার ঢেউ বৈঠকখানায় এসে লাগল। তারপর খাওয়া শোওয়া আর পরম নিশ্চিন্তে চালানো সম্ভব হল না। একটা ফয়সালা করে তবে নিশ্চিন্তি। নিরি, ক্ষীরি, গোপালী, কদমদের তখন ছিল এমনই প্রতাপ। এমনই ক্ষমতা।

'সার্কাস'

কিন্তু সে-দিন এ-দিন নয়, আজ নয়। সে-দিনের জীবন্ত প্রতাপ, আশ্চর্য করিৎকর্মা আজ যেন প্রাগৈতিহাসিক হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক দরদ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন, আমি শুনছিলুম। মোটাসোটা চেহারা, মাথায় এক প্রশস্ত টাক। কালো গলাবন্ধ কোট আর হাতে ছাতি।

—তখন মশাই, মোড়ে মোড়ে এত প্রজাপতির অফিস বসেনি। এই অফিসওলারা কি বোঝে, কাকে চেনে? ব্যবসা শুধু ব্যবসা মশাই। আমরা এই যে ঘুরি, বাড়ী বাড়ী যাই, আচার আচরণ দেখে বুঝে ফেলতে পারি সে বাড়ীর লোকজনের চরিত্র। সেই চরিত্রের সংগে সংগতি রেখে পাত্রপাত্রী ঠিক করতে হয়। বিয়ে দেবার কাজ সোজা নয় মশাই। প্রজাপতির নির্বন্ধ। মেজাজে মেজাজ মেলান চাই। রুচিতে রুচি মেলান চাই। ঠিকুজি কুষ্টির হাংগামাটা আসে কি আর সাধে! আর গ্রহ-নক্ষত্রের ভাষা অত কে বোঝে মশাই, তারায় তারায় কি ইশারা হল আর যোগাযোগ ঘটে গেল অমনি, কথাটা তা নয়। আসল কথা হল পারিবারিক চরিত্র বুঝে সেই মত পরিবার থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করতে হবে। চারহাত এমনভাবে জুড়াতে হবে, যেন বিন্দুমাত্র ফাঁক-ফোঁকর না থাকে। এ খেলা খেলা নয়।

ভদ্রলোক ঘটক। এসেছেন পাশের ঘরের এক ভদ্রলোকের সম্বন্ধ নিয়ে। কথায় কথায় জমিয়ে নিলেন আমার সংগে। কথার ভঙ্গিটি বড় আন্তরিক ঠেকল। বেশ কইয়ে বলিয়ে লোক।

জিগ্যেস করলুম : ক্ষমতা আছে মশাই আপনাদের। অঘটন ঘটাতে পারেন বটে। কোথায় এঁদো গলির মধ্যে মেসবাড়ী, তার এক কুঠুরীর মধ্যে একগাদা লোক, তার মধ্যে কে এখনও অবিবাহিত ঠিক খুঁজে বের করেছেন তো।

ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন, বিয়ে তো আপনারও হয়নি। কাজ করেন খবরের কাগজের আপিসে। দেশে জমিজমাও কিছু আছে। মা, বাপ বর্তমান। আর তো ভাই নেই, থাকবার মধ্যে পাঁচ বোন। এক বোনের বিয়ে......

বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলুম। থামিয়ে দিয়ে বললুম, থাক থাক বুঝেছি। মহাপুরুষ লোক মশাই আপনারা।

ভদ্রলোক দিল-খোলা হাসি হেসে বললেন, খবর রাখতে হয়। খবর না রাখলে চলবে কেন। লোক চরিয়ে খেতে হয় আমাদের। তবে আপনার বিব্রত হবার কোন কারণ নেই। আপনার জন্যে তো আসি নি, সে হবে একদিন। আচ্ছা এখন উঠি।

'সার্কাস'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ জিগ্যেস করে বসলাম, লোকের বিয়ে তো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, নিজের কাজটি হাঁসিল করেছেন তো?

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে যাবার সময় বললেন, দূর দূর বিয়ে কি মানুষে করে?

হাত সাফাই

বন্ধুটি একেবারে চটে আগুন হয়ে গেলেন। 'তাহলে কি বলতে চান, আমি মিছে কথা কইছি?"

বন্ধুর আচমকা এই কেঠো প্রশ্নে আমিও থতমত খেয়ে গেলুম। কিন্তু আশ্চর্য ভদ্রলোকের সহনশীলতা। চমৎকৃত হয়ে গেলুম তাঁর রসিকতাবোধে।

একখানা খবরের কাগজ পড়ছিলেন, ধীরে সুস্থে সেখানা মুড়ে রেখে মৃদু হেসে মোলায়েম করে বললেন, "অত্যধিক গরমে ভারতীয় চা, কি বলেন? ও বাবা হরসুন্দর, তিনটি ডবল হাফ দাও দিকিনি।"

কিন্তু আমার বন্ধুটির দেহে পদ্মাপারের রক্ত টগবগ করছে। নিরস্ত করা অত সহজে সম্ভব নয়।

"তাহলে কি বলতে চান, যা বললুম এ সব বাজে?"

"আজ্ঞে আপনার মুখের সামনে আপনার কথাকে বাজে বলি কেমন করে।"

ভদ্রলোকের হাসি হাসি মুখের রদবদল হল না কোথাও।

কথাটা চলছিল গাঁটকাটাদের সম্বন্ধে। দিনতিনেক হল বন্ধুটির ঘড়িটি পকেট থেকে খোয়া গেছে। ঘড়িটি দিয়েছিল বড় শালাজ। কাজেই ঘড়ির মুখ আর দেখতে না পারার দরুন যতটা না হোক দুঃখটা বেশী করে বাজল বড় শালাজের কাছে মুখটা হাজির করার মুখ নষ্ট হয়ে গেল বলে। দুঃখ যতটা হল রাগটাও সেই পরিমাণে চড়ল। দুনিয়াসুদ্ধ পকেটমারের ধ্বংসকামনা করছিলুম আর চাখানায় বসে বসে চা টানছিলুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুটি কথঞ্চিৎ ধাতস্থ হয়ে শোক এবং ক্রোধ দুটোকেই ট্যাঁকে গুঁজে ফেললেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন হল না, তবে অন্য মোড় নিল।

কলকাতার পকেটমারদের সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য বন্ধুবর বিনামূল্যে যোগান দিয়ে যেতে লাগলেন।

"একবার হয়েছিল কি বুঝলে, আমাদের গ্রামের একজন, সম্পর্কে আমার কাকা হন, কলকাতায় আসছিলেন মেয়ের বিয়ের বাজার করতে। সঙ্গে ছিল

'সার্কাস'

দুহাজার টাকা। ভদ্রলোক খুবই সাবধানী। ফতুয়ার ভিতর পকেটে টাকা রাখেন। তার উপর আবার শীতকাল। ফতুয়ার উপর জামা, তার উপর সোয়েটার, তার উপর কোট, তার উপরে আলোয়ান। বেজায় শীতকাতুরে ছিলেন কি না। পাশে বসেছিলেন এক ভদ্রলোক। খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খানিক-পরে পকেট থেকে রুমাল বার করে যেই না মুখ মুছেছেন ভদ্রলোকটি, অমনি টপ করে একটা সোনার দুল মেঝের উপর পড়ে গেল। খুড়োমশাই দেখতে পেয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে ভদ্রলোককে দিতেই তিনি ধন্যবাদ দিয়ে সেটি আবার পাশ পকেটে চালান করে দিলেন। খুড়োমশাই আর থাকতে না পেরে বলে উঠলেন, সোনার জিনিস, অমন অসাবধানে কি রাখতে আছে? ভদ্রলোক থতমত খেয়ে দুলটিকে যত্ন করে ভাল জায়গায় রেখে দিলেন। ধীরে ধীরে দুজনের পরিচয় গাঢ় হল। শেয়ালদায় এসে দুজনে নামলেন। এক হোটেলে খানাপিনা করলেন। খুড়োকে তো একটা পয়সা খরচ করতে দিলেন না। তারপর ট্রামে চেপে একই সিটে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসলেন। খুড়ো যাবেন কালীঘাট, মাকে দর্শন করতে। ভদ্রলোক যাবেন ভবানীপুর। মেয়ের বাড়ী, প্রথম নাতির অন্নপ্রাশনে দুল গড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। জগুবাজারের কাছে ভদ্রলোক নেমে গেলেন। ট্রাম ছেড়ে দিতেই খুড়োর হুঁশ হল ভদ্রলোক খবরের কাগজখানা ফেলে গেছেন। এমন ভুলোও মানুষে হয়। খুড়ো কাগজখানা খুলে পড়তে লাগলেন। আরে এ যে পুরোনো কাগজ। খুড়োর হাসি পেল। বেশ মজার লোক তো। সাতবাসটে কাগজ বয়ে নিয়ে বেড়ায়। কালীবাড়ী গিয়ে তখন খুড়োর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কি একটা কাজে টাকা বের করতে গিয়ে দেখেন পকেট খাঁ খাঁ। ফতুয়ার পকেট একেবারে হাওদাখানা হয়ে গেছে। সর্বনাশ! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সেইখানেই। বুঝতে বাকী রইলনা কার কীর্তি। কিন্তু বুঝে আর কি করবেন। মেয়ের বিয়ে মাথায় রইল, এখন ফিরে যাবার পয়সা কোথায়। ধীরে ধীরে রাত হল। খুড়ো মরীয়া হয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। কোনদিকে যাচ্ছেন তার ঠিক নেই। চেতলার পুলে উঠে ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন। যেই ঠিক করা আর সেইমত কাজ। ঝাঁপ দেবার জন্য যেই না ঝোঁক দিয়েছেন অমনি কে তাকে পেছন থেকে চেপে ধরল। এই, করিস কি আত্মহত্যা মহাপাতক, তা কি জানিস নে। খুড়ো ফিরে দেখেন এক সন্ন্যাসী ইয়া জটাজুট। সৌম্য শান্ত চেহারা। খুড়ো একেবারে তাঁর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললেন, একটা বিহিত কর বাবা। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত কাহিনীটা বললেন। সব শুনে সন্ন্যাসী খানিকক্ষণ চোখ বুজে ভাবলেন। তারপর বললেন, আচ্ছা চল। তারপর এ-গলি সে-গলি

দিয়ে ঘুরিয়ে এক জায়গায় এসে বললেন, ঘাবড়াস নে, এবার তোর চোখ বেঁধে নিয়ে যাব। বলে বেশ করে খুড়োর চোখ বেঁধে অনেক ঘোরাঘুরি করিয়ে এক জায়গায় এনে যখন চোখ খুলে দিল, তখন প্রথমটায় আলোকছটায় খুড়োর চোখ ধেঁধে গেল। বিরাট একটা হল ঘর। অনেক লোকজন। সব ভদ্রলোক ছোটলোক এখানে এসে এক হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেলেন না খুড়ো। হঠাৎ একজন লোক এসে জিগ্যেস করল, কোথায় পকেট কাটা গেছে আপনার? খুড়ো বললেন, ভবানীপুরে। কখন? আন্দাজ আড়াইটে তিনটে। আপনার যে সত্যিই টাকা চুরি গেছে তার প্রমাণ কি? আজ্ঞে আমার সব নম্বরী নোট। নম্বর মনে আছে? আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা তবে আসুন আমার সংগে। খুড়ো ঘরের পর ঘর পার হয়ে গেলেন। ঘরে ঘরে সব কত র‍্যাক। র‍্যাকে র‍্যাকে হাজারো রকমের জিনিস সাজানো। আংটি, ঘড়ি, বোতাম, গহনা, হেন জিনিস নেই পৃথিবীতে যা সেখানে নেই, সব জিনিসের গায়ে টিকিট ঝোলান আছে। লোকটি খুড়োকে একটা র‍্যাকের সামনে নিয়ে গিয়ে একতাড়া নোট তুলে বলল, নম্বর বলুন। খুড়ো নম্বর বলতেই তাড়াটা খুড়োকে দিয়ে বলল, চলুন আপনাকে পেঁছে দিই। খুড়ো দেখলেন নোটের তাড়ার গায়ে একটা টিকিট ঝুলছে। টিকিটের গায়ে লেখা, কোথায় পকেট মারা হল, কত টাকার নোট, কটার সময় ইত্যাদি। কথায় কথায় খুড়ো জেনে নিলেন যে, ওটা পকেটমারদের কলেজ। ওখানে হাত সাফাই-এর ডিগ্রি দেওয়া হয়।"

এক ভদ্রলোক পাশের চেয়ারে বসে একমনে কাগজ পড়ছিলেন। কখন এক সময়ে বন্ধুর কথায় জমে গেছেন। বন্ধু থামতেই বলে উঠলেন, "যতটা বললেন, তার অর্ধেকটাও যদি হত!"

"তার মানে?"

মৃদু হেসে ভদ্রলোক কাগজ পড়ায় মন দিলেন।

"তাহলে কি বলতে চান এসব একেবারে গাঁজাখুরি।"

চা দিয়ে গেল। তিনজনে চায়ে চুমুক দিয়ে চললুম।

"দেখুন, আপনি মিছে বলছেন আমি তা বলছিনে। আপনার খুড়োমশাই যে ঠিক দেখেছেন এইটে ঠিক বিশ্বাস করতে বাধছে। শহরের উপর পকেট কাটাদের কলেজ হাতসাফাই-এর ডিগ্রি বিতরণ করছে, পুলিসীরাজত্বে বাস করে যদি এই কথা বিশ্বাস করি তবে হর্তাকর্তারা কি ছেড়ে দেবেন ভেবেছেন? এলটোতে মখমল বিছিয়ে চাবকে ছাড়বেন না?"

'সার্কাস'

লোকটি সত্যিই রসিক। হাসিয়ে তবে ছাড়লে। ওর কথার ধরনে বন্ধুটি পর্যন্ত হেসে ফেললে।

"পুলিসের কথা আর বলবেন না মশাই. ভাল একটা গল্প বলি তবে শুনুন। একজনের ভয় হল যে সে হয়ত খুন হয়ে যেতে পারে। তার সন্দেহ হল তার পেছনে লোক লেগেছে। বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে এক বন্ধুর পরামর্শ চাইলে বন্ধুটি তাকে আশ্বাস দিলেন, "ঘাবড়াচ্ছেন কেন? পুলিস আছে কি করতে, আমাদের পুলিস খুব এফিসিয়েন্ট; খুন হবার পর আধটি ঘন্টাও পার হবে না, পুলিস এন্‌কোয়ারি শুরু করে দেবে।"

হাসতে হাসতে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলুম। ভদ্রলোক খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন।

"ব্যাপার কি জানেন। হাতসাফাইটা হল কুটিরশিল্প। 'মাস্‌-স্কেলে' ও শিক্ষা দেওয়া যায় না। এর টেক্‌নিক একেবারে ব্যক্তিগত। ওঃ হরি বারটা বাজল। আচ্ছা দাদা চলি।"

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। বন্ধুটি বললে, "বেড়ে মজার লোক কিন্তু। আরে এই দ্যাখ কাগজখানা ফেলে গেছে।"

বন্ধু কাগজটি তুলে নিয়েই অবাক। "আরে তিন দিনকার পুরোনো যে কাগজখানা।"

অমনি আমাদের হাসি মিলিয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মতো একসঙ্গে দুজনেই পকেটে হাত দিলুম, তারপর বোকার চাউনী চোখে সেঁটে দুজন দুজনের দিকে চেয়ে রইলুম।

বুঝে নিলুম হাতসাফাই-এর কৌশল ব্যক্তিগতই বটে।

কলকাতায় নেহরু

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু কলকাতায় এসেছিলেন শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ১৯৫২ সকালে। সংগে ছিলেন তাঁর মেয়ে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। দমদম বিমান ঘাঁটিতে তাঁর বিমান যে সময়ে অবতরণ করেছে, পরদিন প্রায় সেই সময়েই তাঁকে নিয়ে দমদমের মাটি ছেড়েছে। নেহরুর এই স্বল্প ভ্রমণ তাঁর ঝটিকা সফরের অন্তর্গত। দমদম বিমান ঘাঁটি থেকে রাজ্যপালের গাড়িতে সোজা রাজভবন। পথের দুধারে লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁদের সামনে দিয়ে নেহরু চলে গেছেন, তবু জয়ধ্বনিতে আকাশ ছেয়ে যায়নি। কখনো কখনো জিগীর উঠছিল তাও জোরালো নয়।

এবারে নেহরুর প্রোগ্রাম বেশ ভারী। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সামান্য মাত্র বিশ্রাম। তারপর শুরু হবে তাঁর কার্যসূচী। কাজ কম নয়। পাসপোর্ট প্রথা চালু হবে, 'দেশে'র সংগে সম্পর্ক তাহলে তো চুকল। পাসপোর্ট না জানি কি একটা ভীষণ রকম কিছু। হয়ত এক 'লৌহ যবনিকা'। তাই আতংকে অধীর পাকিস্থানের হিন্দু সম্প্রদায় দলে দলে নিতান্ত নিঃস্ব অবস্থায় পাকিস্থান ছেড়ে আবার একচোট ভারত সীমান্ত অতিক্রম করল। একচোটে প্রায় আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে হাজির হল। পশ্চিম-বঙ্গ ইতিমধ্যেই উদ্বাস্তুর বিরাট চাপে ভেঙে পড় পড়। তারপর আবার নতুন আগমন। পশ্চিমবঙ্গ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে, তার শাসন শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, নৈতিক অবস্থা শোচনীয়তম। এর থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা হবে কিনা? পশ্চিমবঙ্গের সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে সাফ জবাব একটা পাওয়া যাবে কিনা? পাসপোর্ট ব্যবস্থায় ভারতের স্পষ্ট নীতি কি? কেন এখনই অর্থনৈতিক চাপ দিয়ে পাকিস্থানকে বানচাল করে দেওয়া হচ্ছে না? উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কি হচ্ছে? ইত্যাদি সমস্যা নেহরুর সামনে। তার উপর সংখ্যালঘুদের আবেদন। ভারত পাকিস্থান নয়, এটা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজ্য। তাই তাদের আবেদনও সমানভাবে বিবেচ্য। তাদের যে সব জমিজমা জবরদখল হয়েছে তা ফিরে পাওয়া যাবে কিনা? ভারতীয়

'সার্কাস'

মুসলমান যারা পাকিস্থানে রুজি রোজগারের জন্য ছুটেছিল, তারা আবার ফিরে এসেছে, তাদেরও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হবে তো? এই রকম নানাবিধ সমস্যা, সমস্যার পর সমস্যা জমে উঠেছে। আলাপ আলোচনা করে নেহরুকে ওয়াকিবহাল হতে হবে। তাই তাঁর কর্মসূচীতে যথাসম্ভব সব দলই স্থান পেয়েছেন। সরকারী বেসরকারী, নানা দলের নানা স্মারকলিপি নেহরুকে দেওয়া হল। সবাই চঞ্চল, সবাই অসহিষ্ণু, সবাই একটি লোককে কেন্দ্র করেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। সেই লোকটিই শুধু স্থির, ধীর, চিন্তিত এবং গম্ভীর। নেহরু কার সংগে না আলোচনা করেছেন? পশ্চিমবংগের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, দায়িত্বশীল রাজকর্মচারী, বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মাতব্বর, বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, সমাজসেবী, সংবাদপত্র সম্পাদক-মণ্ডলী, কে না এসেছেন? সবাই নেহরুর দিকে চেয়ে আছেন, নেহরু কি করবেন? সমস্যা জর্জরিত পশ্চিমবংগে আশার আলো কি তিনি বয়ে এনেছেন? সকলের মনেই এই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন আমাদের মনেও পাক খেয়ে ফিরছে।

আমরা, সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাইরে অপেক্ষা করে আছি। রাজভবনের প্রধান তোরণের মধ্যে ঢুকতেই আমাদের আটকে দেওয়া হল। আর এগিয়ে যাবার হুকুম নেই। প্রত্যেকটি আলোচনাই রুদ্ধদ্বার। সেখানে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের প্রবেশাধিকার নেই। নেই তো নেই, অপেক্ষা এখানেই করি। এক গাছের তলায় জটলা করছি। সকলেই অল্পবিস্তর অসন্তুষ্ট, কিঞ্চিৎ অপমানিত। রাজভবনের ব্যাপার এই, সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের সংগে মোটেই ভদ্র ব্যবহার করা হয় না। এত প্রশস্ত প্রশস্ত সব কক্ষ, এর কোথাও একটু ঠাঁই জোটে না, আমরা কি এতই অন্ত্যজ? আর কিছু না হোক, সামনে যে ধবল সিঁড়ির সারি, ওখানে যেতে দিতে আপত্তি কি? যে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি তার উপরে আচ্ছাদন নেই। আছে পাখীর ঝাঁক, অনবরত জামা কাপড় নষ্ট করছে। এক আধ ঘণ্টার অপেক্ষা নয়, ঝাড়া ঘণ্টাচারেক। রাজভবনের ব্যবহারটা আমাদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল। ঠিক করা গেল প্রেস-ক্লাবের সভায় ব্যাপারটা তুলতে হবে। আমাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে একটা ফয়শালা এবার করা চাই। সে বিষয়ে সমবেত সকলেরই এক মত।

সহকর্মী রিপোর্টাররা অদ্ভুত লোক। সব অবস্থায় মানিয়ে নেবার এমন আশ্চর্য ক্ষমতা যাদের থাকে, তাদের সিন্ধি ঠেকায় কে? এতক্ষণ সবাই

দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু কাঁহাতক আর দু'পায়ের উপর দেহভার রাখা যায়, তাই একে একে বসে পড়তে লাগলাম। অল্পক্ষণেই পরিবেশ গল্পমুখর হয়ে উঠল। দুজন তিনজন মনোমত লোক নিয়ে এক একটা চক্র গড়ে উঠল। সে গল্পের মাথামুণ্ডু নেই। স্ত্রীর ডিস্পেপ্‌সিয়া থেকে স্তালিনের গোঁফের দৈর্ঘ্য, কিছু আর বাদ গেল না। কিন্তু যতই এলোমেলো আলোচনা হোক কর্তব্যজ্ঞানটি এদের সর্বদা টনটনে। চোখ ঠিক রাজভবনের নুড়িবিছানো প্রশস্ত পথের উপর। হুস্ করে একটা গাড়ী রাজভবন থেকে যেই বেরুলো, মুহূর্তে সব গল্প চুপ। একজন বলে উঠলেন, কে আসে দেখ। রাজভবনের গাড়ী। একজন বেশ একনজর দেখে নিলেন, বললেন, ইন্দিরা গান্ধী। আওয়াজ হল, ছেড়ে দাও। ইনি চুপ করলেন তো আরেকজন মুখ খুললেন, সঙ্গীটি কে? জবাব এল, মনে হচ্ছে রমেন চক্রবর্তী। বাস বাস। আবার সতর্কতা ঢিলে হয়ে এল। জানা গেল মন্ত্রীদের বৈঠক বসেছে। খাদ্যমন্ত্রী পি সি সেন, পুনর্বাসন মন্ত্রী রেণুকা রায় বৈঠকে আছেন। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী জৈন ও অন্যান্য মন্ত্রীরাও আছেন। সাহায্য দপ্তরের দুজন ডেপুটি মন্ত্রীকেও ডাকা হয়েছে।

রুদ্ধদ্বার বৈঠক। কতক্ষণে শেষ হবে ভাবছি। কিছু বিরক্তি কারো কারো মনে জমে উঠছে। একজনের বিরক্ত মন্তব্য শোনা গেল, কি এমন বৈঠক যার জন্যে এত চুপ চুপ। যত্তো সব।

কেউ কেউ আলগাভাবে পায়চারি করছেন। বাকী সবাই বসে। গাছ-তলায় একটির পর একটি সিগারেটের পোড়া অংশ জমে উঠছে। একখানি গাড়ী ফটকে ঢুকল। একজন এগুতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পাহারাদারদের এক অফিসার স্বর চড়িয়ে নিষেধ করলেন, ওদিকে যাবেন না। কথা না শুনলে বাইরে যেতে হবে।

সম্মানে ঘা দিল কথাটা। যাঁরা শুনলেন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। চাপা অসন্তোষটুকু এক মুখ থেকে অন্য মুখে, এমনি করে সব মুখে ছড়িয়ে পড়ল। একজন জিগ্যেস করলেন, এরকম ব্যবহারের অর্থ কি? আরেকজনের অভিযোগ শোনা গেল, তাঁর অফিসে ফোন করতে চেয়েছিলেন, সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়নি। বেশী কিছু নয়, সামান্যমাত্র সৌজন্যও যে অতিথিবৎসল বাঙলা দেশের রাজভবন থেকে পাওয়া যায় না, এ সত্যিই এক বিস্ময়।

তবে এত অল্পে মুষড়ে পড়বে, এমন বান্দা রিপোর্টাররা নন। অনেক পোড় খাওয়া তাঁরা। যেমন করে পাখীর ময়লা জামা থেকে ঝেড়ে ফেললেন, তেমনি করেই মন থেকে এই অসোজন্যটুকুও। অল্প পরেই তাদের 'সেন্স অব হিউমার' মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। একজন সাংবাদিককে প্রশ্ন করা হোল, তুমি তো দমদমে ছিলে, নেহরুকে কেমন দেখলে? জবাব এলো, বেশ চিন্তিত। কে একজন ফোড়ন কাটলেন, তোকে কি বললে রে নেহরু। তিনি তেমনি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই জবাব দিলেন, ছোট মেয়েটার হুপিং কাসি হয়েছে, বড্ড ভুগছে, তার কথাই শুধুলেন, অতিশয় ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমার ছোট মেয়ের খবর কি? মুহূর্তের মধ্যে হাসির দমকায় মনের গুমোট হাল্কা হয়ে গেল। কে একজন বললেন, তবে যে শুনলাম, তোর হাতে 'গ্রিমল্ট' সিরাপের এক শিশি দিয়ে বলেছেন, দিনে তিনবার করে খাইও? তৎক্ষণাৎ তার জবাব এল, দিয়েছিলেন, তবে ওটা 'অফ্ দি রেকর্ড' তাই প্রকাশ করিনি। কিন্তু ওটিও 'স্কুপ্' করে বসে আছ, বলিহারী বাবা। আবার হাসির ঢেউ উঠল। তারপর হঠাৎ সব চুপ। চোখ কানে ব্যবসায়ী সতর্কতা জেগে উঠল।

প্রথম বৈঠক ভেঙেছে। মন্ত্রীরা সব বেরুচ্ছেন। পি সি সেনকে দেখা গেল সিঁড়ির উপর। সবাই তখন উঠে দাঁড়িয়েছি। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল, গাড়ী আটকাও, এ ছাড়া আর উপায় কি?

পি সি সেনের গাড়ী সারবন্দী সাংবাদিকের দেওয়াল ভেদ করতে পারল না, থেমে পড়ল। গাড়ীর উপর সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কি খবর?

বিশেষ কিছু নেই।

আলোচনা কি হল তাই বলুন।

পি সি বললেন, বলবার মতো তেমন কিছু নয়। গাড়ী ছেড়ে দেওয়া হল। একজন টিপ্পনী কাটলেন, কী এমন মারাত্মক কথা যে বলা যায় না। কিছু না সেরেফ্ পোজ আর কি? কথা উঠল, ডাঃ আমেদই ভরসা। কিন্তু কোথায় ডাঃ আমেদ? একজন বললেন, বেরিয়ে গেছেন, আমি দেখেছি। যাচ্চলে, ধরলেন না তাঁকে! তাহলে এখন উপায়? হঠাৎ সিঁড়ির উপর রেণুকা রায়কে দেখা গেল। সব্বাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক্ পাওয়া গেছে। গাড়ী আটকাও।

গাড়ী থামল। সাংবাদিকরা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। রেণুকা রায় প্রথমে কিছু বলতে চাইলেন না। স্ত্রী-সুলভ অভিমান তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠল। বললেন, আপনারা আমার নামে যা তা লেখেন, আপনাদের কিছু বলব না।

'সার্কাস'

সেদিনকারই এক সরকার-সমর্থক ইংরেজি দৈনিকে কি বেরিয়েছে তাঁর নামে। চটেছেন বোঝা গেল। টেনে টেনে বললেন, না বাবা, আর নয়।

তিনি বলতে না চাইলে হবে কি? সাংবাদিকদের কথার প্যাঁচ, একেবারে যেন ইস্ক্রুপ্। পেটের কথা পেঁচিয়ে ঠিক বের করে আনবেই। প্রথমে ছিল তোষণ নীতি। সে পথে সুবিধে হল না। সাংবাদিকরা তখন মরীয়া। খবর না পেলে কি নিয়ে অফিসে ফিরব? তাই ট্যাক্টিকস্ বদলে ফেলা হল। চারদিক থেকে মুঠো মুঠো প্রশ্ন ছোঁড়া হতে লাগল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কেজো, অকেজো। এই হঠাৎ আক্রমণে সুফল ফলল। রেণুকা রায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। না না করতে করতেই কিছু সংবাদ পাওয়া গেল, সংবাদ নয় সংবাদের সূত্র। তাও টুকরো টুকরো, এলোমেলো। এগুলোকে নানা সূত্রে থেকে যাচাই করে তবে খবর তৈরী করা যাবে। আচ্ছা ছেড়ে দাও। জানা গেল, নেহরু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য তাঁর যথাসাধ্য করছেন। বিভিন্ন প্রদেশে এমন স্থান ঠিক করা হয়েছে, যেখানে উদ্বাস্তুরা 'সাদরে অভ্যর্থিত' হবেন।

মন্ত্রীদের পর রাজ্য সরকারের সেক্রেটারীদের বৈঠক। এরা ঘাঘু আমলা, বুরোক্র্যাট। কিছু পাওয়া যাবে না এদের কাছ থেকে। পরিশ্রমই সার।

চিফ্ সেক্রেটারী, হোম সেক্রেটারী, সাহায্য কমিশনার, অতিরিক্ত সাহায্য কমিশনার, পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, আর একজনকে চেনা গেল না, সম্ভবত নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, একের পর এক বেরিয়ে গেলেন। দ্বাররক্ষী এটেনশন হল, খটাস খটাস সেলাম ঠুকল। ওটা যেন স্বয়ংক্রিয় একটা সেলাম ঠোকা কল।

বেলা গড়িয়ে এসেছে, ছায়া ক্রমেই দীর্ঘতর, রাজভবনের মালী নির্জীব এক হোস পাইপ দিয়ে জল ছিটাতে ব্যস্ত আর ঝাড়ুদার ঝাড়ু দিতে দিতে ক্রমে এগিয়ে আসছে। আমাদের ক্লান্তি এসেছে। আর বৈচিত্র্য নেই। কিছু আগে কৌন্সিল হাউস্ স্ট্রীটে, যেখানে এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের অফিস, তার একটু সামনে এক পাগল সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল, তবু তাই দেখে সময় কাটাচ্ছিলাম, ক্লান্ত হয়ে সেও চুপ করেছে।

আর কিছু হবে না, চল যাই। কেউ কেউ রণে ভঙ্গ দিলেন। একজন সহকর্মী ফিস্ ফিস্ করে বললেন, যেও না। নেহরু এখন চা' খাবেন। তারপরেই সোজা কংগ্রেস ভবন। সেখানে রাজ্য কংগ্রেসের হোমরা চোমরাদের সঙ্গে আলোচনা। দেড় ঘণ্টার বৈঠক। কথা উঠল উদ্বাস্তুদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করতে

'সার্কাস'

নেহরু শেয়ালদায় যাবেন কি না? কেউ বলল হ্যাঁ, কেউ বলল না। 'হ্যাঁ'-র দল যুক্তি দেখালেন, নেহরু যদি না-ই যাবেন তবে আর সরকার এই দু'তিন দিন অঢেল পয়সা খরচ করে ইস্টিশান সাফসোফ রাখছেন কেন? পয়সার প্রতি সরকারের আমলাদের দরদ না থাক, নিজেদের গতরের প্রতি তো আছে। গা তুলতে যাদের ছ সাত মাস লাগে তারা যে দিনরাত এখানে কাজ করছে সে কি খামোখা? 'না'-র দল বললেন, ঠাসা প্রোগ্রাম, সময় কোথা পাবেন?

এটা একটা কড়া যুক্তি বটে। কিন্তু নেহরু নেহরুই। ফাঁক পেলেই ছুটবেন। এমনও হতে পারে কংগ্রেস ভবন যাবার পথে টুক করে ঘুরে যেতে পারেন। তাই বসে রইলাম। রাজ্যপাল আর ইন্দিরা গান্ধী আবার কোথায় বেরিয়েছিলেন। অশোকস্তম্ভলাঞ্ছিত রাজ্যপালের রোল্‌স্‌ রয়েস তাঁদের নিয়ে রাজভবনে ঢুকল। শোনা গেল তাঁরা শেয়ালদায় গিয়েছিলেন। এরই ফাঁকে নেহরু সংখ্যালঘু মাতব্বরদের সঙ্গে একটা ছোট্ট বৈঠক সেরে নিলেন। নেতাদের গাড়ীগুলো একে একে বেরিয়ে গেল। এইবার নেহরুর চা-পান। তারপর তিনি বেরুবেন, হয়ত শেয়ালদা, হয়ত কংগ্রেস ভবন, ঠিক জানা নেই। এইটুকু শুধু জানা, তিনি যেখানেই যান, তাঁকে অনুসরণ করতে হবে।

তোড়জোর শুরু হল বেরুবার, ফট্‌ ফট্‌ পাইলটের লাল ত্রিচক্র মোটর সাইকেল রাজভবনে ঢুকল। একটু পরেই সিকিউরিটি পুলিসের মোটরকার। সাদা পোষাকের দুজন পুলিশ কর্মচারী নামলেন। একটি বেহারী চাষী এক-ছড়া মালা নিয়ে কোন্‌ ফাঁকে ঢুকে গিয়েছিল, পাহারা তাকে আটকে দিয়েছে। নেহরুর সে আপনার লোক, তিনি ও'দের গ্রামে গিয়েছেন, ওদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ও কলকাতায় এসেছে দেশ থেকে, এসেই শুনল নেহরুও কলকাতায় এসেছেন। তাই সে এসেছে তার নেহরুর সঙ্গে দেখা করতে, নিজে হাতে মালা পরাতে। আর, আর সুখদুঃখের দুটো কথা বলতে। এতে ওরা বাধা দিচ্ছে কেন, লোকটি বুঝে উঠতে পারছিল না। মিনতি করে বললে, আমি তো বিরক্ত করব না, শুধু দেখেই চলে আসব। আচ্ছা, না হয় আমার নাম তাঁকে বলুন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বেচারা বুঝতে পারেনি তার নেহরু এখন পুলিশের হেফাজতে। এমন হেফাজতে তাঁকে অতীতে বহুবার থাকতে হয়েছে। তারপরে বন্দীশালা থেকে বেরুলেই জনসাধারণ তাঁকে বুকে তুলে ধরেছে। হয়ত এ বন্দীশালা থেকেও তিনি বেরুতে পারবেন, কিন্তু সাধারণের বুকে ততদিনেও

কি তাঁর জন্য জায়গা থাকবে? অথবা তাঁদের নেহরুকে তখনই তারা নিজের করে ফিরে পাবে?

সহকর্মী বললেন, চল বেরিয়ে পড়ি, এখনই বেরুবেন মনে হচ্ছে। কোন্ ফটক দিয়ে বেরুবেন তা নিয়েও জল্পনা হল। সিদ্ধান্ত হল, আমরা বেরিয়ে মোহনবাগান ছাউনীর কাছে গাড়ী রাখব। আন্দাজ করা গেল নেহরুর গাড়ী রেড্ রোড্ ধরেই কংগ্রেস ভবনে যাবে। তাই এখান থেকে পিছু নিলেই সুবিধা হবে।

উন্মুখ প্রতীক্ষায় মোহনবাগান তাঁবুর কাছে বসে আছি। স্টার্ট রাখা গাড়ীখানা থর্থর্ কাঁপছে। পথের দুধারে লাল পাগড়ী। দূরে রাজভবনের তোরণপার্শ্বে সমবেত জনতার ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। আমাদের নজর তীক্ষ্ন হয়ে উঠছে। সবার আগে একখানা বেতার ভ্যান বেতারে পথের খবর যোগান দিতে দিতে বেরিয়ে গেল। তারপর ক্ষণকাল বিরতি। আমাদের দৃষ্টি রাজ-ভবনের তোরণে। বেরিয়ে এল পাইলট্। তারপর নেহরুর গাড়ী। চক্রলাঞ্ছন রোলস্ রয়েস্ পেছনে পেছনে সিকিউরিটি পুলিশের গাড়ী। একটা সশস্ত্র রক্ষীর ট্রাক। হুস্ হুস করে বেরিয়ে যেতে লাগল। ওই তো নেহরু, এক ঝলক দেখা গেল। পাশে প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিজয় সিং নাহার।

কংগ্রেস ভবনের সামনে গাড়ী থেকে যখন নামলাম তখন নেহরু ভিতরে ঢুকে গেছেন। লোয়ার সার্কুলার রোড্ থেকে কাতার দেওয়া কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকরা কংগ্রেস ভবনের প্রাঙ্গণের মধ্য পর্যন্ত খাড়া। তাদের ঠেলে এগিয়ে যায় কার সাধ্য। এরা পুলিসেরও বাড়া। অতিকষ্টে ওদের হাত এড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম। নেহরু দোতলায়, ওখানেই বৈঠক। এটাও রুদ্ধদ্বার। তবে এ'রা ভদ্রব্যবস্থা একটা করেছেন। বসবার জন্য টেবিলের ধারে সার সার বেঞ্চিপাতা। এখানে রিপোর্টারদের একেবারে গাদি লেগে গেছে। প্রত্যেক কাগজ থেকে দু'তিনজন।

দেড়ঘণ্টা বাদে বৈঠক শেষ হল। একজন ছুটে এসে খবর দিলেন। ভলেণ্টিয়াররা বুক চিতিয়ে দাঁড়াল। দরজার দুপাশে মঙ্গল কলসের বদলে লাল পাড় সাদা সাড়ি পরা দুটি কিশোরী। তাদের বক্বকানি থামল। কাঠের সিঁড়িতে পদশব্দ জাগল। দরজার পাশে আমরা সরে দাঁড়ালাম। এক ফোটো-গ্রাফার ক্যামেরা তাক করে রইল। নেহরু বেরুলেই ফ্ল্যাশ বাল্ব ঝিলিক মেরে উঠবে। নেহরুর মুখ ফটোর ফিল্মে গাঁথা হয়ে থাকবে।

নেহরু নন, এক কংগ্রেস নেতা তড়বড় করে বেরিয়ে এলেন। যেন

কত বড় মাতব্বর, ভাবখানা এই।—সব রেডি তো? আচ্ছা,—বলে দরজার পাশে সরে দাঁড়ালেন। হলের ভেতরে সাংবাদিকরা প্রতিবাদ করে উঠলেন। যাঁরা ভেতরে ছিলেন তাঁদের আটকে দেওয়া হয়েছে, বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না। অবশেষে তাঁরা একরকম জোর করেই বেরিয়ে এলেন। সিঁড়িতে আবার পদশব্দ উঠল, এবারে অনেকগুলি। নেহরু বেরিয়ে এলেন। এই প্রথম তাঁকে এত নিকট থেকে দেখলাম। তিনি কোনো দিকে চাইলেন না। অভ্যাসবশে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন। বড় গম্ভীর, মুখের প্রতিটি রেখা চিন্তাভারাক্রান্ত। নেহরু এখান থেকে আবার রাজভবনে গেলেন। আমি আর গেলাম না, আমার কাজ এখানেই। রাজভবনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে নতুন বৈঠক। বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ, কম্যুনিস্ট, সেবাদলের কর্তৃবৃন্দ, সংবাদপত্র সম্পাদকমণ্ডলী। প্রতীক্ষাউন্মুখ শেয়ালদার জনতা গভীর হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ল। নেহরুর যে মোটে সময় নেই, তারা তা কি করে জানবে?

ভাববার সময় ছিল না। উপরে উঠে গেলাম। চাকভাংগা মৌমাছির দলে যেন এসে পড়লাম। এখানে গুঞ্জন উঠছে নানাবিধ। তার মধ্যে অসন্তোষই প্রবল। এখানে কংগ্রেস এক স্মারকলিপি পেশ করেছিল। তাতে যা লেখা ছিল দ্বিতীয় অনুচ্ছেদেই বলেছি। বাড়তির মধ্যে শুধু একটি সমস্যা। যাবতীয় চাকরীতে বেশীর ভাগ উদ্বাস্তু নেবার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার শিক্ষিত মহলে গভীর অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, সে বিষয়ে কি করা যায়?...

বিভিন্ন সমস্যার উত্তরে তিনি কি বললেন? এই প্রশ্নের জবাব নানালোক নানাভাবে দিতে লাগলেন। প্রত্যেকেই নিজের রঙে রঙ করে। কার কথা নির্ভরযোগ্য? মনে হল বৈঠকে প্রেসকে প্রবেশ করতে না দিয়ে ভুল করেছেন এঁরা। রাজনৈতিক উত্তেজনার দিনে এই সব অসমর্থিত খবর বিভ্রান্তি ছড়াতে পারে, লোককে অযথা উত্তেজিত করতে পারে। এর ফলে নেহরুর সমস্ত দিনের পরিশ্রম বানচাল হয়ে যাবে হয়ত।

কেউ বললেন, ও সব ফিলসফি আমরা সাধারণ লোক ঠিক বুঝিনে মশাই। কেউ বললেন, সীমা নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রশ্নটি কেমন কায়দায় এড়িয়ে গেলেন দেখলেন তো, যেন শুনতেই পাননি। কেউ বললেন, খবরের কাগজকে খুব সে ঠুকেছেন। কিন্তু সোজা কথাটা কি? নেহরু কি কথা বলেছেন, ঠিক ঠিক কেউ বলতে পারলেন না। রেণুকা রায় আবার উদ্ধার করলেন। বললেন, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করা হবে যত সত্বর সম্ভব। নেহরু বলেছেন, এই সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয় সমগ্র দেশের।

সমাধানও সর্বভারতীয় স্তরে করতে হবে। আন্দামানে এক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারকে—এদের সংখ্যা হবে পাঁচ হাজার, পাঠানো হচ্ছে খুব শিগ্‌গির। তারপর পশ্চিমবঙ্গের সন্নিহিত রাজ্যসমূহের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আলোচনা চালানো হচ্ছে। অনেকেই উদ্বাস্তুদের সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। বিরোধীদলগুলো যেন এই সমস্যাকে সমাধান করবার মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করেন, এই হতভাগ্যদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ না করেন, বিরোধী দলের কাছে এই তাঁর অনুরোধ। তাঁদের যদি গঠনমূলক কোনো বিকল্প পরিকল্পনা থাকে তা তাঁরা নিয়ে আসুন, তাঁদের সঙ্গে নেহরু একযোগে কাজ করবেন, শুধু ধ্বংসাত্মক নিষ্ক্রিয় সমালোচনায় কোনো মঙ্গল আসবে না।

শোনা গেল পাকিস্থান সম্পর্কেও তিনি তাঁর মত সাফ জানিয়েছেন। তার মোদ্দা বক্তব্য হল, পাকিস্থান একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, ভারতের জমিদারী নয় যে, যখন তখন তাকে শায়েস্তা করা যাবে। আর পাঁচটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক, পাকিস্থানের সঙ্গেও তাই। ভারতের চোখে দক্ষিণ আফ্রিকা আর পাকিস্থান সম আসনে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অকথ্য অত্যাচার চলেছে তা বলে তার উপর অর্থনৈতিক চাপ দেবার কথা তো কেউ তুলছেন না। কারণ এঁদের মনস্তত্ত্ব তাকে স্বাধীন দেশ বলে মেনে নিয়েছে। আর পাকিস্থানকে এঁরা তেমনভাবে না দেখে দেখেছেন বেয়াড়া বড় বেটা হিসেবে। তাই দাওয়াই বাতলাচ্ছেন খানা বন্ধ করে দাও, ব্যাটা শায়েস্তা হয়ে যাবে। শোনা গেল, নেহরু বিরোধী দলের এই সব দায়িত্বহীন উদ্ভট যুক্তিকে আমল দেননি। বলেছেন, 'হাতুড়ে চিকিৎসা'। নেহরু নাকি বলেছেন, পাকিস্থানের প্রতি সংগ্রামী মনোভাব তাঁর নয়, তাঁর পথ গান্ধীজীর পথ, শান্তির পথ, সৌহার্দের পথ।

বিস্ময় লাগল শুনে যে কম্যুনিস্টরা তাঁর এই নীতির বিরোধিতা করেননি। তাঁরা পাকিস্থানে এক শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণের প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু অদূরদর্শী কতকগুলো দেউলিয়া রাজনীতিক এবং ঘোরতর সাম্প্রদায়িক দল একে 'তোষণ নীতি' আখ্যা দিয়েছে। নেহরুর বিশ্বনীতির সঙ্গে পাকিস্থানের প্রতি তাঁর আচরণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। বলবান লোক তার চেয়ে দুর্বলকে তোষণ করে না, শোধরাবার সুযোগ দেবার জন্য ক্ষমা করে, সময় দেয়। তিনি বলেছেন, পাসপোর্ট প্রথা ভারত চায়নি, পাকিস্থানই তা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি আজই পাসপোর্ট প্রথা তুলে দিতে রাজী

আছেন, যদি পাকিস্থান সম্মতি দেয়। তিনি চান উভয়বঙ্গে লোক বিনা বাধায় অক্লেশে যাতায়াত করুক। তবে পাকিস্থান এ বিষয়ে যতটা কড়াকড়ি করবে তাঁকেও বাধ্য হয়ে ততটা কড়া হতে হবে।

পাকিস্থান সীমান্তে অসহায় উদ্বাস্তুদের যে নিষ্ঠুরভাবে হয়রানি করা হয়েছে তার বিবরণ শুনে নেহরু অশেষ ক্লেশ বোধ করেছেন। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি হারাননি। সংখ্যালঘু মন্ত্রীর হাতে যথাসাধ্য আলোচনার ক্ষমতা তুলে দিয়েছেন।

কাজ সেরে রাস্তায় নামলাম। স্মরণ হল নেহরু এখনো কাজ করে চলেছেন, বৈঠকের পর বৈঠক, আলোচনার পর আলোচনা। সরেজমিনে তদন্ত করাই তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য। তার জন্য আজ সমস্ত দিনটা তাঁকে কী অসাধারণ পরিশ্রমই না করতে হয়েছে। কিন্তু আবহাওয়া দেখে মনে হল তাঁর সমস্ত শ্রম পণ্ড হয়ে যাবে। উত্তেজনা-মাতাল রাজনীতিকেরা তাঁকে কোনদিনই বুঝতে পারবে না। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জনমত নেহরু-নিন্দামুখর হয়ে উঠবে। নেহরুকে বুঝত সেইসব লোক, যাদের একজন প্রতিনিধি গাঁদা ফুলের মালা তাঁর গলায় ঝুলিয়ে দিতে এসেছিল। তার পক্ষেই সহজভাবে বলা সম্ভব—নেহরু আমার আপন লোক। কিন্তু যে যন্ত্রে নেহরু আজ সমাসীন সেই রাষ্ট্র আজ নেহরুর আপন লোককে দরজা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। রাজনীতিক নেহরুর এইটেই চরম ট্রাজেডি।

পাশপোর্ট কাহিনী

যদি বাইরে যেতে না হত, দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে, তাস-দাবা খেলে, আড্ডা মেরে জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া যেত তো বেশ হত, কোন রকম হাঙ্গামা হুজ্জুতের দরকার হত না। কিন্তু আজকের দিনে তা আর পারিনে। ঘর ছেড়ে বেরোতেই হয় বাইরে।

বাইরে মানে শুধু এ গাঁ ও গাঁ নয়, একেবারে কালাপানি পার। আগে একজন কারো যদি সমুদ্র পাড়ি দেবার দরকার হত তো দেশের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে সোরগোল পড়ে যেত। এটা একশ' দুশ' বছর আগের কথা অবিশ্যি। অথচ সাত আটশ' বছর আগেও বাঙালীর পো'রা বৈঠার ঘায়ে সমুদ্রকে শায়েস্তা করেছে। লঙ্কা জয় করেছে, বোরোবুদুর কাম্বোডিয়ায় গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, চীন পারস্যে গিয়ে ব্যবসা ফে'দেছে। এসব এখন শুনলে মনে হয় গুজব কথা।

যা বলছিলাম, বিদেশ যাওয়ার রেওয়াজ আবার খই-মুড়ি খাওয়ার মতো সহজ হয়ে আসছে। যে-সে এখন একটা সুটকেশ বেডিং নিয়ে হাওড়া কি দম-দম মুখো ছুটছে। জিগ্যেস করুন, কি ভায়া কোথায়? মুচকি হেসে ভায়া বলবেন, এই যাচ্ছি একটু বিলাত। এমনভাবে বলবেন, বিলাতটা যেন বড়িশে-বেহালার ধারে কাছে কোথাও।

হয়ত ভাবছেন, তা মন হলে যাওয়াটা আর এমন শক্ত কি? ট্যাঁকে যদি পয়সার জোর থাকে তো বিলাত আমেরিকা এমন দূরটা কোথায়? পয়সা ফেলে টিকিট কিনব, তারপর জাহাজে গিয়ে উঠব। আরো যদি সত্বরতা চাই তো জলের জাহাজ ছেড়ে হাওয়াই জাহাজে আসন নিলেই হল। হিল্লী দিল্লী কি ঘুরছিনে?

এইখানেই সকল কাজের মারপ্যাঁচ। বিলাত, নিউইয়র্ক হিল্লী দিল্লীর মতো অমন হুট করে যাওয়া যায় না। নিজ দেশে ঘুরুন ঘারুন, কারো মাথা ব্যথা নেই, দায়িত্ব নেই একটি ফোঁটা। কিন্তু স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ গেলেই আপনার জান-প্রাণের জিম্মাদারী সেই দেশী সরকারের। একটু কিছু উনিশ-বিশ হলেই আপনার সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ওদের ফরেন অফিসের

প্রাণান্ত। স্বদেশে আপনাকে কে পোঁছে? কিন্তু সেই আপনি বিদেশ গেলে—আপনার দেশের প্রতিনিধি; আপনার কথাবার্তা, খানা-পিনা, হাঁচিকাশির উপর নির্ভর করছে আপনার দেশের মান, 'প্রেস্টিজ'। যে আহাম্মকের এ দায়িত্ববোধ জন্মায়নি, তাকে পাসপোর্ট দেওয়া আর দেশের গালে চুনকালি নিজে হাতে লাগিয়ে দেওয়া এক কথা নয়কি? কাজেই পাসপোর্ট দেবার ব্যাপারে একটু কষাকষির দরকার হয়।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর এক নম্বর ব্লকের নিচের তলে, একদম এক টেরে পাসপোর্ট অফিস। নেতাজী সুভাষ রোড দিয়ে ঢুকলাম অফিসে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথা নিচু করে কাজ করছিলেন। দেখে জিগ্যেস করলেন, কি চাই?

বললাম, খবরের কাগজ থেকে আসছি।

—কি কোথাও যাবেন নাকি?

—আজ্ঞে না। আপনার কাজকর্ম একটু দেখতে এসেছি।

ভদ্রলোক খুশি হলেন। বললেন, কাজের জ্বালায় তো জ্বলে পুড়ে মরছি মশাই। পাবলিকের আর কি! ফরম ভর্তি করে দশটা টাকা ফিস দিয়ে মস্তকটি ক্রয় করে রাখলেন। তারপর প্রত্যহ দুবেলা তাগাদা। কই, কি হল আমার পাসপোর্টের? যেন হাতের মোয়া, গালে পুরলেই হল। ফোন আর লোকের জ্বালায় কাজ কম্ম সব শিকেয় তুলেছি। আজ একটু কম। কাল একেবারে ঝালাপালা করে দিয়েছিল। একটু সবুর করার অভ্যেস, মশাই, আমাদের কারো ধাতে নেই। অথচ দরখাস্তখানা যাবে পুলিশের কাছে, তারা এনকোয়ারী করে অনুমতি দিলে তো আমরা কিছু করব? তুমি চোর কি দাগী, রাজনৈতিক পরিচয় কি তোমার, এটা যেমন দেখতে হয়, তেমনি বিদেশে যে যাচ্ছ, তা ব্যাঙ্কে কিছু আছে, না ঢুঢু, সেটাও তো দেখতে হবে। নিজের কিছু না থাকলে, রেস্ত আছে, তোমার ঝক্কি ঘাড় নিতে পারে এমন জামীনদার যোগাড় করেছ? না করে থাকলে আগে তাই করো, 'গ্যারেণ্টর' যোগাড় করো তারপরে এ আপিসের চৌকাঠ পার হও।

—কেন জামীনদার কেন?

—নইলে বিদেশে গিয়ে ফতুর হয়ে যায় যদি, দেশে ফিরিয়ে আনবে কে? ফিরে আসবার টাকা দেবে কে? ওই 'গ্যারেণ্টর'—জামীনদার।

কথাবার্তা বলছি। হুড়মুড় করে ঢুকল এক মাদ্রাজী পরিবার।

—কি বাপু, কি চাই, কেয়া মাংতা?

ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললে, বর্মায় থাকি। কাজ করি ওখানকার এক

কাঠ-কলে, দেশে এসেছি বালবাচ্চা বৌকে নিয়ে যেতে। এই আমি, এই আমার পাসপোর্ট। এই আমার বৌ, ও এর আগে কখনো যায়নি বর্মায়, এই ওর দরখাস্ত। এই আমার লেড়কা, এইটে হচ্ছে ওর দরখাস্ত। বাবু থোড়া কৃপা করকে জলদি বানা দিজিয়ে দো পাসপোর্ট, নেহি তো ভুখা মরুংগা। বাবু, দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট দুটো করে দাও, নইলে না খেয়ে মরব।

—মরবে তো আমার চোদ্দপুরুষের চিতেয় পিদিম জ্বালাবে! এই বর্মা-যাত্রীদের নিয়ে মরে গেলাম মশাই। এখন সব চাইতে বেশী দরখাস্ত আসছে বার্মার পাসপোর্টের জন্য। আর যাচ্ছেও মশাই এই সব মাদ্রাজীরাই বেশী। সব লেবারার মজুর। কলকাতার বন্দর থেকে রেঙ্গুন যাবার খুব সুবিধে কিনা, তাই যত ঝামেলা আমাদের অফিসে। এই কোথেকে আসছ? কাঁহাসে আতা হ্যায়?

—বাইজাগসে। ভাইজাগ থেকে।

—তা বাপু, পাসপোর্টটি কেন সেখান থেকে করোনি, তাড়াতাড়ি হয়ে যেত। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাপ্লাই করলেই পেয়ে যেতে। নাকি আমাদের না ভোগালে সুখ পাচ্ছিলে না। এখন তুমিও ভোগো। মশাই কিছু বলতেও কষ্ট হয় এদের। অবলা জীব, কি বলে ভাল করে বোঝাই যায় না। গরীব। বার্মায় গেলে তবে পেটে দানা পড়বে। এখানে যে কটি দিন পড়ে, সে কটি দিনই লোকসান। বুঝি সব। সিমপ্যাথিও আছে। যতটা সম্ভব ভাল ব্যবহার করতে চেষ্টা করি। কিন্তু এত বিরক্ত করে ওরা, যে শেষে খারাপ ব্যবহার না করে আর পারিনে, হাজার হোক মানুষের শরীর তো। তার উপর জানেন, সর্বদাই ফেউ ঘুরছে এদের পিছনে। পাসপোর্ট করে দেবার নাম করে টাকা বের করে নেয় এদের কাছ থেকে, তারপর সটকে পড়ে। এই সেদিনও একটা কেস হয়েছে। পাসপোর্ট করে দেবার নাম করে একজনের কাছ থেকে কয়েক দফায় টাকা নিয়ে শেষে একটি বাজে পাসপোর্টে লোকটির ফটো সেঁটে দিয়ে বলেছে, এই নাও পাসপোর্ট এসো টিকিট করে দিই। বলে তো মশাই ওকে নিয়ে গেছে ম্যাকেঞ্জী কোম্পানীর অফিস। তারপর নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে বলেছে, এখানে দাঁড়াও, কোথাও যেও না, টিকিট করে নিয়ে আসি। সেই যে টিকিট করতে গেল তো ব্যস গেলই। শুধু কি এই, আরো কত রকম করে ট্যাঁক খালি করে জানেন? বলি শুনুন। দরখাস্ত লিখে দেবে তার জন্য একদফায় টাকা নিলে, ফটো এটাচ করিয়ে দেবে—তিন কপি করে ফটো লাগে পাসপোর্ট করাতে, দাও টাকা। ষোল টাকা আদায় যদি করল তো যিনি সই দিলেন ফটোয়

তিনি আট নিলেন, বাকী টাকা গেল দালালের পেটে। এমন কত জোচ্চুরীই যে হয়, কি বলবো।

অনেকে আবার তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট পাবার জন্য ঘুষও দিতে চায়। একবার ভারি মজা হয়েছিল। একই বিলাতী কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি করবার জন্য দুজন মারোয়াড়ীর বিলাত যাবার দরকার। দুজনেই পাস-পোর্টের জন্য দরখাস্ত করলে। যে আগে পৌঁছবে কাজ হাঁসিল হবে তারই। একজন তো মশাই অর্ডিনারী কোর্সেই দরখাস্ত করলে। আর একজন দরখাস্ত জমা দেবার সময় সঙ্গে দিলে একটা মুখ-আঁটা খাম। উপরে লেখা 'বাড়ী গিয়ে খুলবেন'। কেমন সন্দেহ হল। তক্ষুনি খামখানা খুললাম। ও মা, দেখি দশটাকার পাঁচখানা নোট। ইয়ার্কী পেয়েছ? ...বেয়ারাকে বললাম, ডাক তো পুলিশ, ওর আস্পর্ধাটা একবার ভাঙ্গি। অমনি সুট সুট করে সরে পড়লে। এ আপিস না মশাই, শ্রীক্ষেত্র। কোটিপতি থেকে নিঃস্ব, সাধু থেকে চোর, সবাই-কারই পদধুলি এখানে পড়তে হবে।

কত যে মজা দেখি, বুঝলেন, একবার হয়েছে কি, দুজন এলেন পাস-পোর্ট নিতে। এক ভদ্দর লোক আর এক মহিলা। বললেন, স্বামী-স্ত্রী। বেড়াতে যাবেন ইওরোপে। হিন্দু বিয়ের ওই একমজা, মুখের কথাকেই প্রমাণ বলে ধরে নিতে হয়। মুসলমান খৃস্টান হলে সার্টিফিকেট দেখাতে হত। হয়ে গেল পাসপোর্ট। তারা তো মহাখুশী। নিজেরাই এসেছিলেন। দেখে মনে হল আর তর সইছে না। পারলে এখুনি ডানা মেলে ওড়েন। তখন তো আর অতশত বুঝিনি। দুদিন যেতে না যেতেই পুলিশ অফিস থেকে খোঁজ এল এই এই নামের পাসপোর্ট কি ইসু হয়ে গেছে? বললুম, হ্যাঁ। কেন? অন্য একজনের বৌ নিয়ে ব্যাটা ভাগলবা।

আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পাসপোর্ট নিয়ে কথা হচ্ছিল। তিনি সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। তিনি বললেন, পাসপোর্ট তো তবু পাওয়া যায়, তদ্বির তদারক করলে একটু তাড়াতাড়িও মেলে। কিন্তু জান বার করে ছাড়ে ভিসা বের করতে। বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলোর পাসপোর্ট তো দেয় আমাদের সরকার। যে যে দেশে যাবেন দরখাস্তে তা জানিয়ে দিতে হবে। সেই দেশে যেতে দিতে সরকারের আপত্তি না থাকল তো অনুমতি পেয়ে গেলেন, কিন্তু তাহলেই যে ভাবলেন এবার টপ করে চলে যাবেন সেই দেশে তা পারবেন না। যে দেশে যাবেন সেই দেশের সরকারেরও অনুমতি চাই। এই অনুমতির নামই ভিসা। ওই পাশপোর্টের মধ্যেই ভিসা নেবার জায়গা থাকে। সেখানে

'সার্কাস'

সরকারী মোহর লাগিয়ে নিলেই কেল্লা ফতে। ভিসা নিতেও ফি দিতে হয়। ভিসা দেবার মালিক 'কনসালেট জেনারেল', রাষ্ট্রদূতের অফিস। ইওরোপের দেশগুলোয় ভিসার এত কড়াকড়ি নেই। যত কড়াকড়ি সব এই প্রাচ্য দেশ-গুলোতে। অথচ মজা কি জানেন, ওই সব দেশেই বেশী চোরাই চালান হয়। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো আর কি? পৃথিবীর মধ্যে ভিসা পাওয়া সহজ হচ্ছে বৃটেনের। কিন্তু সব চেয়ে কম স্মাগল হয়, ওখানেই।

কত রকমের উদ্দেশ্য নিয়েই যে লোক দেশের বাইরে যায় তার ইয়ত্তা নেই। কোনো কিছু শিখতে, রোজগার করতে, বেড়াতে, ব্যবসা করতে, বক্তৃতা দিতে। এ সব তো ডাল ভাতের ব্যাপার। সময় সময় মজার মজার ব্যাপারও নজরে পড়ে। বলছিলেন এক পুলিশ অফিসার।

বললেন, বেশী দিনের কথা নয়, এক আমেরিকান ক্রোড়পতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তার অনেক রকম ব্যবসা আছে। মিনিটে হাজার হাজার ডলার রোজগার। তিনি এখন দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কেন? না তাঁর সরকার এক নতুন আইন করে আয়কর বাড়িয়ে দিয়েছে। ওদেশে নিয়ম হচ্ছে লোক উপস্থিত না থাকলে তার উপর নতুন আইন খাটে না। তাই আইনটি পাশ হবার আগেই ইনি কেটে পড়েছেন। বছর পাঁচেক এইভাবে কাটাতে পারলেই তিনি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগকে দিব্যি কলা দেখাতে পারবেন?

কথায় কথায় জাল পাসপোর্টের কথা উঠল। বললেন, অনেকে করে কি একজনের পাসপোর্ট থেকে তার ফটোটা তুলে ফেলে নিজেরটা বসিয়ে দেয়। তার চেয়েও মারাত্মক শিলমোহর জাল করা। ছদ্মনামেও পাসপোর্ট বের করে নেয় কেউ কেউ। অনেকে আবার দুটো পাসপোর্টও করিয়ে নেয় ধাপ্পা দিয়ে। তবে কি জানেন, পাসপোর্টের যেমন মেয়াদ আছে, পাঁচ বছর পর পর বদল করে নিতে হয়, পাপেরও তেমন মেয়াদ আছে। পাপীরা ধরা পড়েই। চিরদিন জয়ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়াতে পারে না।

লুই ফিশারের একঘণ্টা

লুই ফিশার এসেছেন খবর পেলাম। লুই ফিশার ভুবনবিখ্যাত সাংবাদিক। জাঁদরেল জার্নালিস্ট। স্বকার্যে কয়েকবার পৃথিবী ঘুরেছেন। এবারে আর একবার বেরিয়ে পড়েছেন সরেজমিনে পৃথিবীর হাল চেহারা চাক্ষুষ করতে। ভদ্রলোক আগেও কয়েকবার ভারতে এসেছেন, মহাত্মাজীর আশ্রমেও কিছুকাল কাটিয়ে গেছেন। তবে ভারত তখন ভারতবর্ষ ছিল, হিন্দুস্থান পাকিস্থান হয়নি। কাটাছেঁড়ার পর ভারতে পদার্পণ এই তাঁর প্রথম। সাত সপ্তাহ ভারতে থাকবার তাঁর প্রোগ্রাম, তার মধ্যে হপ্তাখানেক কলকাতায়।

জার্নালিস্টকুলে আমি মাত্র কল্কে পেয়েছি, পুরো টানও মারা হয়নি। তাই যখন সহকর্মীরা বললেন, 'লুই ফিশারের কাছে যাচ্ছি, চল হে, তোমারও নেমন্তন্ন' তখন একটু চমক লাগল। ভাবতে ভাল লাগল আমি আর উনি একই পথযাত্রী। তিনি বহু আগে যাত্রা শুরু করে যে বৃত্ত প্রায় সম্পূর্ণ করে আনলেন, আমি তার প্রথম বিন্দুতে পা রাখলাম, এই মাত্র তফাৎ। কলকাতার 'প্রেস ক্লাব' তাঁকে এক প্রশ্নোত্তর সভায় ডেকেছেন, মেট্রোপোল হোটেলে। আমরা সেখানে গেলাম।

চারটেয় ওঁর আসবার কথা। একটু দেরী হয়েছিল আমাদের, কয়েক মিনিট মাত্র, কিন্তু পেঁছে দেখলাম, তিনি বক্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছেন। ছোট্ট একফালি ঘর, কয়েকখানা টেবিল জোড়া দিয়ে তার চারপাশে চেয়ারপাতা হয়েছে। আর সংবাদজীবীতে সে ঘরখানা একেবারে গিসগিস।

ফিশার তখন বলছিলেন জার্নালিস্টদের কথা, বোধ হয় কেউ তাঁকে এবিষয়ে প্রশ্ন করে থাকবে।

বললেন, 'আপনারা যে ধরনের সাংবাদিকতা করেন তার স্বরূপটা আমার জানা নেই। আমি আমার কথা বলতে পারি মাত্র। আমি কারো হুকুম বরদার নই। যা দেখি, যা বুঝি, যা ভাবি তা অকুণ্ঠ বলতে কারো পরোয়া করিনে। এই যে ঘুরতে বেরিয়েছি ,দেখে যাচ্ছি, যদি উৎসাহ বোধ করি, যদি অনুপ্রেরণা

পাই তবে আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একখানা বই লিখতেও পারি। সবই আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে।'

ফিশার একটুক্ষণ থামলেন। সেই অবসরে আমি একনজরে ঘরভর্তি সহকর্মীদের মুখগুলো জরীপ করে নিলাম। বিচিত্র লোক, বিচিত্র ধরনের মুখ। অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ম নখরাঘাতে অধিকাংশের মুখই বিচিত্রিত। অধিকাংশই ভেটারান সংবাদজীবী। থমথম স্তব্ধতায় সকলে অবগাহন করছি। মনে হল বাহ্যিক এত তো বৈচিত্র্য, কিন্তু সকলের মনে ভাবনার জলতরঙ্গে একটি মাত্র সুরই বাজছে, 'আহা, উনি কি স্বাধীন, ও'র স্বাধীনতার প্রতি হাত-পা-বাঁধা আমাদের কজনের মনে শুধু দুটি তরঙ্গ ওঠা পড়া করছিল, একটি মধুর ঈর্ষা, অপরটি অবসাদগ্রস্ত শ্রদ্ধা।

ফিশার একটির পর একটি কথা বলে যাচ্ছিলেন আর একটুর পর একটু আস্থা তাঁর করায়ত্ত হচ্ছিল। সময় সীমাতীত নয়, চারটে থেকে পাঁচটা, একেবারে মাপা একটি ঘণ্টা। আর বিষয় অনন্ত। তাই তিনি বললেন, 'আপনারা প্রশ্ন করুন, আমি তার জবাব দিই।'

উন্মুখ হয়ে বসে রইলাম। ফিশারের গায়ে মার্কিন ধুনোর গন্ধ। আর আমার সহকর্মীদের কেউ কেউ লাল মা মনসা। একটু বা উদ্বিগ্নও হলাম, বাজে প্রশ্নে না সময় কেটে যায়। যে প্রশ্নে আমার মন সদা পীড়িত পাছে তা এড়িয়ে যায়।

অদৃষ্ট শুভ, সেই প্রশ্নটিই কেউ করে বসলেন।

'তৃতীয় যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

এবিষয়ে ফিশারের সোজা জবাব, 'সম্ভাবনা খুবই কম, এই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।'

নাছোড় সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'এ ধারণার ভিত্তি কি?'

ফিশার বললেন, 'ভিত্তি আমার অভিজ্ঞতা। দেখুন, আমি যুগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি হয়ে আসছি। যুগোশ্লাভিয়াতে আমার সঙ্গে মার্শাল টিটোর মোলাকাত হয়েছে। তিনি তো একেবারে সোভিয়েট কামানের মুখের মধ্যে বসে আছেন, কিন্তু যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর কোনোরকম উদ্বেগ নেই। তুরস্কের সীমানা সোভিয়েট বর্ডার ছুঁয়ে আছে, সেখানেও কোনরকম আতঙ্ক দেখিনি। তা ছাড়া ব্যাপার কি জানেন, সোভিয়েট দেশে আমি চোদ্দ বছরকাল কাটিয়েছি, স্ট্যালিনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছি, তাছাড়া সম্প্রতি স্টালিনের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে, এর বহু রচনা এর আগে কোথাও প্রকাশিত হয়নি, ইচ্ছে

করেই সেগুলো এতদিন প্রকাশ করা হয়নি, আমি তা পড়েছি, বর্তমানে একখানা স্ট্যালিনের জীবনী লিখছি কিনা, তা সে সমস্ত রচনা পড়ে আর স্ট্যালিন চরিত্র অধ্যয়ন করে দেখেছি ঝুঁকি নেবার প্রবৃত্তি স্ট্যালিন চরিত্রে একেবারে অনুপস্থিত। তাঁর আগাগোড়া জীবনে স্ট্যালিন কখনো একটি মাত্রও 'রিস্ক' নেননি। আমার তো মনে হয় তাঁর এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য তাঁর উত্তরাধিকারী-দেরও বর্তেছে। কাজেই স্ট্যালিন স্বেচ্ছায় তৃতীয় যুদ্ধের ঝুঁকি ঘাড়ে নেবেন বলে আমার মনে হয় না।'

ফিশার একটু থেমেছেন কি প্রশ্ন হল, 'সোভিয়েট যুদ্ধ লাগাবে তাই বা ভাবছেন কেন. আমেরিকাও তো বাধাতে পারে?'

ফিশারের কণ্ঠস্বর দৃঢ়ভাবে বেজে উঠল, 'না, আমেরিকা যুদ্ধ বাধাতে পারে না। আমি যদি বুঝি আমি নিশ্চিত জিতব তবেই না আমি আক্রমণ করব। এই অ্যাটম-যুদ্ধের যুগে সে নিশ্চিতি আমেরিকার কই? এই যুদ্ধে জিতে কেউ লাভবান হবে এমন ভাবনাও তো কারো নেই। তবে আর কিজন্য এই ধ্বংসযজ্ঞ? দুপক্ষে যেমন তোড়জোড় করে রণসজ্জা হচ্ছে তাতে দু-দলই তো আতঙ্কিত। তাছাড়া জনসাধারণ কোথাও আর যুদ্ধের স্বপক্ষে নেই।'

বহুদিন যাবৎ যুদ্ধাতঙ্ক রোগে ভুগছি। এই যে, চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা, মানসিক চাঞ্চল্য, কোথাও স্থিরভাবে থাকতে পারিনে, কোন দায়িত্ব বোধ নেই, কোন আশ্রয়ই আমার অস্থিরতাকে থামিয়ে রাখতে পারে না তা সবই যুদ্ধাতঙ্কের ফলে। এ আতঙ্কে একা আমি ভুগছিনে সমগ্র পৃথিবীর যুবক-যুবতী আজ এই কারণে অব্যবস্থিতচিত্ত, অস্থিতধী। আমি যুদ্ধ চাইনে। যুদ্ধকে ঘৃণা করি কারণ মৃত্যুকে ঘৃণা করি। আমি যুদ্ধ চাই বা না চাই, যুদ্ধক্ষেত্রে যাই বা না যাই যুদ্ধ লাগলেই আমি মরব। কোন ফাঁকে আকাশ থেকে টুক করে একটি অ্যাটম্ বোমা পড়বে আর ব্যস্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব, একদম বেকসুর। তাই আমার আতঙ্ক, তাই অস্বস্তি। আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকব কিনা কে বলবে?

তাই প্রতীক্ষা করেছিলাম এমন একজন সঞ্জয়কে যে উচ্চারণ করবে, মাভৈঃ, আমি দেখে এসেছি, আমার চোখ সাক্ষী, মন সাক্ষী, যুদ্ধ দূরে, মাভৈঃ।

কি আশ্চর্য, আমার স্বপ্ন দেখা আশ্বাসটি জেগে উঠল ফিশারের স্বরে। স্বস্তির আরাম আমার সর্বশরীরে ছড়িয়ে পড়ল।

সহকর্মীরা ততক্ষণে প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে পাক খেয়ে ঢুকে পড়েছেন জাতীয়জীবনে।

'সার্কাস'

একজন প্রশ্ন করলেন, 'স্বাধীন ভারতকে দেখে কি মনে হচ্ছে?' ইনি না থামতেই আরেকজন জিগ্যেস করলেন, 'এই দেশ বিভাগকে কি আপনি সমর্থন করেন?'

ফিশারের প্রশান্তি একটু যেন স্তিমিত হল। তবে কি এ ক্ষণমালিন্য বেদনার?

ধীরে ধীরে শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'দেশ-বিভাগের আমি বরাবর বিরোধী। দেশ বিভাগ করে ভারতের আর পাকিস্তানের, হিন্দুর আর মুসলমানের যে অপরিসীম ক্ষতি হয়েছে তা আগামী একশ বছরেও পূরণ হবে কি না সন্দেহ।'

একজন সাংবাদিক শিউরে উঠলেন। 'এ-ক-শ বছর!' তাঁর কণ্ঠস্বর বাতাসে হতাশার এক কাঁপা তরঙ্গ ছুঁড়ে দিল। ফিশারের কণ্ঠস্বরেও যেন তার খানিকটা ছোঁয়া লাগল।

বললেন, 'গান্ধীজীও এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তবে দুর্ঘটনা যখন ঘটেই গেছে তখন তা ধীরভাবে মেনে নেওয়াই ভাল। আমি এক হপ্তা করাচীতে কাটিয়ে এসেছি। তারাও লোক ভাল। আমার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছে। একটা ঘটনার কথা বলি, গোলাম মহম্মদের সঙ্গে দেখা করতে গেছি। তখন তিনি অসুস্থ। কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন। হাতে একটা ফোটোগ্রাফ। কার জানেন? নেহরুর। তাঁরই নিজের হাতে দস্তখত করা। গোলাম মহম্মদ ছবিটির দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, তিরিশ বছর ধরে আমরা বন্ধু। তারপর একটু থেমে, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভারাক্রান্ত স্বরে বলে উঠলেন, ওঃ কি আফসোস!'

ফিশার এবার প্রথম প্রশ্নে ফিরে এলেন। বললেন, 'আপনাদের দেশকে যেমন দেখব আশা করেছিলাম, সত্যি বলতে কি আমার সে আশা চিড় খেয়েছে। যে সমাজ পরিবর্তন হওয়া উচিত ছিল তা হয়নি। শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন দেখব আশা করেছিলাম তাও সফল হল না। আপনার দেশে ইংরেজ যে শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেছিল তা কেরাণী তৈরী করবার জন্য। যে শিক্ষা আগে কেরাণী তৈরী করত তা এখন বেকার তৈরী করছে। এ পদ্ধতির নিন্দা আমি অতীতে করেছি, আপনারাও করেছেন। এ শিক্ষা সবাইকে শহরমুখী করে তুলেছে। অথচ ভারতবর্ষ হচ্ছে গ্রামে। এখন এমন শিক্ষাই চাই যা কৃষিবিদ্ তৈরী করবে, পশুচিকিৎসক সৃষ্টি করবে, এখন প্রয়োজন 'সোস্যাল ইঞ্জিনীয়ার', সমাজসেবীর? সেসব কই?

'সার্কাস'

কোনো সরকার কি সবাইকে চাকরী দিতে পারে? সবাইকে চাকরী দিতে পারে একমাত্র ডিক্টেটারী সরকার। গণতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান আছে তাই প্রাইভেট ব্যবসা বাণিজ্যেরও স্থান আছে।

'সমতা গণতন্ত্রের লক্ষ্য। ধনসাম্য তো দূরের লক্ষ্য, সেখানে পেঁছাতে সময় লাগবে, আরেকটি সাম্য মর্যাদার। সব মানুষই মর্যাদায় সমান, গণতন্ত্রের এই মূল্য আপনাদের এখানে অনুপস্থিত। মানুষের সঙ্গে মানুষের এখানে যত ভেদাভেদ আর কোথাও তত নেই। আমেরিকা যে নিগ্রোদের এখনও সমমর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছে তাতেই তার ডিমোক্রেসির দুর্বলতা ধরা পড়েছে। আর একটি ছেলেমানুষী হচ্ছে চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে। এসব বুদ্ধুমি অবশ্য একদিন দূর হবেই।'

একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফিশার একটু বিশ্রাম নিলেন। স্পষ্টভাষী, স্বমতনিষ্ঠ এই প্রৌঢ় আরো কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে নিজের অসুস্থতার কথা জানালেন। সমবেত সংবাদজীবীরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। আমার কানে ততক্ষণে বেজে চলেছে তার শেষ কথা কটা, 'আমি চাই, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হোক, আপনারা মানুষকে মর্যাদা দিন, শ্রমের মর্যাদা দিন।'

হাজার বার শোনা কথা। তবু আন্তরিকতার স্পর্শে তার রূপ কেমন নূতন হয়ে ওঠে। গ্র্যান্ড হোটেলের দারোয়ান তাঁকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে সেলাম করেছিল কেন না তিনি সাহেব। মানুষের দীনতার এই পরিচয় পেয়ে তিনি মনে আঘাত পেয়েছিলেন।

হোটেল ছেড়ে পথে বেরিয়ে সেই কথাটাই মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঘটনাটা কত তুচ্ছ; কিন্তু তাৎপর্যটা? এমন এক একটি সামান্য আঁচড়ে একটি চরিত্রের পরিচয় কেমন সাফ হয়ে ওঠে!

নলিন মাস্টার

এক

তাহলে নলিন মাস্টারের গল্পটাই বলি।

একদিন সকালে উঠে পকেট ট্যাঁক ইত্যাদি ঝেড়ে ঝুড়ে মাত্তর পৌনে একগণ্ডা পয়সা বের হল। এদিক ওদিক চাইছি। মুখখানা ব্যাজার ব্যাজার। আর কিছু না হোক, নির্জলা চা-ও যদি এক কাপ না জোটে তো মনটা হয়ে ওঠে মিইয়ে পড়া মুড়ি। মাস্টার তখনো ঘুমুচ্ছে। বালিশটা মাথার উপর চাপিয়ে উপুর হয়ে ফুস্‌র্‌ ফুস্‌র্‌ নাক ডাকাচ্ছে। জানি, উঠেই বলবেন, চা। তো বলার সঙ্গে সঙ্গেই মুখের কাছে চায়ের বাটি এগিয়ে দিতে হবে। সুস্‌প্‌ সুস্‌প্‌ চুমুক টেনে মাস্টার নয়ন দুটি মেলবেন। তারপর আশীর্বাদ করবেন, জিতা রহো। এর ব্যতিক্রম কিছু ঘটলেই সেদিন কুরুক্ষেত্র।

এমন সময় নিচের উঠোনে 'সবই মায়ের ইচ্ছা' বলে মাঝারি রকম হাঁক দিয়ে বাউল রামভদ্দরবাবু প্রবেশ করলেন। হাঁক দিলেন, 'কই হে, মাস্টর।'

নলিন মাস্টার তড়াক করে উঠে পড়লেন, জবাব দিলেন, 'সোজা উপরে।' বলেই প্রসন্ন বদনে আমার দিকে চাইতেই, 'চা' বলে হুকুমটা তাঁর ঠোঁট ছাড়বার আগেই পকেট উপুড় করে তিনটি পয়সা দিয়ে বললুম, 'এই মোট। আর নেই।' মাস্টারের প্রসন্নতা কিঞ্চিৎ চোট খেল বলে মনে হল। বিরক্ত মুখে বলে উঠলেন, 'সাধন পথে দেখছি বিঘ্নের আর অন্ত নেই।'

'তারা, মা, ব্রহ্মময়ী' বলে রামাই বাউল ঢুকলেন। তারপর ধুলো সুদ্ধু বিছানার উপর ধপ করে বসেই বললেন, 'আজ আবার শনিবার, মাস্টার জানোই তো সাত্ত্বিক আহারের দিন আজ। সন্দেশ ছাড়া কিছু গ্রহণ করবার উপায় নেই। মায়ের আদেশ।'

জল যে কোথায় গড়াচ্ছে বুঝতে পারলুম। নলিন মাস্টার ব্যাঁকা চোখে আমার দিকে চাইবার চেষ্টা করছেন জেনে আমি সোজা চোখে অন্য দিকে চাইলুম। সেদিকে ভাগীরথী। বর্ষার পুরুষ্টু নদী। ঘোলা জলে দুটি পাড় ভরভর। তার উপর ভোর-সূর্যের কাঁচা আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে খোলা ভেঙে কে যেন ডিমের কুসুমটি চিনেমাটির পিরিচে রেখে দিলে। রামাই

বাউল দেখলেন, নলিন মাস্টার দেখলেন। তারপর সমস্বরে গান জুড়ে দিলেন। 'রূপটুকু তোর ছড়িয়ে দিলি রূপসাগরের কূলে কূলে। আমরা পাগল আঁচল মেলে কুড়ুতে যাই সকল ভুলে। রূপ দেখা মা রূপময়ী, অরূপে রূপসী তুই, সকল জগৎ ঢেকে দে মা তোর ও রূপের আড়াল তুলে।'

গান থামল তো নৃত্য। নলিন মাস্টার বললেন, 'বাউল বাঁয়া তবলাটা ধর হে, আজ আর ধরে রাখতে পারছি না। সমস্ত দেহ, সর্ব আত্মা নাচতে চাইছে। ধর, ধা, ধা কেটে কেটে তাক্, তাক্ কড়াং তাক্, তাক্ কড়াং তাক্।' বাউলের হাত তবলায় জোর ছুটল। শুরু হল নলিন মাস্টারের নৃত্য।

বোঝাতে পারব না, আমার কেমন লেগেছিল। নৃত্যগীতের সভায় আমি অস্পৃশ্য চন্ডাল। তবু সেই দিনের নওল আলোকে নলিন মাস্টারের নৃত্য দেখতে দেখতে দু-তিনবার তাকে হারিয়ে ফেলেছিলুম, এটা মনে আছে। একবার দেখলুম পীতধড়া শিখিচূড়ামণ্ডিত এক শ্যাম কিশোর চতুর হাসি ঠোঁটে মেখে কাকে যেন ইশারা করে কাছে ডাকছে। আর একবার দেখলুম স্ফুরিতঅধরা এক গৌরাঙ্গী কিশোরী বিরাট অভিমানে দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে।

নলিন মাস্টার, রামাই বাউল, নদুদা—ও আড্ডায় যারা ছিল সবাই গুণী। এক আমি ছাড়া। তবে ওদের নৃত্য দেখতে দেখতে, ওদের গীত শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে এই রকম ছবি দেখতে পেতুম। সব দিন পেতুম না, কখনো সখনো, আর ওদের সেটা বলতুম। ওঁরা খুশী হ'তেন। তাই আমাকে ছাড়তে চাইতেন না। আমার নাম রেখেছিলেন রসিক।

রামাই বাউল বলতেন, 'তুমি আমাদের কষ্টি পাথর। রাঁধলেই তো হয় না, তার ঠিক আস্বাদটি পাবার মতো সুতার জিভও থাকা চাই। কিন্তু তা কজনের থাকে, লাখে এক। রাঁধতে তো অনেকেই পারে।' বলেই গান ধরতেন, 'রসের জোগানদারী সবাই করে, সে রস চাখার রসিক কয়জনা?'

নাচ থামতেই বললুম যা দেখেছি। নলিন মাস্টার খুশীতে ডগমগ। চোখ দিয়ে আনন্দে জল গড়িয়ে পড়ে আর কি? বললেন, 'সবই গুরুর কৃপা। এই কথক নৃত্য, এর কি তুলনা আছে ভাই। সব ক্লাসিক জিনিস। কত কষ্ট ক'রে শিখেছিলুম এসব। ভেবেছিলুম দু একজনকেও দিয়ে যাব। কিন্তু তেমন পাগল একটি পেলুম না। এই ওয়ার-মার্কেটে সবাই তালে ঘুরছে, কি করে, কোন্ ফাঁকে টু-পাইস্ কামানো যায়। এই ডামাডোলে কে আসবে সময় নষ্ট করতে।'

রামাই বাউল বললেন, 'ফালতু বাত রাখ, পেটের মধ্যে এখন কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হচ্ছেন, কিঞ্চিৎ আহুতি টাহুতি দেবার বন্দোবস্ত কর। আজ আবার শনিবার, সেটা মনে রেখ।'

নলিন মাস্টার বললেন, 'হবে হবে। মনে পড়েছে। নদের গোঁসাইকে মনে পড়ে তো? সেই যে কাশীতে কেত্তন করে মাত করে দিয়েছিল সেবারে, তিনি দেহ রেখেছেন। তার শিষ্যরা মোচ্ছব দিচ্ছে, দিব্যি হবে'খন। আর মোচ্ছব খেলে তোমার মা কিছু বলবেন না।'

বাউল বললেন, 'তা অবশ্যি বলবেন না, তবে সক্কাল বেলা, মনটা সন্দেশ সন্দেশ বললে, ভাবলুম মাস্টর আছে, ভাবনা কি?'

কথাটা শুনে মাস্টার খনিকক্ষণ ভাবলেন চুপ করে। তারপর বললেন, 'তো ঠিক আছে চল।'

মা মা রব তুলে তিনজন বেরিয়ে পড়লুম। পথে পড়তেই নদুদার সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে আসছেন। নদুদা ভারতীয় ঐতিহ্যের একজন গোঁড়া গার্জেয়ান। বিরাট পাণ্ডিত্য। অসাধারণ শিল্পী। ওরই আস্তানায় আমাদের দিন কাটে তখন। বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ সালের কথা বলছি।

দেখেই বললেন, 'ওহে, ভালই হয়েছে মাস্টার, পুরী যাবে নাকি? ঝণ্টু কোত্থেকে এক যোগাযোগ করে এসেছে। পাঁচ সাতটা শো-এর বন্দোবস্ত হয়ে যাবে'খন। আমি বলি আর এতে অমত করো না। এমন জিনিসটা স্রেফ পরিবেশন করবার অভাবে লোপ পেতে বসেছে। টাকার চিন্তা করো না, আট দশজনের যাবার টাকা যাহোক করে ম্যানেজ করবো'খন। আর একবার পোঁছে গেলে তো কোনো ভাবনাই নেই। ঝণ্টু বললে, কোন রাজার ডাকবাংলো তোমাদের ছেড়ে দেবে। খাওয়া থাকা তো রাজার হালে।' আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'কি বল হে? তুমিও যাও না, একদল শিল্পীর মধ্যে এরকম দু একজন অ-শিল্পী থাকা ভাল। ব্যালান্স থাকে।'

আর কথা কি? তোড়জোড় শুরু হল। এখন ঝণ্টুই একমাত্র শিষ্য আমাদের মাস্টারের। আর ছিল বেলা। মেয়েটি নাচ শিখেছিল চমৎকার। খুব ট্যালেন্ট ছিল। মাস্টারের খুবই আশা ছিল এর উপর। কিন্তু কিসের থেকে কি হল। কার কথায় পড়ে মেয়েটি একবার চ্যারিটি শোতে আধুনিক নৃত্য দেখালে। আর যাবে কোথায়? নলিন মাস্টার রেগে কাঁই। তখন তাঁর ওই একমাত্র রোজগার কিন্তু কিসে কি? মাস্টার এক কথায় তাকে নাচ শেখানো ছেড়ে দিলে। মেয়েটি ক্ষমা চাইতে এসেছিল। এমন ধারা ব্যাপার দাঁড়াবে বুঝতে পারে নি।

মাস্টারের এক কথা, 'নিকাল হিঁয়াসে। এ সাধনার স্থানে তোমার স্থান নেই। নাচকে ব্যবসা করো গে, ওই পথেই তোমার সিদ্ধি। কাগজে ছবি ছাপা হবে, ফিলিম থেকে ডাক আসবে, আর কি চাই। যাও যাও ঘ্যান ঘ্যান করো না। লোক চিনতেই ভুল হয়েছিল আমার।'

অনেক কাকুতি মিনতি করে মেয়েটি হতাশ হয়ে বললে, 'তবে, আপনার বাকী মাইনেটা নিন মাস্টার মশাই।' তিরিশটে টাকা এগিয়ে দিল। মাস্টার আর সামলাতে পারলেন না। ঠাস করে এক চড় কষিয়ে বললেন, 'ভিক্ষে দেবার লোক পেলে না। বেরিয়ে যাও, বেরোও।'

বেলা মুখ নীচু করে বেরিয়ে গেল। মাস্টার রাগে ফুলে ফেঁপে, তাণ্ডব শুরু করে দিলেন। বললেন, 'মেয়েটার আস্পর্ধা দেখলে। ভিক্ষে দিতে এল আমাকে! লক্ষ্মণ মহারাজের শিষ্য আমি, আমাকে টাকা দিয়ে কিনতে চাইল এক আউরৎ। আমারই দোষ, আমারই দোষ। পেটের দায়ে টাকা নিয়ে আমিই তো ওকে নাচ শেখাতে গিয়েছি। গুরুর বিদ্যাকে হাটে চড়িয়েছি।' ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে ডুগিটি দুহাতে তুলে নিলেন তারপর চীৎকার করে উঠলেন, 'বাস্, অব্ খতম্।' তারপরই এক আছাড়। ঢ্যাপ্ করে ডুগিটা শানের মেঝেয় পড়ল। তারপর চুরচুর হয়ে গেল। দৌড়ে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে ঘুঙুরগুলো তুলে নিলেন। টান মেরে গঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'বাস্ খতম্।'

সেই থেকে নলিন মাস্টার পয়সা নিয়ে নাচ শেখানো ছেড়ে দিলেন। একেই রোজগার বলতে কিছু ছিল না। তারপর যাও বা যৎসামান্য কিছু আসত বেলার কাছ থেকে, তা বন্ধ হওয়ায় অবস্থা উঠল চরমে। দিনের পর দিন তাঁর খাওয়া জোটে নি। আমারও না। দুজনে পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছি, আঁজলা করে গঙ্গা থেকে জল খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছি। বর্ষাকালে গঙ্গার জল ভারী হয় ঘোলায়। নলিন মাস্টার বলতেন, 'চমৎকার হে, খাদ্য ও পানীয় একই সঙ্গে মিলছে।' ক্ষিধেটা অসহ্য ঠেকলে নেমন্তন্ন খেতুম। তারপর সরকারী লঙ্গরখানা খুললে আমাদের কি আনন্দ।

কিন্তু পেটের জ্বালা নিভলেও মাস্টারের মনের জ্বালা মিটত না। বলতেন, 'রসিক, পেলুম না। একটা কাউকে পেলুম না হে। গুরুর বিদ্যে কাকে দেব?' বলেই, শোনাতেন নিজের নাচ শেখার কথা। মাস্টারের বলবার ভঙ্গীটি ছিল চমৎকার। কথায় কথায় ছবি ফুটে উঠত। মানসচক্ষে দেখতুম, পাগল পাগল এক বাঙালী কিশোর দিগ্বিদিকজ্ঞান হারিয়ে ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছে নাচ শেখার তাগিদে। অধিকাংশ দিন তার খাওয়া জোটেনি। অবশেষে

বেনারসে এসে মনস্কামনা সিদ্ধ হল। গুরু মিলল। বিখ্যাত কথক নর্তক লচ্ছমণ মহারাজ মাস্টারের হাতে নাড়া বাঁধলেন। সাত বছর ধরে গুরু কৃপা করলেন। নলিন মাস্টার কথক নৃত্যে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কিন্তু এত বছরের কঠিন শ্রমে, অপরিমিত অনিয়মে মাস্টারের দেহ থেকে লাবণ্য ঝরে গেছে। চেহারায় রস কস নেই। মাস্টারের সে এক মহা দুঃখ। বলতেন, 'নাচ জানাই তো শুধু নয়, দেখানও চাই। তা এ মড়ার নাচ দেখবে কে?'

এমন সময় নদুদা ঝণ্টুকে এনে দিলেন। ভারি সুন্দর চেহারা। কোমল কিশোর। টানা টানা মুখ চোখ। মাস্টার বেঁচে গেল। দিনরাত পরিশ্রম করে তৈরী করলে ঝণ্টুকে। কি চমৎকার নাচ শিখলে ঝণ্টু। উভঝুটি বেঁধে যখন নাচত, মৃদুস্বরে যখন তাল আবৃত্তি করত, তখন আমার চোখে রূপের রাজ্য খুলে যেত। রসের সাগরে যেন সহস্রদল পদ্মে শুয়ে ভেসে যেতুম। পুলকের আবেশে বিবশ হয়ে পড়তুম। নলিন মাস্টারের নাচ অন্য বস্তু, অতি বিশুদ্ধ, তবে বড় ব্যাকরণ ঘেঁষা। আর ঝণ্টু যেন মূর্ত কাব্য। অত পেলবতা, কমনীয়তা, অনাহারে, দুর্দশায়, পোড় খাওয়া মাস্টারের কোথা থেকে আসবে? আমি বেলার নাচও দেখিছি, সেও খুব সুন্দর, এসব তো তুলনা করবার নয়, শরীরের বাঁধুনি অনুযায়ী বিভিন্ন লোকের নাচে বৈশিষ্ট্যের ভিন্ন চিহ্ন ফুটে ওঠে।

বেলাকে হারিয়ে মাস্টারের যে নির্জীবতা এসেছিল, ঝণ্টুকে পেয়ে তার অবসান হল। নব উৎসাহে মাস্টারের ঘরখানা আবার জেঁকে উঠল।

দুই

নদুদার কথা বলেছি। নিজে একজন উঁচুদরের চিত্রশিল্পী। অবন ঠাকুরের কজন প্রিয় শিষ্যের একজন। তবে বড় গোঁড়া। নদুদা লোকালয় ছেড়েছেন। কলকাতা থেকে বহুদূরে গঙ্গার ধারে, এক ভাঙা দোতলা কোঠা আশ্রয় করে চিত্রশিল্পের সাধনায় ডুব দিয়েছেন। আমরা দোতলা কোঠার নাম দিয়েছিলুম নদুদার আশ্রম। আমার ভবঘুরে জীবনের অনেকগুলি দিন ওই আশ্রমে কেটেছে। সাধারণ স্থান সেটা নয়। সেটা এক রূপরাজ্য। বিচিত্র রসের আস্বাদ সেখানে পেয়েছি।

নদুদার প্রস্তাবে মাস্টার তক্ষুনি রাজী। পুরী যাবার একটা তোড়জোড় শুরু হল। একটা প্রোগ্রামও মোটামুটি করে নেওয়া হল। মাস্টার আর ঝণ্টুর নাচ, রামাই বাউলের গীত, আলি খাঁ সাহেবের সারেঙ্গী। এই মিলিয়ে

ঘণ্টা দুয়েকের মতো। তবলা লহরা করবে কে শেষে এই নিয়ে মুশকিল বাধল। শেষ পরে অনেক ধরে কয়ে যাত্রার এক ছোকরাকে মেলানো গেল। এক মাস ধরে নলিন মাস্টার তাকেই তালিম দিতে লাগল। অনেক ঘষে মেজে তাকে দাঁড় করানো গেল। তখন গেলুম খাঁ সাহেবের কাছে। খাঁ সাহেব আমাদের কড়া দোস্ত! অমন দিল খোলা আড্ডাবাজ বড় একটা দেখা যায় না। জানবাজারে গিয়ে বুড়োকে খুঁজে বের করা হল। একটা ছেঁড়া ময়লা পায়জামার উপর মলমলের এক ধোপদস্ত চুড়িদার পাঞ্জাবী চাপিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমাদের দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে মাস্টারজী আরে রসিকজী, বহুত দিন বাদ,—কেয়া মতলব? আসুন আসুন। ভেতরে আসুন। বসুন। নসিব কি দরওয়াজা আজ খুল্ গয়ি হ্যায়।'

গিয়ে বসলুম। নানা গল্প সল্প হল। সময় ছিল না হাতে। তাই যদ্দুর সম্ভব তাড়াতাড়ি—এই ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই—বাজে কথা শেষ করে কাজের কথা পাড়লুম।

নলিন মাস্টার বললেন, 'দেখ ওস্তাদ, অনেকদিন পরে নাচ দেখাবার একটা জায়গা পেয়েছি, পুরীতে। জানোই তো পয়সা কড়ির ব্যাপার। ওখেনে কি হবে বলতে পারিনে। এখান থেকে নিজেরাই টাকা খরচা করে যাচ্ছি। যদি ওখানে গিয়ে কিছু মেলে তুমি পাবে, যদি না হয়—'

বুড়ো বাধা দিয়ে বললে, 'কি কথা বোলেন মাস্টারজী। কম্ সে কম্ আপনার নাচ তো দেখা হোবে। বহোৎ রোজ হয়ে গেছে, সেই কবে আপনার নাচ দেখেছি। আলবৎ যাবো। লেকিন্ পাঁন্চ্ সাত রোজ বাদ। কেন কি, বাত দিয়ে ফেলেছি, একটা মুজরায় যেতে হোবে।'

বেশী আর বিস্তারিত বলব না। সংক্ষেপ করি।

পুরী স্টেশনে পৌঁছে দেখি ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নেই। ঝণ্টু বেচারা ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করতে লাগল। কিছুই পরিষ্কার বলতে পারে না, শুধু বলে, 'এক রাজার সেক্রেটারীর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তিনি বলেছেন স্টেশনে গাড়ী থাকবে, গেস্ট হাউস রেডি থাকবে।'

তবে একটু অপেক্ষা করা যাক। দুপুর পর্যন্ত বসে থাকলুম স্টেশনে। তাও কিছু না। আর তো সবাই একরকম সয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাগড়া দিলে তবলচী ছোকরা। ওতো আমাদের দলের লোক নয়। মেজাজ একেবারে লাট সাহেবের মতো। 'কি হল ম্যানেজার বাবু? রাজার রথ কি পথ ভুল করল?

কি মশাই সারাদিন কি এখানেই কাটবে?' ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে দলের ম্যানেজার ঠাউরেছে। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমার অবস্থা কাহিল করে দিলে।

শেষ পর্যন্ত সবাই যখন স্বীকার করল যে আর অপেক্ষা করা বে-ফয়দা, তখন একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে গুটি গুটি রওনা দিলুম। কিছুদূর যেতেই পাণ্ডায় ধরল। নামধাম ইষ্টকুটুম্ব ঝি চাকর ইস্তকের পরিচয় জানতে চাইলে। মাথায় কি বুদ্ধি খেলল, ঠিক সময়ে এমন বুদ্ধি কি করে আমার নীরেট মগজে খেললে জগন্নাথ জানেন, কলকাতার এক বড় মানুষের নাম ঠিকানা বলতেই এক জোয়ান পাণ্ডা এসে বললে, এ আমার ঘর। এক খেরো খাতা বের করে ঠিকুজি কুলুজী দেখিয়ে বললে, বুড়ো বাবুর তো পাঁচ গোটা ছেলে আছে, আমি তার কোনটি। বললুম, 'আমি বুড়োবাবুর ছেলে নয় নাতি, মেজ মেয়ের সেজ ছেলে!' বলতেই পাণ্ডা ঠাকুর গলে গেল একেবারে। বলল যে, আমার মাকে ও ভালরকম জানে। আমাদের চারপুরুষের পাণ্ডা। আমি যেন কোন কিন্তু-কিন্তু না করি, ওর ঘর বাড়িকে আমারই বাড়ি আমারই ঘর বলে যেন ভাবি।

বললুম, 'ঠাকুর সে আর বলতে। তোমার ভরসাতেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসা। দেখ অযত্ন না হয়। ক'দিন থাকার ইচ্ছে। ভাল লাগলে মাস খানেকও থাকতে পারি। ভাল সরেস পেসাদ খাওয়াবে, টাকার জন্য ভেব না। এই নাও যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী। মা পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা তোমার।'

ট্রেনভাড়া ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া মিটিয়ে যা ছিল উপুড় করে পাণ্ডার হাতে ঢেলে দিলুম। আর দাঁতন কাটি অবদি কেনবার পয়সা থাকল না। শেষ সম্বল অন্যের হাতে তুলে দেওয়ায় দলসুদ্ধ লোকের চক্ষু আকাশে গিয়ে বিঁধল। কিন্তু বিপদের সেই অকূল দরিয়ায় খোঁড়া হলেও আমিই তো কাণ্ডারী। তাই উচ্চবাচ্য কেউ করলে না। পাণ্ডাকে আর কিছুই বলতে হল না। আঁকাবাঁকা গলি ঘুরে প্রভুর মন্দিরের পেছন দিকের এক বাড়িতে নিয়ে হাজির করলে। তল্লাটটার নাম দক্ষিণ দুয়োর। আহা কোন্ দার্শনিক নামকরণ করেছিল? ঘুপচি ঘর। অন্ধকারকে দরজা জানালা খুলে ঘাড়ে ধরে ধাক্কা দিলেও সরে না। কাশীর ষাঁড়ের মতো নির্বিকার ঘর জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তাই উত্তম উত্তম বলে পাণ্ডাকে ফুলিয়ে দিলুম।

খাওয়া দাওয়া চুকলে ঝণ্টুকে নিয়ে বের হলুম। বেরুবার মুখে রামাই বাউল বললেন, 'ও চ্যাংড়ার কথায় ভুলে যেও না ভাই, যে নাচাবে তাকে এনে এখানে হাজির করো।'

কিন্তু কাকে হাজির করবো? ঝণ্টু নাম বলতে পারলে না, লোক দেখাতে পারলে না, জায়গা চেনাতে পারলে না। বেচারা ভয়ে লজ্জায় কেমন যেন নার্ভাস হয়ে গেল। বুঝলুম সবই। যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন এত লোক নিয়ে ফিরেই বা যাই কেমন করে? পয়সা কড়ি তো বেবাক ফাঁক হয়ে গেছে। কোনদিকে আলো দেখলুম না। ঝণ্টুকে বাসায় যেতে বলে সমুদ্রের পথ ধরলুম।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত পুরীর বেলাভূমে বসে বসে সমুদ্রের নৈশ অভিসার প্রত্যক্ষ করলুম। রাত্রি অতি ঘনিষ্ঠতার সমুদ্রের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে চুম্বন এ'কে দিচ্ছে। 'সমুদ্র থর থর উত্তেজনায় ঢেউয়ের বাহু বাড়িয়ে রাত্রিকে নিবিড় করে বুকে টেনে নিচ্ছে। এখানে ওখানে চক্‌চক্‌ ফস্‌ফরাস জ্বলে উঠছে। যেন আনাড়ি বরের গণ্ডে নববধূর তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধরের ছাপ।

হতাশ হয়ে বালুর উপর বসেছিলুম। সমুদ্র আর রাত্রির এই নির্লজ্জ প্রণয়লীলা দেখতে দেখতে এক সময় সব আশংকা সব দুশ্চিন্তা ভুলে গেলুম।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই পরামর্শে বসলুম। নলিন মাস্টার, খাঁ সাহেব আর রামাই বাউলের কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই। দিব্য খাওয়া দাওয়া, দেব-দর্শন চলেছে। আর মশগুল হয়ে পুরানো স্মৃতির সাগরে ডুব দিচ্ছেন। তবলচীকে কিছু বলি নি। ঝণ্টু আর আমিই পরামর্শ করলুম, একটা শো-এর বন্দোবস্ত করা যায় কি না। শ্রীমান ঝণ্টুর তাহলে লজ্জার হাত থেকে অব্যাহতি মেলে। আর আমার মতলব গাড়িভাড়ার টাকাটা যোগাড় করা।

সারাদিন আবার ঘুরলুম সিনেমাআলাদের দরজায়। শোয়ের বন্দোবস্ত করতে পারলুম না। আমাদের নাচ কে দেখবে? মেয়েলোক নেই। তা ছাড়া পুরী শহরে একই সংগে দুটি নাচ চলবে কি করে? 'কেন, আবার কে নাচতে এল?' জিগ্যেস করতেই ম্যানেজার বললে, 'কলকাতা থেকে একটা পার্টি এসেছে, কাল থেকে নাচ শুরু হবে।'

যাও বা আশা ছিল, গেল। টানা এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সেই সমুদ্রতীরে এসে বসলুম। পুরীর বেলাতটে ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে। বসে বসে তাই দেখছি আর ভাবছি এখন করব কি?

কে পেছন থেকে সবিস্ময়ে বললে, 'রসিকজী না!' চেয়ে দেখি দুটি তিনেক মেয়ে আর গোটা ছয় পুরুষের সংগে বেলা। সেই বেলা! দুবছর পর দেখলুম। ভারি সুন্দর চেহারা হয়েছে। আমার সংগে খুবই ভাব ছিল। সত্যিই ওকে খুব স্নেহ করতুম। নাচ শিখত যখন জ্বালাতন করে মেরেছে। খালি

বলত, 'কি কেমন দেখছেন? হচ্ছে তো? কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' অর্থাৎ নলিন মাস্টারের নাচ দেখতে দেখতে যে ছবি ভাসত, সেই ছবি ওর বেলাতেও দেখছি কি না। তেমন কিছুই দেখতুম না বলে খুব চটে যেত। ধপ্ করে পাশে বসে পড়ে জিগ্যেস করলে, 'ক-ত দিন পরে দেখা। কবে এসেছেন? কি মনে করে? কোথায় উঠেছেন?'

হেসে বললুম, 'এত কথার জবাব একসঙ্গে দিই কি করে? তার চেয়ে আমি একটা প্রশ্ন করি, তার জবাব দাও দিদিমনি। তুমি কবে এসেছ?'

বেলা বললে, 'আজ সকালে। কাল থেকে যে আমাদের শো।'

বললুম, 'শো, ও তাহলে এই নাচের শো-টা তোমাদের।'

বেলা বললে, 'হ্যাঁ, তিনটে শো আছে। কয়দিন থাকব! ওঃ কতদিন পরে দেখা।'

বেলা ওর সঙ্গীদের যেতে বলে জমিয়ে বসল। তারপর এ কথা সে কথা নানাকথায় এসে পড়লুম।

বেলা বিয়ে করেছে। নাচকে শেষ পর্যন্ত পেশা করে নিয়েছে। নাম হয়েছে তার। এ পার্টিও ওর স্বামীর। নানা কথা বললে। ম্লান হেসে এক সময় বললে, 'আদর্শ নিয়ে থাকলে পেট চলত না রসিকজী। বাবার অমতে বিয়ে আমাদের। ও-ও নাচে। আপনাদের তো এ সস্তা নাচ ভাল লাগবে না। আচ্ছা গুরুজীর খবর কি?'

বলব কি বলব না, অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম। কিন্তু বেলার আন্তরিকতা আমাকে অভিভূত করেছিল। ধীরে ধীরে সব কথা বললুম। বেলা ধীরভাবে শুনল, তারপর বললে, 'রসিকজী, কিছু ভাববার নেই। আমাদের শোয়ের সঙ্গে একটা শো দিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করা একটুও কঠিন হবে না। ওকে সঙ্গে নিয়ে কাল যাব সকালে আপনাদের ওখানে। গুরুজীকে আমার প্রণাম দেবেন।'

তিন

যাক্। বুক থেকে একটা মস্ত বোঝা নেমে গেল। হাল্কা পায়ে আস্তানায় চললুম। খাওয়া দাওয়া চুকলে কথাটা পাড়ব ভাবলুম। প্রথমে রামাই বাউলকে বললুম। তিনি 'মায়ের ইচ্ছা' বলে সটকে পড়লেন। হঠাৎ দেখি খাঁ সাহেব আর নলিন মাস্টার বেরুচ্ছে। মাস্টার বললে, 'যাবে নাকি রসিক, ওস্তাদজীর সঙ্গে আজ সমুদ্রসঙ্গত হবে।' বললুম, 'বেশ তো।'

চক্রতীর্থের কাছে জলের কিনার ঘেঁষে সে এক আশ্চর্য মাইফেল বসল।

খাঁ সাহেব সারেঙ্গী বাজাবেন। সমুদ্র ঢেউ-এর আওয়াজে তার সঙ্গে সঙ্গত করবে। এমন অপার্থিব সঙ্গীত-জলসায় শ্রোতা শুধু আমি আর নলিন মাস্টার। খাঁ সাহেব সঙ্গীতের সাগর সৃষ্টি করলেন, না সমুদ্র এসে খাঁ সাহেবের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, ঠিক বলতে পারব না। সেদিন আমার কোন চেতনা ছিল না। খাঁ সাহেবের সারেঙ্গী কখন থেমে গেল জানিনে। মনে হল আকুতির মহৎ ক্রন্দনে কে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছিল।

সময়ের স্রোত কতটা বয়ে গেল আন্দাজ ছিল না। আমার সঙ্গে কে ছিল, আমি কোথায় ছিলুম, বেশ কিছুক্ষণের জন্য তাও বোধ হয় খেয়াল ছিল না। যখন সম্বিত পেলাম, তখন দেখি সমুদ্রের লোনা বাতাসে আমার মুখ-চোখ চ্যাট চ্যাট করছে। ঠান্ডা বাতাসে গলায় ব্যথা হয়েছে ঢোক গিলতে গেলে ব্যথা বোধ করছি। আর দেখলুম, অন্ধকারে ধ্যানস্থ হয়ে গেছে দুটো মূর্তি—খাঁ সাহেব আর নলিন মাস্টার—কত যুগ ধরে ওরা অমনভাবে বসে আছে, কে জানে?

প্রথমে মাস্টারের ধ্যান ভাঙল; পরে খাঁ সাহেবের। নলিন মাস্টার বললে, 'খাঁ সাহেব, তোমার উপর ঈশ্বরের ভর আছে। বাজনা শুনে সমুদ্র স্তব্ধ হয়েছে, আবার সুরের স্পর্শে ঢেউ জেগে উঠে সাপের মত ফণা তুলে, এধার-ওধার দোল খেয়েছে। এমন অপূর্ব দৃশ্য আর আমি দেখিনি।' বুঝলুম, মাস্টার সুর-মাতাল হয়েছে। এবার আবোল-তাবোল বকবে।

মাস্টার বললে, 'শোন, তবে বলি। কাহিনীটা আমার গুরু বলেছিলেন, কাজেই গল্প কথা নয়। ওঁরই ঠাকুর্দা অচ্ছান মহারাজের কথা। অচ্ছান মহারাজের মত কথক নাচিয়ে সে সময় আর কেউ ছিল না। অচ্ছান মহারাজেরই নাচের গল্প এটা। মহারাজের বয়েস তখন অল্প। গুরুর কৃপায় তালিম শেষ করে সবে গোয়ালিয়র রাজ দরবারে গিয়েছেন। অল্প দিনের মধ্যেই চতুর্দিকে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। এমন সময় একদিন এক তবলচী এসে হাজির। বললে, মহারাজ, তোমার এখানে নাকি এক মশহুর নাচিয়ে আছে। তাকে ডাক। আমার বাজনার সঙ্গে নাচবে। বড় দুঃখে আছি। দমওয়ালা কোনও নাচনেবালা মিলছে না, যে শেষতক নাচতে পারে। শুনে তো সবাই রেগে আগুন। এমন বেয়াদব তো বড় দেখা যায় না। মহারাজা তো পাত্তাই দিতে চান না। কিন্তু অচ্ছান মহারাজ বললেন, বেশ নাচব, তবে কাল। পরদিন বড় ভাড়ী বন্দোবস্ত হল, আঃ, সে কি নাচ, আর তেমন বাজনা। চার-ঘণ্টা কাবার হয়ে গেল, না নাচ থামল, না বাজনা। অচ্ছান মহরাজ নাচছেন, ঘামের সঙ্গে চন্দনের স্বেদ টপটপ করে ঝরে পড়ছে, সাদা উত্তরীয় দেহের সঙ্গে ঝটাপটি করছে আর ঘুঙুর, কখনো উত্তাল,

কখনো বা শান্ত মধুর—পায়ের ইশারা মত বেজে চলেছে। শ্রীমতীর অপেক্ষার আর শেষ নেই। পাতা নড়লে চমকে ওঠেন, ওই বুঝি প্রাণকান্ত এলেন। কিন্তু না, ও বাতাস, না ও মেঘচ্ছায়া, না শরের বনে পাখীর শব্দ। কিন্তু কৃষ্ণ, তিনি কি আসবেন না, আসবেন না, আর আসবেন না? শ্রীমতীর হৃদয় ফেটে যে চৌচির হয়ে গেল। ঘুঙুরের বোলে, আর তবলার তালে, সমস্ত রাজসভা বৃন্দাবন বনে গেছে। সব স্তব্ধ আগ্রহে প্রতীক্ষা করে আছে। মিলনের প্রতীক্ষা। সমাপ্তির প্রতীক্ষা। কতক্ষণ আর উদ্বেগের মধ্যে থাকা যায়? শ্রীমতীর হৃদয়ের ব্যাকুলতা অচ্ছান মহারাজের পায়ের ঘুঙুরের সহস্র ঝংকারে বেজে বেজে উঠছে। ছম ছম ছম ছম। আও, আও, এসো, এসো। ছম ছম ছম, ছম ছম ছম। আও কান্হা আও। নিষ্ঠুর কানাই এসো, এসো। শ্রীমতীর আকুল বাসনা ঘুঙুর থেকে ছড়িয়ে পড়ল দরবারের বাতাসে। বাতাস সে ব্যর্থ আবেদন পেঁাছে দিলে সমবেত সমস্ত দর্শকদের মনে মনে। কারো সম্বিত নেই, কারো পলক পড়ছে না। মনের মধ্যে গুমরে উঠছে শুধু শ্রীমতীর মনোবেদনা। দ্রুত লয়ে নাচ চলেছে। দ্রুত লয়ে বাজনা চলেছে। সে কি আসবে না, সে কি আসবে না, সে কি আসবে না? হঠাৎ অচ্ছান মহারাজের সহস্র ঘুঙুর স্তব্ধ হয়ে গেল। পা দুটো কিন্তু সমান দ্রুত লয়ে পড়ে যাচ্ছে। আর ঘুঙুরের শব্দ নেই। হঠাৎ কিনি কিনি কিনি, পায়ের সেই একই গতিতে দ্রুত ওঠা-পড়ার মধ্যে অচ্ছান মহারাজের একটি ঘুঙুর সাড়া দিয়ে উঠল। এসেছে, এসেছে, কানাই এসেছে! ওই যে দূরে, বহুদূরে তাঁর চরণ কিঙ্কিনির ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যেই একটা ঘুঙুরের আওয়াজ শোনা, আর তাল কেটে গেল। তবলচীর বাজনার দিকে খেয়াল নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, কান্হা তু বড়া নিঠুর হো। কানাই, তুমি বড় নিষ্ঠুর। দুচোখের জলে তবলচীর জামা ভিজে গেল। এই হল তন্ময়তা। এ-না হলে সিদ্ধি হবে না। খাঁ সাহেব, এই তন্ময়তা তোমাতে আছে।' খাঁ সাহেবও এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল, 'উ এক অলাগ্ জমানা থি। সে এক আলাদা যুগ ছিল।'

নলিন মাস্টারকে স্বাভাবিক হতে দেখে, ভরসা করে বেলার প্রস্তাবটা পাড়লুম।

মাস্টার ঝাঁকি মেরে উঠলেন, 'তুমি কি করে ভাবতে পারলে, আমি এতে রাজী হব? নির্বোধ কোথাকার। ছি ছি, অহঙ্কারী মেয়েটা শেষ পর্যন্ত আমাকে দাক্ষিণ্য দেখাবে, আর সেই প্রস্তাব নিয়ে এলে কিনা তুমি!'

বলতে গেলুম তো ধমকে উঠলেন, 'থামো। আমার ইজ্জত তুমি ধুলোয়

লুটিয়ে দিয়েছ। জান কোন্ ঘরাণার লোক আমি? লছমন মহারাজের। যারা কারো কাছে কখনো শির ঝুঁকায় নি। তোমাকে মোড়লি করতে কে বলেছে হে? টিকিটের পয়সা নেই হেঁটে ফিরতুম। না হয় থেকেই যেতুম এখানে। তাবলে কি ভিক্ষে নেব?'

মাস্টার ক্ষেপে উঠলেন। ধ্বক ধ্বক জ্বলে উঠল তাঁর চোখ। অন্ধকারেও আভাস পেলুম তাঁর সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। বললেন, 'আমি চললুম।'

বলেই হাঁটা ধরলেন। কি পাগলামী! কত করে বোঝালুম। কোন কথাই কানে তুললেন না। শুধু ধমকে বললেন, 'খামোশ, দূর হয়ে যাও সামনে থেকে। নিকালো।'

হার মানলুম। কিছুতেই পারলুম না তাঁকে বাগ মানাতে। সেই অন্ধকারে জীর্ণশীর্ণ মূর্তিটাকে ধীরে ধীরে বিলীয়মান হতে দেখলুম। কতক্ষণ পরে তাও আর দেখা গেল না।

কি কৌশলে পুরী থেকে সেবার পালিয়ে এসেছিলুম, আমরা কজনই জানি।

তারপর থেকে আর দেখা হয়নি নলিন মাস্টারের সঙ্গে। তবু এই হতভাগ্য শিল্পীটির কথা ভুলতে পারিনি। কোথায় আছে, কি করছে, জানতে বড় ইচ্ছে করে।. এই ভেজালের যুগে তার বিদ্যা নিয়ে, তার দম্ভ নিয়ে, তার ঘরাণার গর্ব বয়ে এই নির্ভেজাল মানুষটি এখনো এই পৃথিবীতে আছে,—না, থাক সে চিন্তাকে অংকুরেই বিনষ্ট করলুম।